প্রথম প্রকাশ

মার্চ, ১৯৮০।

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর

এন. গোস্বামী

নিউ নারায়ণী প্রেস

১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন,

কলকাতা-৭০০০১২

ব্যক্তিগত দুঃখবেদনা, অন্তর্দ্বন্দ্ব তথা আন্তরিক 'নাটক', আমার কাছেও মহত্বপূর্ণ, সুখকর ও স্বস্তিদায়ক, কিন্তু ঘরে যখন আগুন লাগে, তখনো অন্তর্জগতের ঘেরাটোপে থেকে, নিছক অন্তর্জগৎকে উন্মোচন করা ব্যাপারটা অসঙ্গত, খেলো এবং একটা সীমার পর অশ্লীল হয়ে ওঠে না-কি ? সম্ভবত, এই প্রশ্নেই নিহিত আছে বর্তমান উপন্যাসের উৎস। এ উপ-ন্যাসকে আমি দেখেছি —ব্যক্তিত্ব ও নিয়তিকে নিয়ন্ত্রিত করে যে পরিবেশ —তার ঋণ শোধ হিসেবেই। এর বাইরে কোনো প্রত্যাশা কিংবা কিছু আরোপ করা, না করা আপনাদের ব্যাপার।

মহাভোজ

বেওয়ারিশ লাস ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাওয়াই শকুনের স্বভাব।

কিন্তু বিশেসর বেওয়ারিশ নয়। রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট সাঁকোর ওপর পড়েছিলো তার লাস। তাই বোধহয় বেওয়ারিশ লাসের কথা মনে হয়েছিলো। তা নইলে তার তো বাপ-মা দুই-ই রয়েছে। গরীব হতে পারে, কিন্তু রয়েছে তো। অথচ বিশ্বাসই হয় না ও মৃত। মনে হচ্ছিলো পথ চলতে-চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ক্ষণেক গড়িয়ে নিচ্ছে। নিদ্রিত আর মৃত মানুষের মধ্যে ফারাকই বা কতটুকু? শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা সূক্ষ্ম সুতোটুকু ছাড়া? যে মুহূর্তে সেই সুতো ছিঁড়লো, অমনি মানুষের প্রাণ-ভোমরাও দেহ ছাড়লো! দেখতে-দেখতে গোটা গ্রামের লোক এসে জড়ো হলো।

শহর থেকে সরোহা গ্রামের দূরত্ব খুব-একটা বেশি নয়, বড় জোর মাইল-বিশেক। কিন্তু কয়েক বছর আগেও এই দূরত্ব ছিলো অনেক বেশি। সে সময় গ্রামে কোনো ঘটনা ঘটলে তা গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, সে ঘটনায় বেশ বড় একটা শহরে গিয়ে পৌঁছাতো না। শহর থাকতো নির্বিকার, উদাসীন কিন্তু এখন সেই দূরত্ব ঘুচে গেছে এবং সেই কারণেই আজ গ্রামে কোনো ঘটনা ঘটলে, তাকে ঘিরে বেশ বড়-গোছের হৈ-চৈ শহরেও শুরু হয়ে যায়। এই তো মাসখানেক আগের ঘটনা। গ্রামের সীমানার অনতিদূরে যে হরিজন পাড়া সেখানে মানুষসহ কয়েকটি কুড়েতে আগুন লাগানো হলো। পরের দিন লোকেরা দেখলো কুড়েঘরগুলি ভস্মে এবং মানুষগুলি ঝলসানো মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। লোকেরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো থানায় কিন্তু দারোগা সাহেব তখন ছুটিতে। যে দু'জনে সেদিন সেখানে ডিউটিতে ছিল তারা এই বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলো যে দারোগা সাহেব ফিরে এসেই ঘটনাস্থলে যাবেন এবং তখন তদন্ত শুরু হবে। এরপর এক অজানা আতঙ্কে গ্রামবাসীদের মুখ থেকে আর টুঁ শব্দটি বেরুলো না। শুধু সকলের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বার-হওয়া ক্রোধ আর ঘৃণা, প্রচণ্ড উত্তেজনার রূপ ধারণ করে গোটা এলাকা জুড়ে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

কিন্তু যে মুহূর্তে এই সংবাদ শহরে গিয়ে পৌঁছালো সেখান থেকে ছুটে এলেন মন্ত্রী, নেতা এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা, তাঁদের গাড়ির লাইন লেগে গেলো। আগুনের ধোঁয়ার মেঘ তো একদিনেই কেটে গেছে, কিন্তু শহরে গাড়ির ধুলোর মেঘ বেশ কয়েক দিন বায়ুমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। নেতারা সাশ্রুনয়নে, রুদ্ধকণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ করলেন; আশ্বাসবাণী শোনালেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সেই

ভস্মস্তূপের ছবি একটানা পটাপট তুলে নিয়ে গিয়ে পরের দিন সেই ঘটনার সচিত্র বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করে প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। কেউ-কেউ সকালে ঘুমের খোয়ারি কাটাতে আড়ামোড়া ভাঙতে-ভাঙতে আবার কেউ-বা চায়ের পেয়ালায় চুমুক মারতে-মারতে সেই সংবাদ পড়লেন এবং ছবি দেখলেন। বিষাদের গভীর কালিমা তাদের মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লো। বোধহয় চায়ের স্বাদও কটু হয়ে উঠলো। একরাশ দুঃখ এবং সহানুভূতি মুখে মাখিয়ে তারা বলে উঠলেন—'ওঃ হরিব্‌ল্‌ ···দিস্পলি ইনহিউম্যান। আর কতদিন এ সমস্ত চলবে? ইস্‌!' ব্যস্‌, তার পরেই পাতাখানা উল্টে গেলো। কিছুক্ষণ পর গ্রামবাসীদের জীবনের মতোই খবরের কাগজের ঠাঁই হলো আবর্জনার স্তূপে।

কিন্তু ঘটনার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটলো না। এই দুর্ঘটনায় বিরোধী-দলের নেতাদের হৃদয় যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো। বিধানসভায় ভগ্নকণ্ঠে তাদের চিৎকার যেন তাদের বিদীর্ণ হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি। এবং সেই চিৎকারে সমগ্র সভাকক্ষে এমন প্রচণ্ড হট্টগোল শুরু হলো যেন সমগ্র মেদিনী ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আত্মগ্লানিতে বিহ্বল বিভিন্ন মন্ত্রীরা, রুদ্ধকণ্ঠে শোক প্রকাশ করলেন এবং আশ্বাস দিলেন ভবিষ্যতে এমন ঘটনা দ্বিতীয়বার আর ঘটবে না। ওদিকে শাসকদলের বিক্ষুব্ধ বিধায়কেরা পৃথকভাবে শোক প্রকাশ করতে লাগলেন।—এমন অমানবিক কাণ্ড! দলের নামে এতবড় কলঙ্ক! এখন তো মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ছাড়া এ কলঙ্ক মোচন করা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রীও স্বয়ং পদত্যাগ করে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মনে হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর বিবেক ভারমুক্ত হবে না। আর গদিতে আসীন থাকলেই তো তিনি এসব কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। সুতরাং কি আর করবেন, অন্তরের আকুল আহ্বানের কাছে তাঁর নিজেকে অসহায় মনে হলো। তাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ভার তিনি উচ্চপদস্থ অফিসারদের হাতে তুলে দিলেন। অফিসাররাও, তাদের পদের গুরুত্ব এবং কর্মতৎপরতার নিদর্শন স্বরূপ তড়িঘড়ি উক্ত কনস্টেবল দু'জনকে সাসপেণ্ড করলেন। গমের সঙ্গে ঘুণপোকা পিষে যাওয়ার প্রবাদ তো পুরনো হয়ে গেছে। আর এ প্রবাদ বিগত যুগের পরিবেশেই বোধহয় প্রযোজ্য ছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গেছে। এখন গম নিরাপদ, শুধু ঘুণপোকাই ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকলেই স্ব-স্ব পদে নিরাপদ রইলেন, কপাল পুড়লো বেচারা কনস্টেবল দু'টির।

পূর্বের ঘটনার জের এখনও পুরোপুরি থিতিয়ে যায়নি, ইতিমধ্যে আবার এই কাণ্ড ঘটলো। বিসেসর এমন কিছু কেউকেটা মানুষ নয়, কিংবা ওর মারা যাওয়াটাও এমন বিরাট কিছু ব্যাপার নয়, যে এই সংবাদ নিমেষে শহরে পৌঁছে যাবে। আর যে চামারগুলো অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ দিলো তার আর

তাদের যে ক'জন আত্মীয়-স্বজন চোখের জল ফেলার জন্য বেঁচে-বর্তে রইলো তারাই বা এমন কি কেউকেটা ছিলো ? তবু হৈচৈ তো কম হয়নি। বিসুর লাস নিয়েও গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখা দিলো। এবার দারোগা সাহেব একটুও গড়িমসি করলেন না। চটপট ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। কাল থেকে তিনি কত লোকের এজাহার নিয়েছেন …তাদের পেট থেকে কত কথা বার করেছেন। তাদের ওগরানো কথাবার্তা সবই কাগজে নোট করে নিয়েছেন। ময়না তদন্তের জন্যে মৃতদেহ শহরে পাঠানো হয়ে গেছে এবং শুরু হয়ে গেছে ঘটনার চুল চেরা বিশ্লেষণ। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যক্তি বা ঘটনা কোনোটাই বড় নয়। আসল ব্যাপার হলো সুযোগ। এমনই এক সুযোগ এসে পড়েছে এই মুহূর্তে সরোহাতে। তাই এখন এখানে গাছের একটি পাতা নড়াও একটি ঘটনার গুরুত্ব বহন করে। মাত্র দেড় মাস পরেই তো নির্বাচন। যদিও বিধানসভার একটি মাত্র আসনের জন্যে এই উপনির্বাচন, তবু দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুকুলবাবু স্বয়ং এই আসনটি দখল করার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ তো সুকুলবাবু নয়, বরং বলা উচিত গত নির্বাচনে পর্যুদস্ত তাঁর সম্পূর্ণ পার্টি-ই দাঁড়াচ্ছে তার পুরো শক্তি নিয়ে। তাদের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব শাসকদলের সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। অবশ্য বিগত নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর সুকুলবাবু মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন না। জীবনের অবশিষ্ট ক'টা দিন জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। কিন্তু প্রথম সুযোগেই তিনি আবার রাজনীতির মঞ্চে ফিরে এলেন। কি আর করবেন ! গদিচ্যুত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি অনুভব করেছিলেন যে একমাত্র ক্ষমতার আসনে বসেই জনগণের আসল সেবা করা সম্ভব। আসলে এই দেশ-সেবার ব্রত তিনি এত অল্প বয়সে গ্রহণ করেছিলেন যে পরবর্তী কালে তা তাঁর অস্থি-মজ্জার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, চেষ্টা করলেও তা আজ তিনি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না।

সুকুলবাবু আজ এই উপনির্বাচনে প্রার্থী, আর একারণেই এই নির্বাচন এত গুরুত্বপূর্ণ। আসন একটি মাত্র হলেও সম্পূর্ণ মন্ত্রিমণ্ডলের ভবিষ্যৎ যেন এই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে। স্বভাবতঃই তাই আজ সরোহার প্রতিটি ঘটনাই যুক্ত হয়ে পড়ছে এই নির্বাচনের সঙ্গে। তা নইলে অন্য সময় বিসুই বা কে আর তার মৃত্যুই বা এমন কি আহামরি ঘটনা ! কিন্তু আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই একদিকে যখন বিসুর চিতা জ্বলে উঠলো তখন শহরে ছড়িয়ে পড়লো প্রচণ্ড উত্তেজনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শহরের সবচেয়ে গণ্যমান্য মানুষ, দা-সাহেব, তাঁর খাস কামরার এক কোণে চুপচাপ বসে আছেন। গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট। উদ্বেগের ছায়াও পড়েছে তাঁর চোখে-মুখে। কিন্তু সে চিন্তার বহিঃপ্রকাশ যৎসামান্য। তাঁর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত সৌম্যভাব। দেখলেই মনে হয় তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। মাঝে মাঝে টেলিফোনের কর্কশ আওয়াজে তাঁর মগ্নতা ভঙ্গ হচ্ছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনো ব্যাকুলতা কিংবা ব্যস্ততার ছাপ নেই। এটাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—ধীর, শান্ত এবং সংযত বাচনভঙ্গি। মানসিক চঞ্চলতার ছোঁয়া না লাগিয়ে কেমন করে নিজের মনের কথা বলতে হয় তা রপ্ত করার জন্যে দা-সাহেবের কাছে শিক্ষানবিশী করা উচিত। দা-সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এত বৈচিত্র্যময় যে কেউ যদি তা রপ্ত করতে চায় তাহলে সে হেসে-খেলে তাঁর শিক্ষানবিশী করে তার সারাটা জীবনই কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আজ এই সার্বিক অবক্ষয়ের যুগে এত ধৈর্য কার আছে! তাই তাঁর এই ব্যক্তিত্বের কণামাত্রও আহরণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

দা-সাহেবের সমগ্র ব্যক্তিত্ব যেন ভদ্রতার ফ্রেমে আঁটা। গৌরবর্ণ ঋজু দেহ, শরীরের কোথাও একটু বাড়তি মেদ নেই, শুধু গরিমা-দীপ্ত ব্যক্তিত্বই ঝরে পড়ছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সুঠাম দেহের একমাত্র রহস্য হলো সংযমী জীবনযাত্রা এবং আহার-বিহারে নিয়মানুবর্তিতা। যখন কথা বলেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর খুব একটা ওঠা-নামা করে না। মাপা স্বরে কথা বলেন তিনি। শব্দগুলো জিভের ডগা থেকে পিছলে বার হয় না, বরং বলা যায় গভীর চিন্তার ফসল সেগুলো। কেউ তাঁর মুখ থেকে আজ পর্যন্ত একটি লঘু কথাও শোনেননি, এমন কি তাঁর বিরোধীদের সম্পর্কেও নয়। ব্যবহারে এমন ভারসাম্য এবং সংযত মনোভাব, কঠিন সাধনার দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব, আর দা-সাহেবের জীবন তো সেই সাধনারই ইতিহাস। কঠিন তপস্যার আগুনে পোড় খেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব নিখাদ সোনায় পরিণত হয়েছে।

তাঁর খাস কামরাটিও অত্যন্ত সাদা-মাঠা। জাঁকজমক, চাকচিক্য কিছুই নেই। এই বাহ্য আড়ম্বরহীন সহজ পরিবেশ তাঁর পদের অনুরূপ না হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই। মেঝেতে কার্পেটের বদলে একটা মোটা সতরঞ্চি পাতা রয়েছে, তার একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে পাতা রয়েছে একটা গদি। তাতে ধব্‌ধবে সাদা চাদর এবং গোল তাকিয়া। একেবারে দিশী পদ্ধতি। তাঁর কাছে স্বদেশ যতখানি প্রিয়, দিশী পদ্ধতিও ঠিক ততখানি প্রিয়। তাঁর ছেলেমেয়েরা অবশ্য মানুষ হয়েছে বিদেশী ঘরানার প্রভাবে। তাদের মুখের ভাষা, দিনানুদৈনিক জীবনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র সবই আমদানি হয়েছে বিদেশ থেকে। অবশ্য তাদের

রুচি-পছন্দ তাদের নিজেদের। দা-সাহেব কখনই অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করেন না। যখন তাঁর ছেলেমেয়েরা ছোট ছিলো এবং তাঁর সঙ্গে থাকতো তখনো কোনোদিন তা করেননি। এখন তারা বড় হয়েছে, তাদের নিজেদের ঘরবাড়ি হয়েছে, এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। ঘর সাজানোর বস্তু বলতে কেবল দু'টি বড়-বড় ছবি —গান্ধীজী এবং নেহেরুজী। দা-সাহেব মনে করেন এঁরাই তাঁর পথ-প্রদর্শক এবং প্রেরণার উৎস। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র গীতার বাণী। ঘরের আনাচে-কানাচে রক্ষিত রয়েছে গীতা। তিনি সাধারণত কাউকে কোনো উপহার প্রদান করেন না কারণ লোক-দেখানো এই প্রথার প্রতি তাঁর কোনো আস্থা নেই। আর যদি উপহার দিতেই হয় তাহলে তিনি তাকে এক কপি গীতাই উপহার দেবেন।

গভীর কোনো ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষেত্রে তাঁর খাস কামরাটিই তাঁর বিশেষ পছন্দ। এই ঘরের দরজা সকলের জন্য অবারিত নয়। তবে তাঁর পেয়ারের লোকেদের কথা আলাদা। তাই, লখন সিং বিনা দ্বিধায় ভেতরে চলে এলো। লখন সিং দা-সাহেবের একান্ত আপন-জন। নির্ভরযোগ্য এবং স্নেহভাজন। দশম শ্রেণীর গণ্ডি পার হয়েই সে দা-সাহেবের সেবায় নিযুক্ত হয়। সদা-সর্বদা তাঁর তল্পিবাহক হয়ে তাঁর পেছনে ঘুরে বেড়াতো। আর তাকেই আজ দা-সাহেব সরোহা নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে প্রার্থী রূপে দাঁড় করিয়েছেন। দা-সাহেবের আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর সহকর্মীদের সে তারা যত তুচ্ছ হোক না কেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তিনি তাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন। তাঁর জীবনাদর্শ হলো —যাকে আশ্রয় দেবে তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতেও সাহায্য করবে। কিন্তু আজ যখন অর্থের বিনিময়ে আদর্শের বিকিকিনি চলছে তখন দা-সাহেবের আদর্শের প্রতি কে সম্মান দেখাবে? সুতরাং লখনের বিরোধিতায় সকলে গলা মিলিয়েছে। তাদের একটিই যুক্তি —সুকুলবাবুর বিরুদ্ধে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাকে অবশ্যই তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত হতে হবে। সুকুলবাবু এই প্রদেশে দশ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পরাজিত হবার পরও তাঁর প্রভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তাঁর তুলনায় লখনের সামর্থ্যই বা কতটুকু? দলের পরাজয় নিশ্চিত। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর যুক্তি অকাট্য। কিন্তু দা-সাহেবের অন্তর্দৃষ্টি শুধু এই যুক্তি পর্যন্তই সীমিত রইল না, তিনি তাদের আসল মতলবটাও বুঝতে পারলেন। আসলে সকলেই তাদের নিজেদের 'মনপসন্দ' লোককে খাড়া করার ফিকিরে ছিলেন। দা-সাহেব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মানুষের মধ্যে পদের লোভ যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে এরা দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে? কেউই খাটতে চায় না কিন্তু পদের জন্যে সকলেই লালায়িত। লখন সিং কোনোরকমে শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন পেলো, কিন্তু সেটুকু করেই তো আর নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। বিরোধী-দলের সঙ্গে সঙ্গে দলের অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদেরও সামলে রাখতে হয়। তা নইলে যদি

দলের পতাকার নিচে শেকড় কাটার কাজও চলতে থাকে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না। আজকাল নির্বাচনে দু'মুখো লড়াই লড়তে হয়। এক লহমার জন্যেও শান্তিতে বসা যায় না। সদা-সর্বদা সতর্ক, সাবধান থাকতে হয়। সকলের থেকেই সজাগ হতে হয়—সে দলের লোকই হোক অথবা বিরোধী-দলেরই সমর্থক হোক। লখনকে দেখে দা-সাহেব সস্নেহে স্বাগত জানালেন—'এসো লখন, কি খবর বলো ?' কিন্তু তার রাগত মুখের ওপর চোখ পড়তেই প্রশ্ন করলেন—'কি ব্যাপার, বাইরে কি বড্ড গরম ?'

'শুধু বাইরে ? আগুন তো আমার মাথায় জ্বলছে। এই জোরাভর বাড়াবাড়ি না করে থাকতে পারে না। নিজে তো মরবেই, আমাদেরও মারবে।'

প্রচণ্ড উত্তেজনায় রগের শিরা অব্দি দপ্‌দপ করছে তার। তাকে দেখে কি কেউ বিশ্বাস করবে যে সে দা-সাহেবের ছত্রছায়ায় মানুষ হয়েছে ? বরং ঠিক তার উল্টো। শুধু গায়ের রঙ আর চেহারার দিক দিয়েই নয়, স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকেও সে দা-সাহেবের ঠিক বিপরীত। তুচ্ছ কারণেই সে বড় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় সে তোতলাতে শুরু করে। দা-সাহেব অবশ্য তার এই বদমেজাজি স্বভাবের জন্য রাগ করেন না, শুধু হেসে বলেন—'তুমি হলে ভাই আমার পরিপূরক।' অপরের দোষ-ত্রুটির সঙ্গে মানিয়ে চলা দা-সাহেবের স্বভাব। বরং বলা উচিত এটা তাঁর উদারতা। এবং এই উদারতাই লখাকে ঢিট করে রেখেছে—নিষ্ফল আক্রোশে সে শুধু ফোঁস-ফোঁস করে।

'এখনো তো কিছুই হয়নি। ঘটনা খুবই সাধারণ। সরোহাতে বিসেসর নামে একজন খুন হয়েছে। তার লাস পাওয়া গেছে সাঁকোর ওপর। আসল ঘটনা তো তখন ঘটবে যখন হরিজনদের সব ভোট সুকুলবাবুর বাক্সে পড়বে। সকলেরই ধারণা এই কর্মকাণ্ডের নায়ক জোরাভর।'

'হুঁ।' দা-সাহেবের চেহারায় কোনো বিকার দেখা গেলো না।

'আপনি কিছু শুনেছেন ?'

'একটু আগে শুনলাম।' কণ্ঠস্বর এত সহজ এবং স্বাভাবিক যেন আদৌ কিছু ঘটেনি।

'জোরাভরকে ঘিরে গ্রামে প্রচণ্ড উত্তেজনা। সবার ধারণা সে ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে পারে না। আগুন লাগার ঘটনাকে কোনোরকমে ধামা চাপা দিয়ে গ্রামের মানুষকে সামলে রাখা হয়েছিলো। উচ্চ পর্যায়ে তদন্তও চলছে ···প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে ···আসল অপরাধীর খোঁজ পাওয়া গেলেই কঠোরতম দণ্ড দেওয়া হবে। কুটির শিল্পের জন্য আর্থিক অনুদানের পরিকল্পনার মলমে মানুষের হৃদয়ের ক্ষত কিছুটা শুকিয়ে এসেছিলো এবং এই সুযোগেই যদি ভোটটা হয়ে যেতো তাহলে ঠিক হতো ···।'

'কি সমস্ত বলছ ?' দা-সাহেব তাকে থামিয়ে দিলেন। 'কুটির শিল্প

অনুদান পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্যের ওপর মলম লাগানো যায় কিন্তু প্রিয়জনের মৃত্যুশোকের ওপর নিশ্চয়ই নয়। যেদিন পয়সা দিয়ে মানুষের সব দুঃখকষ্ট ঘোচানো যাবে সেদিন দুনিয়ায় মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকবে না।' কিন্তু লখন তার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে বলে চলেছে—'যখন বাতাস আমাদের পক্ষে বইতে শুরু করেছিলো তখনই এই মূর্খ বিসুকে খুন করালো। এখন অবস্থা আমাদের হাতের বাইরে।'

উত্তেজনায় লখনের মুখ থেকে থুতুর ফোয়ারা ছুটতে লাগলো। শামলা বর্ণ বেগুনি হয়ে উঠলো। এত কথা শোনার পরও দা-সাহেবের মুখমণ্ডলে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলায় বললেন—'পুলিশের এজাহার নেওয়া শেষ হলো না আর তুমি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে? এতখানি অধৈর্য হওয়া ঠিক নয়। কিছুটা...।' কিন্তু পুরো কথা শোনার ধৈর্য লখনের কোথায়? মাঝ-পথেই সে ফেটে পড়লো—'আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাইনি, গোটা গ্রামের লোক বলছে।'

'আইন অনুমানের ওপর নির্ভর করে চলে না, চলে প্রমাণের ওপর এবং পুলিশ এখন সেই প্রমাণ সংগ্রহ করছে। আইনের কাছে তোমার আমার মূল্যই বা কতটুকু?'

'এবার প্রমাণও জুটে যাবে। জোরাভর আর কতদিন নিজেকে বাঁচাবে?'

'প্রমাণ যদি জুটে যায় তাহলে উপযুক্ত সাজাও পাবে।'

'সে না হয় নিজের পাপের শাস্তি পেলো কিন্তু তার থেকেও বড় দণ্ড তো আমাকে ভোগ করতে হবে, অকারণে।' লখন যেন এবার কেঁদেই ফেলবে।

'কখনো কখনো এমন তো ঘটেই। একের মূর্খতার শাস্তি অন্যকে ভোগ করতে হয়।'

'আর আপনি সেই মূর্খটারই সঙ্গ ছাড়তে পারছেন না। যখন গরীবদের খুন করছে তখন তাকে দণ্ড পেতে দিন। জোরাভরের ভোট আমাদের দরকার নেই। ঐ ভোটের আশায় থেকে হরিজনদের ভোটগুলোতো হাতছাড়া হলোই, গাঁয়ের অন্যসব ভোটগুলোও গেলো। আমি হিসাব করে দেখেছি জোরাভর আমাদের ভরাডুবি করিয়ে ছাড়বেই। মাথায় কলঙ্কের বোঝা এবং বিবেকের দংশন—সে তো আলাদা কথা।'

আত্মগ্লানি এবং নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় লখনের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে উঠলো। মনে হলো, প্রচণ্ড মানসিক চাপে তার বিবেক আজ মুখর হয়ে উঠেছে। বিবেকের আহ্বান প্রচণ্ড শক্তিশালী। আর এই শক্তি এবং তেজকে সামাল দেবার মতো অনন্ত ধৈর্য দা-সাহেবের রয়েছে। তিনি একটু হাসলেন। অবশ্য এটাকে ঠিক হাসা বলা চলে না। ঠোঁটের বাঁ কোণটা একটু প্রসারিত হলো মাত্র। আসলে তাঁর হাসির ধরনই এ রকম। সম্ভবত কেউ তাঁকে খিলখিল করে হাসতে কখনও দেখেনি।

'তুমি তো দেখছি সমস্ত হিসাবই সেরে রেখেছ। কিন্তু আমি কি করব বলো, এত হিসাব-নিকাশ আমার স্বভাবে নেই। অঙ্ক আমার মাথাতেই ঢোকে না। শুধু ভুল-নির্ভুলের চিন্তাতেই আমার মন ডুবে থাকে।'

'তাহলে জোরাবর ঠিকই করেছে? কাউকে খুন করানো কি আপনার মতে সঠিক কাজ?' রাগের চোটে লখন পিছন থেকে তাকিয়াটা টেনে নিয়ে কোলের ওপর রাখে এবং তার ওপর হাতের চেটো দিয়ে একটা চাপড় মারে।

'তুমি দেখছি বড্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ছ। আসলে দোষটা তোমার নয়, দোষ তোমার বয়সের।' সামান্যতম বিচলিত না হয়ে দা-সাহেব একথা বলে থামলেন। লখন পিট্‌পিট করে বারকয়েক তাঁর মুখের দিকে তাকালো। এই মুহূর্তে তার প্রয়োজন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। তার বয়সের বা স্বভাবের বিশ্লেষণ সে চায় না।

'উত্তেজনা হলো রাজনীতির শত্রু! রাজনীতি করার জন্যে প্রয়োজন ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং ধৈর্য।' দা-সাহেব যেন জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ একটি বাক্য উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর একটু থেমে তিনি সাহস জুগিয়ে বললেন—'আসবে, আসবে, গদিতে যখন বসবে তখন দায়-দায়িত্ব আপনা থেকেই তুমি শিখবে।'

'গদি-টদির কথা ছাড়ুন। ওসব ভুলে যান। বিরোধী-দলের নেতা এ ঘটনাকে এমনভাবে কাজে লাগাবে যে আমরা কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখবো। এ তো বিশুর মৃত্যু নয়। ধরে নিন এক দিক দিয়ে আমাকে শেষ করা হলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকেই।' সে বুক চাপড়ে তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলো এমনভাবে যাতে দা-সাহেবের ভেতর পর্যন্ত কেঁপে যায়।

'হুঁ।' দা-সাহেবের হুঙ্কার শুনে মনে হলো তিনি যেন নতুন দিক থেকে পরিস্থিতির পূর্ণ মূল্যায়ন করছেন।

'ন' তারিখে অর্থাৎ তিন দিন পরেই বিরোধী-পক্ষের জনসভা। সুকুলজী নিজেই আসবেন ভাষণ দিতে। আপনি তো জানেন-ই সুকুলজীর বক্তৃতায় কি যাদু রয়েছে, আগুন ঝরে, স্রেফ আগুন। এমনিতেই গোটা গ্রাম তেতে আছে। এবার একটি মাত্র বক্তৃতার তোড়ে, সারাটা গ্রামকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন।' লখনও যেন দা-সাহেবের সন্ন্যাসী-মার্কা ভঙ্গিমাকে ভাঙবার জন্য আজ কোমর বেঁধেছে। 'আর এক হয়েছে এই "মশাল" পত্রিকার প্রকাশকরা। উল্টো-পাল্টা যা খুশি তাই ছাপছে। এমারজেন্সীর সময় বন্ধ হয়েছিলো ঠিকই হয়েছিলো। এই ধরনের সংবাদপত্রের ওপর তো আপনারও···।'

'চুপ।' দা-সাহেব লখনকে থামিয়ে দিলেন। 'এ তো তোমার কথা নয়, আজ তোমার স্বার্থ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিস্বার্থকে এতখানি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় তাতে বিবেকেরই মৃত্যু ঘটে। সংবাদপত্রের তো স্বাধীনতা অবশ্যই

থাকা উচিত। আমাদের কাজকর্ম, কথাবার্তার আদর্শ দর্পণ হলো তারাই। কেবল দেখতে হবে দর্পণ যেন ঝাপসা না হয়ে যায়। দর্পণে নিজের চেহারা দেখার হিম্মৎ মানুষের থাকা উচিত। সে জন্যে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস আর সামর্থ্য। যে মানুষ আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে ভয় পায় সে অন্যকে নয়, নিজেকেই ঠকায়।'

'আগুন লাগার ঘটনার কি সব ছবি ছেপেছিলো …কি সমস্ত সম্পাদকীয় লিখেছিলো। আজ কি তারা চুপ করে থাকবে? আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হতে দিন, দেখবেন কি প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় খবরগুলো ছেপে বার করেছে।'

'হুঁ।' দা-সাহেবের মুখে বা গলার স্বরে কোথাও উত্তেজনার ছিটে-ফোঁটা চিহ্ন নেই। ওদিকে লখনের ভেতরটা জলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার সম্ভাব্য বিপদের কথা তুলে ধরে সে চায় দা-সাহেবকে বিচলিত করে তুলতে, দা-সাহেবের স্থবিরতা দূর করতে। এবার তুরুপের তাস ছাড়লো লখন, 'আপনি তো জানেন লোচন ভাই বেশ কিছুদিন ধরে ঘোঁট পাকাচ্ছে। এবার দেখুন এই ঘটনা তাতে কি ইন্ধন জোগায়। ফন্দি-ফিকির এঁটে সে যদি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে তাহলে আপনাকেও হয়ত শেষ পর্যন্ত লোকসানের খাতায় নাম লেখাতে হবে। আমি কিন্তু বলে রাখলাম …।'

'লখন!' দা-সাহেবের মাত্র একটি হাল্কা ধমকেই লখনের মুখে কুলুপ পড়লো। 'যেদিন আমি দলের লোকের বিশ্বাস হারাব সেদিন নিজেই গদি ছেড়ে দেবো। সকলের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই তো আমি আমার গদিতে টিকে রয়েছি। তাদের শুভেচ্ছার ওপর ভরসা করেই তো আমি বেঁচে আছি। যদি সেই আস্থা ও শুভেচ্ছা না থাকে তাহলে আমার থাকার সার্থকতা কোথায়?'

'ঠিক আছে, সকলের বিশ্বাসভাজন হয়ে আপনি জমিয়ে রাজত্ব করুন… সুকুলবাবু জমিয়ে নিজের সভা করুন…দত্তবাবুও জমিয়ে তাঁর খবরের কাগজ চালান। কেবল আমিই আমার কবর খুঁড়ি।' —আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে লখন জবাব দিলো। তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে এবার ক্ষোভ, নৈরাশ্য এবং পরাজয়ের গ্লানি ফুটে উঠলো।

ঠিক সেই মুহূর্তেই টেলিফোন বেজে উঠলো। দা-সাহেব পাশ থেকে ফোনের রিসিভার তুললেন এবং তাকিয়ায় নিজের শরীরটাকে একটু এলিয়ে দিলেন। অন্য হাত দিয়ে মাথার অর্ধেক টাকের উপর পরম নিশ্চিন্ত মনে হাত বুলাতে লাগলেন। দা-সাহেবের এই নিশ্চিন্ত ভাব দেখে লখন ভেতরে-ভেতরে জলে যাচ্ছিলো। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই লখন পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়লো …।

'দা-সাহেব, ক্ষমা করবেন। এবার কিন্তু জোরাভরকে দাবিয়েও রাখতে পারবেন না আর এই কেন্দ্রে জিততেও পারবেন না। এবার আপনার চাল…' লখন কথা শেষ করলো না।

দা-সাহেবের চাল ব্যর্থ হোক বা নাই হোক, কিন্তু লখনের দা-সাহেবকে উত্তেজিত করে তোলার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। মৌনী সাধকের মতো নিশ্চল দা-সাহেব বসে রইলেন। শান্ত, অবিচলিত এবং নির্বিকার। লখনের মনের ক্ষোভ এবং দুশ্চিন্তা তিনি যে উপলব্ধি করতে পারছিলেন না তা নয়, কিন্তু কিছুতেই লখনকে আর পাত্তা দিতে তাঁর মন সায় দিচ্ছিলো না। বসার ভঙ্গিটা একটু বদলে নিয়ে তিনি তাকিয়ায় তাঁর শরীরটাকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিলেন। 'ঠাণ্ডা কিছু খাবে? কমলার শরবৎ? খেয়ে দেখো শরীর বড় ঠাণ্ডা করে।'

উত্তরের অপেক্ষা করা দা-সাহেবের স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি যা বলেন তাঁর কাছে তাই চূড়ান্ত। শরবতের কথা টেলিফোনে ভেতরে বলে দিয়ে তিনি ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। ধীরে গতিতে তাঁর ঘাড় সামনে-পেছনে দুলতে লাগলো। শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তিনি যেন একটা পরিকল্পনার ছক কাটতে লাগলেন। পরিকল্পনার অস্পষ্ট এক রূপরেখা ফুটে উঠতেই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করলেন।

লখন ভালোভাবেই জানে দা-সাহেবের দৃষ্টি যখনই শূন্যে নিবদ্ধ হলো তখনই বুঝতে হবে তিনি কোনো সমস্যার গভীরে অবগাহন করছেন। আর যখন একবার তন্ময় হয়ে পড়েছেন তখন একথা সুনিশ্চিত যে উপায় একটা পাওয়া যাবেই। লখন শুরু থেকেই দা-সাহেবের গভীর বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাসী। নিজের চোখে সে দেখেছে দা-সাহেব কেমন করে প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং সঙ্কটময় মুহূর্ত থেকে স্বচ্ছন্দে নিজেকে মুক্ত করেছেন। সে নিছক দর্শক হয়েই থাকেনি, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেছে। কিন্তু তাঁর এই সন্ন্যাসী-মার্কা হাবভাবই মাঝে-মাঝে তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। চাকর ঘরে ঢুকলে নিঃশব্দে সে শরবতের পাত্র হাতে তুলে নিলো। এই মুহূর্তে সে দা-সাহেবের চিন্তায় কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না।

কিছুক্ষণ পর দা-সাহেবের দৃষ্টি ঘরের কড়িকাঠের ওপর থেকে সরে গিয়ে নিবদ্ধ হলো লখনের মুখে। তাঁর অন্তর্ভেদী চাউনির সামনে লখন যেন অস্বস্তি বোধ করে। এতক্ষণ বসে-বসে সে দা-সাহেবকে মনে-মনে শাপ-শাপান্ত করছিলো। উনি টের পেয়ে যাননি তো! লখন সিং একথা খুব ভালোভাবেই জানে যে তার যোগ্যতায় নয়, দা-সাহেবের কৃপা-কটাক্ষেই সে আজ এই নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করছে। ওর জন্যে দা-সাহেবকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। সুকুলবাবুর তুলনায় সে তো নিতান্তই অর্বাচীন। নিজের দলের লোকেদের কাছেও সে অত্যন্ত সাদা-মাঠা একজন। কিন্তু দা-সাহেবের কাঁধে ভর দিয়ে সমস্ত বিরোধিতা নস্যাৎ করে তার তরী অবশেষে কূলে ভিড়লো। তা নইলে, লখনের ব্যক্তিগত যোগ্যতা তো অফিসের চেয়ার-টেবিল সাজানো পর্যন্তই সীমিত। আজ যদি সে নির্বাচনে জয়লাভও করে তাহলে সে জয় দা-সাহেবের দূরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা এবং পরিশ্রমের জন্যেই সম্ভব হবে। কিন্তু আর তো কোনো আশাই নেই তবুও…।

'যে ছেলেটা খুন হয়েছে তার নাম কি ?' দা-সাহেবের মৌনতা ভঙ্গ হলো।

'বিসেসর। গাঁয়ের সবাই বিসু বলেই ডাকে।' ঠাণ্ডা শরবৎ লখনের গলার স্বরের উগ্রতা এবং নিরাশাকে বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি। কেন কে জানে, তার বার-বার মনে হচ্ছিলো যে সে খেলা শুরু হওয়ার আগেই হেরে বসে আছে। অথচ কাজটা কত সহজ ছিলো ···কিন্তু কেমন করে যে দা-সাহেব এই ভুলটা করলেন !

কয়েক মুহূর্তের জন্য দা-সাহেব মৌন হলেন। তাঁর চোখের চাহনি আবার ঘরের কড়িকাঠে নিবদ্ধ হলো।

'মাস আষ্টেক আগেই তো এই ছেলেটি জেল থেকে ছাড়া পায়, তাই না ? চার বছর সে জেলে ছিলো ?'

'আপনি কোত্থেকে জানলেন ?' লখন হতচকিত হয়ে গেলো। তাহলে মনে হচ্ছে দা-সাহেব নড়েচড়ে বসলেন !

'জানতে তো হবেই ভাই। নইলে যে পদে বসে আছি, তার ওপর সুবিচার করব কি করে ?'

এত কথা শোনার পরেও লখনের মুখের ওপর প্রশ্নচিহ্ন আগের মতোই ঝুলতে থাকলো। তাই দা-সাহেব বললেন, 'ডি. আই. জি. সকালে টেলিফোন করেছিলেন।'

'কি বললেন ?' লখনের কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা ঝরে পড়লো।

'কি ব্যাপারে ?'

'বিসুর মৃত্যু সম্পর্কে। মনে হচ্ছে, এ মামলার সমস্ত কাগজপত্র ডি. আই. জি.'র কাছে পৌঁছে গেছে।'

দা-সাহেব শুধু ঘাড় নাড়লেন।

'আপনি কোনো নির্দেশ দেননি ? ···মানে কোনো সঙ্কেত যা রিপোর্ট তৈরির সময়···' দা-সাহেবের চোখে চোখ পড়তেই সে থমকে দাঁড়ালো।

'কি বলছ, লখন ?' দা-সাহেবের গলার স্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেলো। 'পুলিশের কাজই হলো এজাহার আর প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরি করা এবং নিষ্ঠার সঙ্গেই তা করা। এবং এ জন্যেই তাদের বেতন দেওয়া হয়। ওপর থেকে যদি হুকুম জারি করা হয়, তা ন্যায় বিচার করব কি করে ? এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যেই তো আমরা একদিন আজাদীর লড়াইয়ে নেমেছিলাম। আর তুমি কি-না··· ।' এক মুহূর্ত থেমে ধারালো চোখে লখনকে একবার দেখে নিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'লখন, তোমার লোভ একটু সংযত কর। তা নইলে, আমার সঙ্গে চলা তোমার পক্ষে মুশকিল।'

লখন নিমেষে ভয়ে চুপসে গেলো। দা-সাহেব যদি নিজেই তাকে খুলে বলতেন যে কিভাবে তিনি ব্যাপারটাকে সামলে দিতে চলেছেন, তাহলে কি ছাই সে অহেতুক প্রশ্ন করতে যায় ? কিন্তু দা-সাহেব টেলিফোনের রিসিভার তুলে

অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কোন একটি পরিকল্পনার ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করলেন। লখন ভেতরে-ভেতরে গুমরে মরছিলো। বিসুর মৃত্যুই এই মুহূর্তে ওর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিভাবে একজন এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে? কি-ভাবে একজন এই ঘটনা এত সহজ, সাধারণ মনে করতে পারে? যেন বিসুর মৃত্যু একটা মামুলি ঘটনা —স্রেফ একটা মৃত্যু! টেলিফোন শেষ হতেই সে মনে সাহস এনে বললো, 'ডি. আই. জি. কেন ফোন করেছিলেন?'

'আসলে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ইনিও প্রমোশনের জন্য ছটফট করছেন। এটাই মানুষের স্বভাব। কেউ তার নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। আরো চাই ···আরো চাই।'

'কিন্তু আই. জি.'র বদলি তো আটকে গিয়েছে। ডি. আই. জি.'র প্রমোশন কিভাবে হবে?' লখনের স্বভাবজাত শঙ্কা ও ঔৎসুক্য এখানেও প্রকাশ পেলো। কিন্তু দা-সাহেব নির্বিকার, সহজকণ্ঠে বললেন, 'এতদিন আমিই আটকে রেখেছিলাম। স্বীকার করি, সে একটু-আধটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কিন্তু ওরই-বা দোষ কি? ও তো অসহায়। ওপরতলার হুকুম তামিল করতে সে বাধ্য। আসলে দাসত্ব বিবেককে গলা টিপে মারে।'

'লোকটি এমনিতে ভালোই···। কিন্তু ঐ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায়···।' দা-সাহেব কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, 'কি করব? ওপর থেকে হুকুম এলো, বদলি কর। ওপরওলাদের এই ছড়ি ঘোরানোটাই বড় বাজে ব্যাপার।'

'তাহলে, ডি. আই. জি.'র প্রমোশন হচ্ছে?' লখন এক মুহূর্ত মনে-মনে কি ভাবলো? ভুলেই গেলো এই একটু আগে দা-সাহেবের কাছে ধাতানি খেয়েছে। ত্বড়বড় করে বলে উঠলো, 'তাহলে তো আপনি তাকে ডাকিয়ে ঠারে-ঠোরে···'

'লখন!' দা-সাহেবের হিম-কঠিন কণ্ঠস্বর কানে যেতেই লখনের জিভ তালুতে সেঁধিয়ে গেলো। পরক্ষণেই দা-সাহেব আবার স্বাভাবিক। 'গদি পাওয়ার লোভে হিতাহিত জ্ঞান হারিও না। কর্মচারীদের ওপর এভাবে আদেশ চাপানোর অর্থই হলো তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। তাই, আমার দ্বারা এসব সম্ভব নয়। আমার একান্ত ইচ্ছা সকলকে নিজ-নিজ অধিকার সঁপে দিয়ে, নিজে ভারমুক্ত হয়ে যাই।'

'তাহলে তো আর কোনো আশাই নেই।' গভীর হতাশায় ডুবে গেলো লখনের স্বর। 'ঠিক আছে। ফাঁসুক জোরাভর। আমি গতবারই বলেছিলাম ওকে বাঁচানোর খেসারত দিতে হবে।'

'তুমি তো মহামূর্খ! তখন থেকে এক কথা ঘ্যানঘ্যান করে চলেছ। রক্ষা করার আমিই-বা কে? ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণ আইনের। লোকে সাক্ষী দিলো না ···পুলিশ প্রমাণ জোটাতে পারলো না। সুতরাং যা হবার তাই হলো।'

জীবনে এই প্রথম লখন অনুভব করলো দা-সাহেবকে পুরোপুরি চেনা সম্ভব নয়। দা-সাহেবকে সে যতটুকু জানে, তাতে তাঁর মধ্যে এই ধরনের নির্লিপ্ততা মোটেই সম্ভব নয়। অন্যথায় সব কিছু খুলে বলছেন না কেন? অথচ ওঁর নির্বাচনের সময় লখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিলো। আজ মৌকা মিলে গেছে, উনি গান্ধীবাবা সেজে বসে আছেন।

'তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি মনোবল হারিয়ে ফেল। এটা কোনো কাজের কথা নয়।' লখনের মানসিক আলোড়ন এবং দুশ্চিন্তার কথা ভেবে, চাউনিতে স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে দা-সাহেব তাকে সান্ত্বনা জানালেন। এ কথার কি জবাব দেবে লখন? ভেতরে-ভেতরে রাগে গজরায় সে। দা-সাহেবের গদি এখন নিরাপদ। তাই আদর্শ এবং উপদেশের কথা সুনতে বিলোচ্ছেন। যেদিন তাঁর আসন টলে উঠবে, সেদিন এই একই কথা সে জিজ্ঞাসা করবে। যদি নির্বাচনে হেরে যান ···এবং যেভাবে গান্ধী-বাবা সেজে বসে আছেন, তাতে পরাজয় সুনিশ্চিত ···সেদিন দেখা যাবে। উল্টে যাবে গোটা মন্ত্রিপরিষদ! কে-না জানে সুকুলবাবুকে। যতদিন না তিনি দা-সাহেবের মন্ত্রিত্ব ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছেন, ততদিন তিনি নিজেও শান্তি পাবেন না, এদেরও শান্তিতে থাকতে দেবেন না। কেন এই বিপদ দা-সাহেবের নজরে পড়ছে না?

'আমার হার তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কিন্তু সুকুলবাবুর জয়লাভ নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গত নির্বাচনে হারানো ভোটগুলো খুব সহজেই তিনি পেয়ে যাবেন। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন।' এই বিপদের কথাতেও দা-সাহেব বিচলিত হলেন না।

'জনগণের আস্থা যদি সুকুলবাবুর ওপর থাকে এবং তারা যদি তাঁকেই ভোট দেয়, সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমিই তাকে স্বাগত জানাবো। কারণ, তাতে সুকুলবাবুকে নয়, জনতার রায়কেই স্বাগত জানানো হলো। আর জনতা তো আমাদের জন্যে···'

'তাহলে ঠিকই আছে···।' অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে লখন দা-সাহেবকে মাঝপথে বাধা দিলেও নিজে তার বক্তব্য সম্পূর্ণ করলো না। দা-সাহেব লখনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন। স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বোঝাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখো, আমার কাছে রাজনীতি ধর্মনীতি সমান। যদি আমার সঙ্গে পথ চলতে চাও, গীতার উপদেশ হৃদয়ে গেঁথে নাও। কেবল নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার কর্তব্য তুমি পালন কর। ফলের আশা করো না।' একটু থেমে বললেন, 'গীতা পড় তো? পড়ো, মনে বড় শান্তি পাবে।'

এমন একটা জবাব দেবার ইচ্ছে হলো লখনের, যা শুনে গীতা-ফিতা সব-মাথায় উঠে যায়। নিজের নির্বাচনের সময় তো হা-হুতাশে আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তুলেছিলেন। জিতে গেছেন, অমনি শুরু হয়েছে গীতার বাণী। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো লখন। কড়া কথা সে বলতে পারে। কিন্তু দা-সাহেবের সামনে অশিষ্ট আচরণ করার দুঃসাহস তার নেই।

হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো দা-সাহেব তার মুখের পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। সে ভয় পেলো। তার মনে হলো তাঁর চশমা একটা বিশেষ ধরনের লেন্স দিয়ে তৈরি যা দিয়ে তিনি মানুষের ভেতরটাও স্বচ্ছন্দে স্পষ্ট দেখতে পান। গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলেন এবং তারপর সেখান থেকেই একটা প্রসঙ্গ টেনে বলতে শুরু করলেন, 'সুকুলবাবুর মিটিং ন' তারিখে। এক কাজ কর। ঐ মিটিঙের চার-পাঁচ দিন পর আমাদেরও একটা মিটিঙের ব্যবস্থা কর। গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাবে। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেলো, যাওয়া তো উচিত। অভাগার দল… ।'

'যাবেন আপনি? …খুব ভালো হবে। নির্বাচনের পর ওদিকে তো একবারও আপনার যাওয়া হয়ে ওঠেনি।' লখন হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। পরক্ষণেই যেন কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিমায় সে বললো, 'কিন্তু একটাই ভয়। সুকুলবাবুর মিটিঙের পর আমাদের সভা জমানোই মুশকিল হবে। আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি গ্রামে দারুণ উত্তেজনা। গাঁয়ের লোকেরা আগের মতো আর মূর্খ নেই।'

'এ তো বড় খুশির কথা। বহু বছরের সাধনার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে এই জাগরণ এসেছে। বাপু তো এই স্বপ্নই দেখেছিলেন।' চোখ বুজে দা-সাহেব বাপুর সেই স্বপ্নের জগতে তন্ময় হয়ে গেলেন। অপ্রস্তুত লখন পিট্‌পিট করে দা-সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে কখন দা-সাহেবের সমাধি-ভঙ্গ হবে, এবং পরবর্তী নির্দেশ মিলবে। যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তাকে দা-সাহেবের ওপরই নির্ভর করে থাকতে হবে। দা-সাহেব চোখ খুললেন এবং ঘড়ির দিকে তাকালেন —ন'টা বাজে। 'ঠিক আছে তুমি তাহলে পাণ্ডেকে বলো সে যেন মিটিঙের ব্যবস্থা করে। পাণ্ডে চালাক লোক, পরিস্থিতিকে সামাল দিতে জানে।'

উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিমায় বললেন —'হ্যাঁ, যাওয়ার সময় "মশাল"-এর অফিসে একটা ঢুঁ মেরে যেও। সম্পাদকের নাম তো দত্তবাবু? মাস তিন-চার আগে একটা সাক্ষাৎকারের জন্যে সময় চেয়েছিলেন। …কিন্তু তখন সময় কোথায়? বলে দিও, সময় করে একবার যেন দেখা করে যান।'

দা-সাহেব লখনের পাশে এসে দাঁড়ান। স্নেহভরে তার পিঠে হাত রাখেন। 'তোমার এই উত্তেজনা আজ আমার একদম ভালো লাগেনি। আমার সঙ্গে চলতে হলে বাক্‌-সংযম এবং ধৈর্য আয়ত্ত করতে হবে…, …বুঝলে।'

দা-সাহেবের এ শুধু কথার কথা নয়, বাস্তবেও তিনি তা প্রয়োগ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে, কথাবার্তায় এমন কি সমস্ত কাজকর্মে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য রয়েছে। আর এই গুণাবলীর জন্যেই তিনি আজও গদিতে টিকে রয়েছেন। তা না হলে দশ মাস ধরে বিরোধী-দল এবং তাঁর দলের বিক্ষুব্ধ-গোষ্ঠী যে রকম টিক্‌রম্‌বাজি করে চলেছে তাতে এতদিনে তাঁর ডিগবাজি খাওয়ার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

শহরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ লোকালয়, সুকুলবাবুর বাসভবন। দশ বছর ধরে তিনি এই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নির্বিঘ্নে একচ্ছত্র রাজত্ব করে এসেছেন। কিন্তু সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি যে রাজত্বের ভিত এত সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন, এক ঝটকায় তা সমূলে উৎপাটিত হবে একথা তিনি ভাবতেই পারেননি। যেন সে রাজত্বের তলায় কোনো শেকড়ই গজায়নি। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে? এমনিতে সুকুলবাবুও কিছু কম ক্ষমতাশালী নন। বাস্তবিক ঝাণ্ডু লোক। জনসাধারণ সুকুলবাবুকে দা-সাহেবের সমপর্যায়ের নেতা হিসেবে গণ্য করে থাকে। তবে এমনিতে দা-সাহেবের সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনাই হয় না। গায়ের রঙ শামলা —বেঁটে-খাটো চেহারা। একটু থলথলে (মেদবহুল) শরীর। দা-সাহেবের মতো সৌম্য-সংযত ভাব তাঁর মধ্যে নেই। সুরা-সুন্দরীর প্রতি কোনো অনীহা তাঁর নেই, বরং বলা যায়, তিনি যথেষ্ট অনুরাগী। যেসব অভাগার এ জগতের সমস্ত কিছু ভোগ করার সৌভাগ্য হয় না, সুকুলবাবু তাদের দলে নাম লেখাতে আদৌ রাজি নন। মহা মজলিসী লোক! নিজের বন্ধু-বান্ধবের মাঝে অসঙ্কোচে কাঁচা খিস্তি করেন। সংযমের কোনো বালাই নেই। তাঁর ধারণা, কথার মাঝে খিস্তি, বক্তব্যকে আরো ধারালো করে তোলে। কিন্তু বাইরের লোকের সামনে তিনি বেশ বুঝে-সমঝে চলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে সুকুলবাবুর অগাধ বিশ্বাস। চার আঙুলে নানারঙের পাথর বসানো চারটে আংটি। গলায়, হাতে অসংখ্য তাবিজ-মাদুলি। এই গত মাসেই তো নীলা ধারণ করেছেন। এর আগেও ধারণ করে পরখ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। নীলা ভারি তেজী পাথর। না সইলে একদম সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে। আর ধারণ না করেই যখন ভরাডুবি হলো, তখন ধারণ করাই ভালো। ব্যাস্, সঙ্গেসঙ্গেই খেল্ শুরু হলো। খেল্ আর কিছুই নয় —বিসুর মৃত্যু! যেন মনে হচ্ছে থালায় ভাত বেড়ে কেউ তার সামনে এগিয়ে দিয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে। সুযোগ তো আগেও এসেছিলো, আরো মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু সে সময় দলের ভেতরের 'কুরুক্ষেত্তর' সামলাতেই জেরবার অবস্থা। এই বাষট্টি বছর বয়স অব্দি রাজনীতিতে কতশত সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন সুকুলবাবু যে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা? ছ্যা, ছ্যা, ···। দিব্যি রাখালের পাচনের ঘায়ে সব ক'টা গোরু-ভেড়া ম্যা-ম্যা-হাম্বা-হাম্বা করতে-করতে কেমন এগুচ্ছিলো। আর যেই সে পাচন ভাঙলো অমনি সব এমন গুঁতোগুতি শুরু করে দিলো যে কে বলবে তারা এক পালেরই গোরু-ভেড়া! এবার ঝাপা-ঝামেলা॰ সামলাতে হয়েছে প্রচুর। অন্য কেউ হলে এতদিনে

হাল ছেড়ে দিতো। সুকুলবাবু বলেই টিকে আছেন। শুধু টিকে নয়, অন্য সবাইকে কাৎ করে দিয়ে বহাল তবিয়তে টিকে আছেন। কিন্তু, আজ মন বড় ক্ষুব্ধ (উচাটন)। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন রাজনীতি আর গুণ্ডামিতে কোনো তফাৎ নেই। যে দেশে দেবতুল্য রাজনৈতিক নেতাদের আবির্ভাব ঘটেছে, সে দেশে আজ রাজনীতির এতটা অধঃপতন! কখনো-কখনো মনে বৈরাগ্যের ভাব জেগে ওঠে। কিন্তু রাজনীতির এত গভীরে তাঁকে নিমজ্জিত হতে হয়েছে, যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। রাজনীতি ছেড়ে দেবার সোজা অর্থটাই হলো হার স্বীকার করা। আর ঐ একটিমাত্র জিনিস যা তিনি প্রাণ থাকতে মেনে নিতে রাজি নন। গত নির্বাচনে হেরে যাবার পর এক দিনের তরেও মন থেকে তা মেনে নেননি। সেই হারের শোধ নিতে হবে—তা সে যেভাবেই হোক। এ ব্যাপারে তিনি কৃতসঙ্কল্প।

আজ সারাদিন ধরে বসে-বসে সুকুলবাবু মনে-মনে দানের ঘুটি সাজাচ্ছেন—সন্ধ্যেবেলার ভাষণে কোন কোন বিষয় উত্থাপন করতে হবে ...কত ভোট যাবে ...আর কতই-বা আসবে। এতদিন তো হরিজনদের ভোটের ভরসাতেই জিতে আসছিলেন। গতবার এরা মুখ ফিরিয়ে নিতেই তাঁর ভরাডুবি হয়ে গেলো। কিন্তু এবার তারা কেমন করে মুখ ফিরিয়ে থাকবে আর কেনই-বা থাকবে? বিসু গোটা জীবনটা তো এদেরই জন্যে লড়েছে। সেই বিসু কিভাবে মারা গেলো, তার কৈফিয়ৎই তো তিনি সরকারের কাছে চাইবেন? তারা কি তাঁকে সমর্থন জানাবে না? নিশ্চয়ই জানাবে। আর যদি হরিজনদের সমর্থন মিলে যায় তবে তো তাঁর জীবনেই আবার 'আশার রাগিণী' বেজে উঠবে।

হঠাৎ তাঁর মন বিসুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। কিন্তু ভয় একটাই—জোরাভর না আবার কোনো হুজ্জতি বাধিয়ে বসে। একদম গণ্ডমূর্খ আকাট একটা! কিন্তু সারা গাঁ আর পঞ্চায়েতে তার প্রচণ্ড প্রভাব। গাঁয়ের লোক নাম শুনলেই থরথর করে কাঁপে। আর প্রধান তো ওরই কাকা। ভালোয়-ভালোয় একবার যদি তিনি সভা জমিয়ে তুলতে পারেন তাহলে সেই স্রোতের দাপটে সবাই ভেসে যাবে, আর এই স্রোতের দাপট যে কি জিনিস তা তিনি খুব ভালোই জানেন। কিছুদিন আগে যা এসেছিলো তাও তো এক জোড়ো হাওয়া, কেবল জোড়ো হাওয়া নয়, একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। এই ঘূর্ণিঝড় দেখা দিলো অন্ধ্রে, দিল্লীতে, উড়িষ্যায়। গদিতে আসীন সবাই হুড়্দাড়্ জমিতে শুয়ে পড়লো। রাঘব-বোয়ালেরা একে-একে ধরাশায়ী হলো, তারপর শুরু হলো দেশজুড়ে ঘূর্ণিঝড়ের দাপট। এই ঘূর্ণিঝড়ে পাল্টে গেছে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভূগোল। এ ঘটনায় আবার যদি কোনো ঝড় ওঠে তাহলে বলা যায় না হয়ত তাঁর ভাগ্যও খুলে যেতে পারে। একবার যদি বিধানসভায় ঢোকা যায় তাহলে সেখানেও তিনি একটার পর একটা ঝড় তুলবেন। ভাঙা-গড়ার খেলায়

নিজের ওপর সুকুলবাবুর অগাধ বিশ্বাস। নড়বড়ে, ফাঁপা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্ত্রিসভাকে ভাঙতে কতক্ষণ? নিজের লোকেরা যদি এ ব্যাপারে তাঁকে একটু সাহায্য করে তো এটা তাঁর কাছে বাঁ হাতের কাজ।

সুকুলবাবু বক্তৃতা দেবেন —একথা শোনার পর গ্রামের থমথমে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ কেটে গেলো। এর আগে এক অদ্ভুত বিষাদের ছায়ায় ঢাকা পড়েছিলো সরোহা গ্রাম। বিসুর লাস যতক্ষণ গ্রামের রাস্তায় পড়েছিলো, গ্রামে হৈচৈ-এর অন্ত ছিলো না। ভিড় বাড়ছিলো, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিলো কথাবার্তা। যতগুলো মুখ, তত প্রশ্ন। —কে খুন করলো বিসুকে? কিভাবে মরলো বিসু? দেহের কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। রাতে বহাল তবিয়তে খেয়েদেয়ে শুলো, সকালে লাস পাওয়া গেলো রাস্তায় সাঁকোর ওপর। যেখানে মরা এবং মারার জন্যে আকছার লাঠি, পাবরা, বন্দুকের রেওয়াজ সেখানে এই রহস্যজনক মৃত্যু স্বভাবতঃই কৌতূহলের জন্ম দিলো।

পুলিশের এতটা তৎপরতা গ্রামের লোক কস্মিন্‌কালেও দেখেনি। বোধহয় আগেকার ঘটনার শিক্ষা তারা এত তাড়াতাড়ি ভোলেনি। খবর পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই থানার দারোগা কনস্টেবল-সহ তড়িঘড়ি ছুটে এলেন। কত লোকের যে এজাহার নেওয়া হলো তার হিসাব নেই। —কে প্রথম বিসুর লাস দেখেছে, কি অবস্থায় দেখেছে, যেন বিসুর কুষ্ঠি-বিচার শুরু হলো। কোথায় কবে কি বলেছে, কি করেছে। ওর বন্ধু কারা, শত্রুতা কার সঙ্গে ছিলো। কাদের সঙ্গে ও মেলা-মেশা করতো? পুলিশ তার সারাজীবনের ইতিহাস লিখে নিয়ে গেলো যা সম্ভবত বিসু কোনোদিন লিখতো না।

লাস নিয়ে যাবার পরই গোটা গ্রামে এক অদ্ভুত নীরবতা ছড়িয়ে পড়লো। সে নীরবতা উত্তেজনায় ভরা। গ্রামের পূব দিকে এক বড়সড় আখড়া আছে —জুম্মন পালোয়ানের আখড়া। সে আখড়ায় তিরিশ-চল্লিশ জন জোয়ান লাল লেংটি পরে রাতদিন ব্যায়াম করে। ডন মারা, লাঠি খেলা, মুগুর ভাঁজা, কুস্তি করা —একটা-না-একটা কিছু চলছেই। গাঁয়ের মানুষ সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরতে-ফিরতে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে। এই আখড়া শুধু যে গাঁয়ের মানুষের আনন্দ যোগায় তাই নয়, তাদের আতঙ্কের উৎসও বটে। সেই আখড়ার ছেলেরা যখন তেল-খাওয়া লাঠি ঘাড়ে করে গ্রামের অলিগলি, হাটেবাজারে চক্কর খেতে থাকে, তখন গাঁয়ের লোকেদের আতঙ্কে জিভ তালুতে সেঁধিয়ে যায়। বিসুর লাস ময়না তদন্তের জন্যে শহরে নিয়ে যাবার পর-পরই আখড়ার পেঠেলরা গ্রামে দাবড়ে বেড়াতে লাগলো। ফলে গাঁয়ের লোকের মুখে কোনো কথা নেই, খালি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস। বিসু কিভাবে খুন হলো এটা বুঝতে না পারলেও সবাই একটা ব্যাপার পরিষ্কার জানে —এই

হত্যাকাণ্ডের নাটের গুরুটি কে। তার নামই-বা কি, হত্যার কারণটাই-বা কি? কিন্তু সবই মনে-মনে। অনাহারের সময় সে নাম মুখে পর্যন্ত আনেনি। এমন কি স্বয়ং বিসুর বাবা পর্যন্ত না!

আজ দুপুর থেকেই গ্রামে বেশ-একটা আনন্দ-উল্লাস। একটা জীপে মাইক বেঁধে রাস্তায়-রাস্তায় প্রচার করা হচ্ছে, 'আজ সন্ধ্যে ছ'টায় হরিজনদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সুকুলবাবু আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আসবেন। বিসেসরের মৃত্যু এক নির্লজ্জ জুলুম। এ অসহ্য! আসুন—আমরা সুকুলবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি—'বন্ধুর খুনের জবাব চাই। সন্ধ্যে ছ'টায়।'

মনে হচ্ছিলো বিসু হীরার ছেলে নয়, সুকুলবাবুর নিজেরই ছেলে। তার মৃত্যু-শোক যেন তাঁর নিজেরই ব্যক্তিগত শোক। সেই শোকে সমব্যথী হবার জন্যেই যেন আজ তিনি সমস্ত গ্রামবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

বেলা চারটে নাগাদ গোটা গাঁয়ে বেশ-একটা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়ে গেলো। গোটা দুই তক্তপোশ জুড়ে মাঠের ধারে মঞ্চ তৈরি করা হলো। গদি বিছানো হলো, গোল তাকিয়া দিয়ে সাজানো হলো। বাস্, এবার সুকুলবাবু সশরীরে হাজির হলেই হয়। আজ গাঁয়ে এক-দেড়শো নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। জোরাজুরি যদি কোনো ঝামেলা পাকায় তো এরাই সামলাবে। ...নচেৎ জনসভায় সমাগম তো বাড়বে। অন্তত কালকের কাগজে এ খবর তো ছাপা হবে যে সুকুলবাবুর ভাষণ শোনার জন্যে আশপাশের গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছিলো। আজ গদি নেই তো কি? সুকুলবাবু তো আর এমন-কিছু হেঁজিপেঁজি লোক নন!

গাঁয়ের ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের দল গাঁয়ের বিষণ্ণ পরিবেশে কেমন-যেন মুষড়ে পড়েছিলো। আজ তাদের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠেছে। যেন মেলা-টেলা কিছু-একটা লেগেছে। প্রথমে জীপের পেছন-পেছন খুব এক-চোট দৌড়াদৌড়ি করলো। তারপর কাগজের ভেঁপু বানিয়ে নিজেরাই চেঁচামেচি জুড়ে দিলো। উপলক্ষ্য শোকের না আনন্দের—এ নিয়ে থোড়াই তাদের মাথাব্যথা! হৈচৈ করার একটা সুযোগ তো মিলেছে!

কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টার সময় সুকুলবাবুর অ্যাম্বাসাডর গ্রামে ঢুকলো। ঘড়ির কাঁটা মেনে চলেন সুকুলবাবু। তাঁর সঙ্গে দু'টো মোটর গাড়ি, তিনটে জীপও এসেছে। সেগুলো থেকে হুড়্‌দাড় করে নামলো কিছু লোক। দলের পক্ষ থেকে তাদের স্বাগত জানাতে কিছু লোক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। শুকনো মৌখিক অভ্যর্থনা। ফুলের মালার চিহ্ন কোথাও নেই কারণ উপলক্ষটা তো শোক পালন। এই সমস্ত ছোটখাটো জিনিসের প্রতি নজর রাখা অত্যন্ত জরুরী। সবাই একে-একে মঞ্চে উঠলো। মন্থর গতিতে মঞ্চে এলেন সুকুলবাবু। এই মন্থরতা কিছু বয়সের জন্যে আর কিছুটা আজকের পরিবেশের জন্যে।

মঞ্চে উঠেই সমবেত জনতার দিকে তিনি হাতজোড় করে নমস্কার করলেন।

সভায় লোক কি রকম হয়েছে তা বোঝার জন্যে তিনি চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলালেন। সব ঠিকই আছে, সুতরাং আত্মতৃপ্তির ছোঁয়া লাগলো তাঁর চোখে মুখে। এখন শুধু ভালোয়-ভালোয় সভার কাজ মিটলে হয়। তিনি উপস্থিত লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিলেন জমি প্রস্তুত, এখন শুধু বীজ বপন করলেই হয়। আজ তিনি অ্যায়সা বক্তৃতা ঝাড়বেন যে কার সাধ্যি তাঁকে আটকায়। মনে-মনে একবার হাতের আঙুলের নীলাটিকে একটা পেন্নাম ঠুকে নিলেন, তারপর মাইকের ডাণ্ডাটা জোরসে পাকড়ে ধরলেন।

বক্তৃতাটা তিনি ভালোই দেন। বিরোধী-পক্ষের যুক্তিকে ফালা-ফালা করে কাটতে তাঁর জুড়ি নেই। একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে তিনি শুরু করলেন—

'আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

আজ আমি এখানে এসেছি আপনাদের দুঃখের ভাগ নিতে। অবশ্য দুঃখ এর আগেও আপনারা পেয়েছেন এবং সে দুঃখ আজকের তুলনায় অনেক বেশি। এবং যে আঘাত আপনারা পেয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। এমন অমানুষিক অত্যাচার চোখের সামনে দেখা যায় না। এই অত্যাচারের কথা যখন আমি শুনলাম আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত জলে উঠেছিলো, অথচ আশ্চর্য দেখুন এখনো পর্যন্ত কেউ কোনো শাস্তি পেলো না।' তিনি এক লহমার জন্যে থামলেন। 'এই হরিজনরা কি দোষ করেছে? এটুকুই তাদের অপরাধ যে তারা সরকার-নির্ধারিত মজুরি দাবি করেছিলো। এটা কি অপরাধ? বোধহয় এটাই তাদের অপরাধ। তাইতো জ্যান্ত লোকগুলোকে পুড়িয়ে মারা হলো। আর যারা পুড়িয়ে মারলো, তাদের কোনো শাস্তিই হলো না। হতভাগ্য বিসু এই দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো বলেই তাকে চিরকালের মতো চুপ করে যেতে হলো। তাই আজ কারো কোনো প্রতিবাদ করার সাহস নেই। সাহস হতেও পারে না। পুলিশ বয়ান নিতে এলো, কারো সাহস হলো না সত্যি কথাটা বলার। আপনারা জানেন, যে সত্যি কথা বলবে তারই কণ্ঠরোধ করা হবে। এবং যেখানে সত্যের কণ্ঠরোধ করা হয় সেখানে সুবিচারের আশা দুরাশা মাত্র। ভুলে যান যে আপনারা কখনও ন্যায় বিচার পাবেন।'

প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে সুকুলবাবু একটু থামলেন। কিন্তু জনগণ নির্বাক। ভাব-লেশহীন মুখ।

সুকুলবাবু আবার শুরু করলেন।

'এজাহারের নাটক তো শেষ হলো, আর তা বেশ তৎপরতার সঙ্গেই হলো। এবার তদন্তের ভার পড়বে উচ্চপদস্থ অফিসারদের ওপর। এঁরা কখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন না। অন্তত নির্বাচন চুকে যাবার আগে তো নয়-ই। আপনারা মরুন বা বাঁচুন—তাঁদের তো মাথাব্যথা নির্বাচনে জেতা নিয়ে, তা সে যেভাবে হোক। সেই নির্বাচনে জেতার মূলধন হলো গাঁয়ের জোতদারের ভোট আর টাকা।

আর সেই কারণেই তাদের সবরকম অত্যাচার, অন্যায়, জোর-জুলুমকে ধামাচাপা দিয়ে তাদের বাঁচাতে হবে। কাজেই ভালো করে জেনে রাখুন এই খুনের কোনো কিনারা হবে না। আর করবেটাই-বা কে? পঞ্চায়েত এদের ...পুলিশ এদের... আর আজ তো এ বিশ্বাসও আমাদের জন্মে গেলো যে সরকারও এদেরই। তাই কারা আজ আপনাদের হয়ে লড়বে? আপনাদের ন্যায্য দাবি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আপনাদের পাশে আজ কে দাঁড়াবে?'

প্রশ্নগুলো সুকুলবাবু সভায় উপস্থিত মানুষের মাঝখানে ছুঁড়ে দিলেন, তিনি আশা করেছিলেন কথাগুলো শুনেই সমবেত শ্রোতৃবর্গ তাঁর জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়বে। কিন্তু তা হলো না। কেবল সভার একটা কোণ থেকে মৃদু আওয়াজ শোনা গেলো।

'...আমাদের দুঃখটা যে কোথায় তা কেউই বোঝে না ...।' লাঠি-হাতে পাশে একটা লোক দাঁড়িয়েছিলো, সে তার হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকতেই সেই দুর্বল আওয়াজ থেমে গেলো।

সুকুলবাবু চড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিলেন। বললেন, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে এই সরকার আপনাদের জন্যে কিছুই করবে না। এটা ভাববেন না যে এরা আপনাদের ভালো চায়। আসলে এরা ভালোবাসে একটিই জিনিস, তা হলো গদি। আর গদি বাঁচানোর জন্যে সবকিছু গোলে হরিবোল করে দেয়। গদি আর মনুষ্যত্ব, একে অন্যের শত্রু। মনুষ্যত্বের সমাধির ওপর দৃঢ় হয়ে ওঠে শাসনের যন্ত্র।' সভার এককোণে যে অপরিচিত লোকগুলো বসেছিলো তারা এবার হাততালি দিয়ে উঠলো। 'শান্ত হয়ে বসুন, শান্ত হয়ে বসুন ...' এই সামান্য শব্দেই সুকুলবাবু এমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন যেন বিরাট সোরগোল শুরু হয়েছে। তিনি আবার তাঁর বক্তৃতার খেই ধরলেন। 'নির্বাচনে জেতার জন্যে সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন —কেন? আমি একটা হেরো লোক। আমাকে এত ভয় কেন? জনসাধারণই তো আপনাদের ভালোবেসে ভোটে জিতিয়েছে, গদিতে বসে আপনারা যা করছেন তা-তো জনগণের ভালোর জন্যেই করছেন। তাহলে ভয়টা কিসের? সাদাকে কালো, কালোকে সাদা বানানোর এই অপচেষ্টা কেন?' একটু থামলেন সুকুলবাবু।

'এই হেরো সুকুলকে ভয় না পেলেও চলবে কিন্তু ভগবানকে তো ভয় করতে হবে। এই নিরীহ, নিরপরাধ মানুষগুলোর ওপর অত্যাচার বন্ধ হোক।' একটু গুঞ্জন শোনা গেলো সভায়। সুকুলবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তাঁর গলার স্বর আর এক পর্দা চড়লো। 'মানলুম আমার ভুল হয়েছিলো। সে ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, আমি মাথা নত করে তা মেনে নিয়েছি। কারণ সাধারণ মানুষ ভুল করেন না। এই সরকার আপনাদের সুখ-শান্তি, উন্নতি-সমৃদ্ধির অনেক আশ্বাস দিয়েছেন। এই আশ্বাস শুনে আমি খুশি হয়েছিলাম।' সভা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, সত্যিই যদি এ সরকার আপনাদের কল্যাণ চাইতেন তাহলে আমি আজ এভাবে আপনাদের সামনে হাজির হতাম না। সেই সংকাজে দা-সাহেবের পাশে না থেকে তাঁর বিরোধিতা করব এতটা নীচ আমি নই। কিন্তু এরা মুখে এক কথা বলে আর করে তার উল্টো। দিন-দুপুরে এই জুলুমবাজি মুখ বুজে সহ্য করার মতো অধঃপতন আমার এখনো ঘটেনি।' একটু থামলেন সুকুলবাবু।

'ভাববেন না যে আমি এখানে আপনাদের ভোট ভিক্ষা করতে এসেছি। একবার হারার পর, হার-জিতের ব্যাপারটা আমাকে এখন আর আগের মতো স্পর্শ করে না।' লাঠি-হাতে জন-পঁচিশেক লোক সভার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিলো। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো, 'কে মাথার দিবিা দিয়েছে দাঁড়াতে?' বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না সুকুলবাবু। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'হ্যা আমি দাঁড়িয়েছি, আপনাদের ন্যায্য আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে চাই বলে আমি দাঁড়িয়েছি। আমি দাঁড়িয়েছি কারণ আমি বিসুর খুনের কৈফিয়ৎ চাই। কিন্তু এ প্রশ্ন কেবল বিসুর মৃত্যু নয়…আপনাদের বেঁচে থাকার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকা…এ মৃত্যু কেবল কিছু হরিজন অথবা বিসুর মৃত্যু নয়। এ মৃত্যু আপনাদের বেঁচে থাকার অধিকারের মৃত্যু। অথচ সামান্য মূল্যের বিনিময়ে আজ আপনাদের বেঁচে থাকার অধিকার গাঁয়ের ধনী জোতদারদের কাছে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের ন্যায্য অধিকার আমাকে আপনাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ অত্যাচারের আঘাতে ভেঙে পড়েছে আপনাদের মনোবল। তাই আপনাদের লড়াই লড়বার জন্যেই আমি এখানে এসেছি…জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমি লড়বো। আপনারা আমার পাশে থাকুন আর নাই-ই থাকুন…।'

'সুকুলবাবু জিন্দাবাদ', 'হরিজনবন্ধু সুকুলবাবু জিন্দাবাদ' প্রভৃতি স্লোগান, আগে যে কোণা থেকে হাততালি ভেসে এসেছিলো সেখান থেকে শোনা গেলো। সভার অন্যান্য লোকেরা স্লোগানে কণ্ঠ মেলানোর পরিবর্তে যারা স্লোগান দিচ্ছিলো তাদের দেখতে লাগলো। লাঠিধারী জোয়ানগুলো মাটির ওপর হাতের লাঠি ঠুকতে লাগলো। ক্রমশ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিলো সভাস্থলে এবং লোকদের মুখ আর পূর্বের মতো নির্বিকার ও ভাবলেশহীন রইলো না।

সুকুলবাবু গলার স্বর এবং বাচনভঙ্গি পাল্টে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন—'আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবার অধিকার আপনাদের ছিলো, কিন্তু উল্টে আমি যদি আমার অসন্তোষ প্রকাশ করতাম তা হতো অপরাধ। কেমন করে ভুলে যাব যে দশ-দশটা বছর আমি আপনাদেরই ছিলাম, আপনাদের সেবায়। আমার ওপর আপনাদের অধিকার রয়েছে, আর সেই অধিকার আদায়ের সময়ও আজ এসে গেছে। আজ হতভাগা সুকুল পেছনে পড়ে থাকবে না। তা যদি হয় তাহলে আমার মুখে দু'ঘা জুতো মারুন।'

আবার থামলেন সুকুলবাবু।

'দা-সাহেবের কাছে ন্যায় বিচার চাই আমি। শুধু মুখের কথা, শুধু আশ্বাস নয়। ন' নটা মানুষ যে পুড়ে মরলো তাদের হত্যাকারীদের চাই, বিসুর খুনীকে চাই।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, এক কোণে গোলমাল দেখা দিলো। কিছু বোঝার আগেই অন্য প্রান্ত থেকে আওয়াজ উঠলো, 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক', 'সুকুলবাবু জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ'।

ঠিক হলো, সামনের সপ্তাহে একদিন একটা ডেপুটেশন দা-সাহেবের কাছে যাবে আর নেতৃত্ব দেবেন সুকুলবাবু। সভা শেষ হতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো এবং সুকুলবাবুর মনে হলো, জনগণের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

খুশিতে গদগদ হয়ে সুকুলবাবু গাড়িতে গিয়ে বসতেই তাঁর সহকর্মী বিহারী-ভাই বললেন, 'সুকুলবাবু, সভাটা কিন্তু বেশ জম্পেস হয়েছে।'

'হুঁ।' সুকুলবাবু মনে-মনে হিসাব কষতে লাগলেন। জোরাভরের ভোট-গুলোতো গেলো। ওর হাতে শতকরা পঁয়তাল্লিশটা ভোট রয়েছে। তা থেকে একটাও নড়চড় হবে না। এবার বাকি ভোটগুলো নিজের দিকে টানতে হবে। তাহলে কিছু কাজের কাজ হবে।

কিন্তু এই ছোটলোকগুলোর ওপর ভরসা রাখা যায় না। ধরে-বেঁধে যদি আনাও হয় তবুও কিছু লোক হয়ত ভোটই দেবে না, আর বাকিদের মেজাজ-মর্জি যে কখন কি থাকে তার কিছু ঠিকানা নেই। এখন যদি হরিজনেরা এবং বিসুর জাতভায়েরা একজাট্টা হয়ে তাঁকে সমর্থন না জানায় তাহলে এই ভাবণ মাঠে মারা গেলো।

সুকুলবাবুর মনে হলো গাঁয়ের মানুষের ওপর প্রতিক্রিয়া যা হওয়া উচিত ছিলো তা হয়নি। তাঁর দলের লোকেরাই যা-একটু জমিয়ে রেখেছিলো, বাকি লোক তো পুতুলের মতো বসেই ছিলো। যে দশ-বিশ জন লেঠেল ঘোরাফেরা করছিলো তারা নির্ঘাৎ জোরাভরের লোক। যদিও ওরা নিজে থেকে কোনো গণ্ডগোল পাকায়নি কিন্তু সভা গরমও হতে দিলো না। এর থেকে শালারা যদি কিছু করতো তাহলে খেলাও জমতো, ফায়দাও তোলা যেতো। কিন্তু মনে হচ্ছে সাধারণ লোক জোরাভরের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে তা-নইলে নিজেদের মঙ্গলের কথা শুনেও এতটা চুপচাপ থাকার মতো আহাম্মক তো তারা নয়। এখন গাঁয়ের মানুষ চালাকিতে শহরের লোকের কান কাটতে পারে। গত বছর তো এরাই সুকুলবাবুর কান কেটে দিয়েছিলো। হঠাৎ সুকুলবাবু কি-একটা ভাবলেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'গাড়ি ঘোরাও।' গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোন দিকে যাব হুজুর?'

'বিসুর বাড়িতেই তো যাওয়া হলো না। হয়ত ওর বাপ মিটিঙেই আসেনি। আর যদি এসেও থাকে, তাহলেও ওর বাড়িতে গিয়ে সান্ত্বনা দিলে ফলটা ভালোই হবে। এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে খুব সহজেই ওরা নিজেকে বিকিয়ে দেয়।'

গাড়ি ফিরে আসতে দেখে ছড়ানো-ছিটানো কিছু লোক তাঁর আশপাশে ভিড় করলো। দু'জন লেঠেলও জুটে গেলো। এমনিতে চুপচাপ কিন্তু ওদের চোখে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন ফুটে উঠলো —একঘণ্টা তো বক্‌বক করলে বাপ, আবার কি এমন হলো যাতে ফিরে এলে ?

সুকুলবাবুর আসল উদ্দেশ্যটা জানাজানি হতেই দলে-দলে লোক তাঁর সঙ্গ নিলো। ঐ রাস্তায় গাড়ি চলার প্রশ্নই ওঠে না, তাই শুরু হলো তাঁর পদযাত্রা। মিছিল করে সবাই হীরার বাড়ির দোরগোড়ায় এসে থামলো। কিন্তু গিয়ে কোনো লাভ হলো না। সেখানে দু'টো বাচ্চা ছাড়া আর কেউ নেই। প্রশ্ন করে জানা গেলো, মা এবং বাবা দু'জনেই শহরে গেছে ; ফিরতে রাত হবে।

'শহরে ? কার সঙ্গে ? কেন ?' হঠাৎ প্রশ্নের পর প্রশ্ন তাঁর মনে ভিড় করলো। দা-সাহেব ডেকে পাঠাননি তো ? এদিকে উনি যখন বক্তৃতায় ব্যস্ত, ওদিকে দা-সাহেব তখন কোনো ওষুধ গিলিয়ে দেননি তো ?

'কি জানি, বিন্দা-দা নিয়ে গেছে।'

'এই বিন্দা-দা-টা কে ?'

'রুক্মা দিদির বর।'

যাক্, জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেলো বিন্দেশ্বরী বিসুর প্রিয় বন্ধু। লোকটা লেখাপড়া জানে। কিন্তু বড্ড বদমেজাজি, এবং চাঁচাছোলা মুখ।

একরাশ চিন্তা নিয়ে সুকুলবাবু গাড়িতে গিয়ে বসলেন। বিসুর বাপের সঙ্গে বাড়িতে দেখা হলে ভালো হতো। বিসুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্যেই তো উনি এখানে এসেছিলেন। কাল থেকে প্রচার করা হলো...। তা-সত্ত্বেও হতভাগাটা শহরে চলে গেলো ? এই দেহাতিগুলোর ওপর কোনো ভরসা রাখা যায় না। কখন কি করে বসে। আজ তো ওর সুকুলবাবুর বক্তৃতা শোনা উচিত ছিলো। বক্তৃতা শুনতে না গেলেও সে তো নিজের চোখে দেখতে পেতো সুকুলবাবু স্বয়ং তার বাড়িতে পদার্পণ করেছেন। যাক্, গাঁয়ের লোকজন তো দেখেছে। এতটা পথ কিভাবে পায়ে হেঁটে এলেন ! গাঁয়ের লোকজনের ওপর এর প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর সুকুলবাবু যখন শুলেন মাথার-মধ্যে জমে-থাকা ঐ প্রশ্নটি আবার তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো —বিসুর বাপ-মা'র হঠাৎ শহরে যাওয়ার দরকার হলো কেন ? এবং তাঁরই ভাষণের দিন ? নিশ্চয়ই এটা দা-সাহেবের কোনো চাল। এবার দা-সাহেবের প্রতিটি চালের পাল্টা চাল তাঁকেও চালতে হবে—

একেবারে ষোড়ায় আড়াই চাল। এই মওকা যদি ফস্কায় তাহলে আগামী চার বছরে আর কোনো আশাই নেই। আরো চা-র ব-ছ-র! আজ চারদিকের যা অবস্থা তাতে তো চার দিনের ভরসা নেই।

আংটী-পরা হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরলেন সুকুলবাবু। মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন নীলাটির দিকে, বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মনে-মনে বললেন—এখন তুই-ই আমার একমাত্র ভরসা। এবারকার মতো পার করে দে আমায়। তারপর বিছানার ওপর উঠে বসেন সুকুলবাবু, মেরুদণ্ড টানটান করে বসেন, জোরে-জোরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন। শুতে ভালো ঘুম হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

মুকুলবাবু যখন মহা উৎসাহে গাঁয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেই সময় দা-সাহেব মহাকরণ থেকে ফিরে বাড়িতে নিজের অফিসঘর খুলে রোজকার মতো বসেছিলেন। সাতটা থেকে ন'টা অব্দি অতি অবশ্য নিজের অফিসঘরে তাঁর বসা চাই। জরুরী ফাইল-পত্তর তিনি এখানেই উল্টে-পাল্টে দেখেন। প্রচণ্ড তৎপরতার সঙ্গে ফাইল শেষ করে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে দা-সাহেবের যথেষ্ট সুনাম আছে। তাঁর বিশ্বাস, নিজের হাতে, নিজের চোখের সামনেই কাজ সবচেয়ে ভালো হয়। সরকারি দপ্তর ও বিভাগগুলোর শিথিলতা ও দায়িত্বহীনতা দেখে দা-সাহেব বড়ই তিতিবিরক্ত। তিনি শুধু ফাঁকা উপদেশ না দিয়ে নিজে হাতে-কলমে সব করে তাদের একটা শিক্ষা দিতে চান। বাপু এমনি-এমনি এত বড় একটা দেশকে ত্যাগের পথে নিয়ে আসেননি—সে পথে আগে তাঁকে নিজেকে চলতে হয়েছে। 'যে কথায়, যে কাজে আত্মবিশ্বাস রয়েছে, তার প্রভাব অন্যের ওপর পড়তে বাধ্য। যদি না পড়ে, তো বুঝতে হবে তোমার কোথাও আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি আছে।' মহাত্মাজীর প্রতিটি কথা, প্রতিটি আদর্শ দা-সাহেবের জীবনের মূলমন্ত্র।

ঠিক সেই সময় চাপরাশি এসে খবর দিলো, '"মশাল" পত্রিকার দত্তবাবু এসেছেন।' বলেই সে বিনীতভাবে দত্তবাবুর কার্ডখানা এগিয়ে ধরলো। কয়েক মুহূর্ত দা-সাহেবের মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। মনে হলো, মুখ তুললেও, মনটা কিন্তু ফাইলের ভেতরই ডুবে আছে। হুকুমের অপেক্ষায় পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে চাপরাশি আর ওদিকে একবার 'হুঁ' বলেই দা-সাহেবের মন চিন্তায় ডুবে গেলো। সাধারণত এ সময় তিনি 'বিশেষ বিশেষ' লোকের সঙ্গে দেখা করে থাকেন। কিন্তু তিনি নিজেই তো ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে!

তন্ময় ভাবটা কেটে যেতেই দা-সাহেব বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে। ভেতরে নিয়ে এসো।' তারপর হঠাৎ কি-যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'আর হ্যাঁ, শোনো! রত্তীকে বলে দাও মিনিট পাঁচ-সাতের ভেতর যেন ডি. আই. জি.'র ফোনের লাইন দেয়।'

চাপরাশি চলে যেতেই দা-সাহেব ফাইল বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন থেকেও ফাইলের চিন্তা সরিয়ে ফেললেন। এক্ষেত্রে দা-সাহেবের স্বভাব হলো—যার সঙ্গে কথা বলবে প্রাণ খুলেই কথা বলবে। মন অন্য কোথাও পড়ে আছে আর দায়সারা হুঁ-হাঁ উত্তর দিয়ে যাচ্ছে—এমনটা নয়। সময় না করতে পারলে সাফ-সাফ আসতে বারণ করে দাও। তিনি স্পষ্ট কথার লোক আর অন্যের কাছ থেকেও তাই-ই আশা করেন।

দত্তবাবু ঘরে ঢুকতেই স্মিত হাসি হেসে অভ্যার্থনা ও অভিবাদন দুই-ই সারলেন।

একটু হালকা গলায় বললেন, 'আসুন, আসুন —দত্তবাবু। এ সময়ে যে··· ?' দত্তবাবু একটু ঘাবড়ে গেলেন। একটু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হলো ভুল সময়ে এসে পড়েছেন। তোতলাতে-তোতলাতে বললেন, 'আজ্ঞে, আপনি খবর পাঠিয়েছিলেন ···কাল লখনবাবু বলছিলেন···।' দা-সাহেব তাঁর মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। ব্যাপারটা সহজ করার জন্যে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই। আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আপনারা ভুলে গেলে কি হবে, আমাকে তো সবার কথা চিন্তা করতে হয়। খবরাখবর নিতে হয়।'

'না, না, এ কি বলছেন ···এমন কখনো ···হুজুরের হুকুম হলে···' ঘাবড়ে গিয়ে দত্তবাবুর মুখে উপযুক্ত কথা যোগায় না।

দা-সাহেব নিজেই তাঁকে এ পরিবেশ থেকে উদ্ধার করলেন, 'মাস পাঁচ-ছয় আগে ইন্টারভিউ'র জন্যে আপনি সময় চেয়েছিলেন। আমি সময় দিতে পারিনি। সময়ের অভাব এমনিতে-তো ছিলোই, উপরন্তু সে রকম কোনো ইচ্ছাও ছিলো না।'

'আজ্ঞে ?', ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দত্তবাবু দা-সাহেবের মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

'ঠিকই বলছি। আর সেই সময় আমার কাছে বলবার ছিলোই-বা কি ? আমার এই পরিকল্পনা আছে ···আমি হ্যান করব ···আমি ত্যান করব ···এই সবই না! কিন্তু এই করছি-করব'র ভাষা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না। আরে ভাই! প্রথমে কিছু একটা কর, তারপর না-হয় সে সম্পর্কে যা বলার বলো। অন্যদেরও বলতে বলো ···সমালোচনা করতে বলো।'

'আজ্ঞে, আসলে আমি তো আসতে···। কি বলব···।'

'না, না। দোষ আপনাকে দিচ্ছি না। জানি আপনাদের কাজ-টাজও বেড়ে গেছে। মাঝে তো এমন অবস্থা হয়েছিলো যে ওপর থেকে খবর তৈরি হয়ে আসতো আর তাই ছেপে দিতেন আপনারা। আপনাদের তো করার কিছুই থাকতো না।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'প্রজাতন্ত্রে সংবাদপত্রের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ নিতান্ত অশোভনীয়।'

এ কথায় দত্তবাবুর উৎসাহ যেন বেড়ে গেলো। নিজের কাগজ বন্ধ হয়ে যাবার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন তিনি। একটু রাগত গলায় বললেন, 'অশোভনীয় ? আমি তো বলব সেই লজ্জাজনক নিপীড়নের ইতিহাস কালো অক্ষরে লেখা হবে ···দমবন্ধ হয়ে গিয়েছিলো সবার! আমি তো···।'

'না, না, দত্তবাবু!' দা-সাহেব বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'এভাবে মন্তব্য করাও আপনার পক্ষে শোভনীয় নয়। আপনাদের যে ভূমিকা ছিল, তাকে কি ভাষায় ছেপে বার করবেন ? তোষামোদী আর খয়ের খাঁ হয়ে থাকা তো সংবাদপত্রের কাজ নয়!'

শুনে দত্তবাবুর দমবন্ধ হবার জোগাড়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দা-সাহেব

বললেন, 'আপনাদের পত্রিকা তো অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তা ভাই ...' কথা শেষ করলেন না দা-সাহেব।

দত্তবাবু চোখ নামিয়ে ফেললেন। তারপর কোনোরকমে একটু সাহস এনে বললেন, 'আজ্ঞে, সে অভিযোগ মিথ্যে ...আসলে আমাদের পত্রিকা ...এখন আমরা আর... ।'

'যাক্, ওসব কথা ছাড়ুন। যা ঘটে গেছে তা নিয়ে মন্তব্য করতে হয়ত ভালোই লাগে, কিন্তু করা ঠিক নয়। আর ওসবের জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠাইনি। বরং ভালোই হলো, এবার একটা সুযোগ পাওয়া গেলো। জনগণ বিশ্বাস করে যে দায়-দায়িত্ব সঁপে দিয়েছেন, সেটুকু অন্তত ভালোভাবে পালন করতে হবে —আর তা করতে হবে মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে। আমাদেরও...' একটু থেমে প্রত্যেকটি অক্ষরের ওপর জোর দিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন, 'এবং আপনাদেরও।'

এমন কিছু বলেননি দা-সাহেব। কিন্তু কে-জানে দা-সাহেবের বলার সুরে বা চাউনিতে কি ছিলো যাতে দত্তবাবু ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। মনে-মনে ভেবে দেখলেন কোথাও কোনোরকম ত্রুটি হলো কি-না। কিন্তু দা-সাহেব আবার তাঁকে উদ্ধার করে সহজ গলায় বললেন, 'দমবন্ধ হবার আতঙ্ক নিশ্চয়ই আর নেই? নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে নিশ্চয়ই কোনো বাধা অনুভব করছেন না?'

'আজ্ঞে না, না! সেসব মোটেই না।' এই সামান্য কথা ক'টা বলতেও তাঁর গলার স্বর আটকে যাচ্ছিলো। কিছুতেই তিনি স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না।

'খোলাখুলি বলুন না। আমি ভুল করে থাকলে স্পষ্ট ভাষায় তার নিন্দা করুন।'

দত্তবাবু ফ্যালফ্যাল করে শুধু দা-সাহেবের মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

'আমি তো ভাই কবীরের এই দোঁহাটিকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি—"নিন্দক নিয়রে রাখিয়ে।" অর্থাৎ চাটুকারের চেয়ে নিন্দুক সব সময়ই বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী। সে আপনাকে সৎপথে থাকতে বাধ্য করে। মানুষ একবার যদি এটা বুঝতে পারে, তবে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরার হাত থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু মানুষের এমনই স্বভাব যে তার তোষামোদই বেশি পছন্দ।' দা-সাহেব হেসে ফেলতেই, দত্তবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক্, এমন কিছু ব্যাপার নয়। খামোকা ভেবে অস্থির হচ্ছিলেন।

ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। দা-সাহেব রিসিভার তুলে নিলেন, 'হ্যালো! কে, সিনহা? হ্যাঁ, বলো... ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা!' মুখের চেহারা শক্ত হয়ে উঠলো।

'দেখো ভাই, তোমায় কেসের একেবারে শেষ অব্দি খুঁটিয়ে দেখে জল থেকে দুধকে আলাদা করে নিতে হবে। এটাই তোমার কাজ। বুঝেছ?'

'হুঁ ...হুঁ! দেখো সিনহা, আমি ঘটনার আসল তদন্ত হোক এটাই চাই।

কে কি বললো তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। এমন কি আমি যা বলছি তা নিয়েও ভাবনা-চিন্তা করো না। শুধু সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য করে যাও।'

'হুঁ...হুঁ! আরে, সে তো হবেই। কে আটকাবে? আর শোনো, কোনো বড় অফিসারকে নতুন করে এজাহার নেবার জন্যে সেখানে পাঠাও। শুনলাম, লোকজন ভয়ে সঠিক এজাহার দেয়নি।'

গলার স্বরে আবার একটু কাঠিন্য এনে বললেন, 'পুলিশের সামনে জনগণের তো নিজেদের আরো নিরাপদ মনে করা উচিত ...সন্ত্রস্ত নয়! জনগণ আতঙ্কিত হলে পুলিশের কাছে সেটা কলঙ্ক। আমার নিজের সম্পর্কেও ঐ একই কথা। আমি এসব সহ্য করব না।' তারপর আদেশ দেবার সুরে বললেন, 'যান, যেমন করে পারেন ওদের ভরসা দিন। সত্য কথা বলার সাহস যোগান।'

'...'

'ঘটনা ঘটে গেলো আর পুলিশ সঠিক ব্যাপারটা তদন্তই করলো না, তাহলে পুলিশ দপ্তরের সার্থকতা কোথায়? এর চেয়ে আমার ও আপনার ইস্তফা দেওয়াই বরং ভালো।'

'...'

'না, না। নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপালে তো চলবে না। লোকে এজাহার দিচ্ছে না কেন? এর জন্য দায়ী কে? ...না, না, ...আমি বাহানা শুনতে চাই না, কাজ চাই আমার। গতবারের ব্যাপারটা না-হয় বরদাস্ত করে নিয়েছিলাম। কিন্তু এবার আসল অপরাধী যদি ধরা না পড়ে, তবে তার সাজা আপনাকে, আমাকে দু'জনকেই পেতে হবে। বুঝেছেন?'

'...'

'হ্যাঁ, এই তো কাজের কথা! ...আচ্ছা, এক কাজ কর। কাল সন্ধ্যে-বেলা ফাইলপত্তর নিয়ে আমার এখানে চলে এসো। আমি নিজে পড়ে দেখব। এইসব ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে গ্রামে বড্ড উত্তেজনা ছড়ায়। এটা ঠিক নয়। তিন-চার দিনের ভেতর আমিও ওখানে যাচ্ছি ...কথা বলব গ্রামের লোকদের সঙ্গে। কিন্তু যাবার আগে ঘটনাটা সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল হতে হবে।'

দা-সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রেখে দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন। মনে হলো তিনি গভীর কোনো চিন্তায় মগ্ন। বেচারা দত্তবাবুর তখন এক অদ্ভুত স-সে-মি-রা অবস্থা! তাঁর ওখানে বসে থাকাটা উচিত কি-না তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। আর যদি উচিত না-ও হয়, তবে উঠে যাবেনটাই-বা কি করে?

কিছুক্ষণ পর মুখ তুললেন দা-সাহেব। মুখে একটু আগের সেই উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, কড়া মেজাজের নামগন্ধও নেই। সেই সহজ, সংযত ভাব। সেই শান্ত-সুগম্ভীর চেহারা।

'ডি. আই. জি. সিনহা ফোন করেছিলেন,' গলার স্বরে দুশ্চিন্তার কোনো আভাসমাত্র নেই। দত্তবাবুর বিমূঢ় মুখে যেন একটু কৌতূহল উঁকি মারলো।

'আজ্ঞে, তেমন বিশেষ কিছু?' কথাবার্তা শুনে দত্তবাবু তো সব অনুমান করেই ফেলেছেন, তবু জিজ্ঞাসা করলেন। আর সেই প্রশ্নের সঙ্গেসঙ্গেই এক অদ্ভুত সংকোচ তাঁকে ঘিরে ধরলো। কে-জানে এখানে বসে এ ধরনের প্রশ্ন করার অধিকার তাঁর আছে কি-না?

দা-সাহেবের দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে গেলো, আর দত্তবাবু কাঁচুমাচু মুখ করে বসে রইলেন। একটু পরে সেই তন্ময়ভাব কাটিয়ে উঠে দা-সাহেব দত্তবাবুর কথার খেই ধরে বলে উঠলেন, 'বিশেষ আর কি? ...সেই সরোহার ব্যাপারটা... আপনি তো সবই জানেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই বিসেসর নামে এক যুবকের খুন হওয়ার ব্যাপারটা তো?'

'খুন?' তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে দা-সাহেব চাইলেন। দত্তবাবুর কথাও থেমে গেলো। 'খুনের প্রমাণ-টমানও পেয়ে গেছেন না-কি?' গলার স্বরে কাঠিন্যের আভাস পাওয়া গেলো।

'না, মানে, ওখানকার লোকজন।'

'লোকজনেরা নয়, বলুন বিরোধী-পক্ষের লোকজন। ডি. আই. জি. সাহেব তো ঐ কথাই বলছিলেন। সেই ঘটনার সমস্ত এজাহার থেকে এটাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে। আর সুকুলবাবুর দলের লোকেরা পরদিন থেকেই চেল্লাতে শুরু করেছে—খুনের জবাব চাই। এই তো ঘণ্টাখানেক আগেই সুকুলবাবু সভায় গরমাগরম ভাষণ দিলেন। পুলিশের রিপোর্ট এলো না, তারা রিপোর্ট পেয়ে গেলো!'

দত্তবাবু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তবু তাঁর কপাল ভালো বলতে হবে, "মশাল"-এর আগামী সংখ্যা এখনো বেরোয়নি। আগামীকাল বেরোবার কথা, আর তাতে খুনের কথাই লেখা আছে—একদম হেডলাইনে!

'ঠিক আছে। তোমাদের নির্বাচনে জিততে হবে। কিন্তু জনগণের শান্তি ও সদ্ভাবের মূল্যে নিশ্চয় নয়। কি আর হবে, গ্রামে তো এমনিতেই উত্তেজনা রয়েছে, তা আরো বাড়বে। নিজেদের মধ্যেই মারদাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে। আর এর একটাই ফল, তা হলো, বেচারা গরীব লোকগুলোই মারা পড়বে। পয়সাওলা লোকেরা যেমন তেমনভাবে রক্ষে পেয়ে যায়—পয়সার জোরে, না-হয় গায়ের জোরে। গরীবগুলোই তো মরে, তাই না? না ...না ...।' মনে হলো দা-সাহেবের অন্তরাত্মা যেন আর্তনাদ করে উঠলো, 'এ তো মনে হচ্ছে সর্বহারাদের সমাধির ওপর প্রাসাদ তৈরি করা হচ্ছে। দা-সাহেবের স্বর ক্ষোভে, দুঃখে জড়িয়ে এলো। চেহারায় একটা বিষাদের ছায়া পড়লো। দত্তবাবুও উত্তরে দা-সাহেবের সেই বিষাদের ভাব কিছুটা মুখে এনে তাঁর নিজের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন, 'ছি-ছি-ছি।'

'সবাই তো গরীবের দোহাই পাড়ে, কিন্তু তাদের মঙ্গলের কথা কেউই ভেবে দেখে না। জনগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখো —কখনো জাতপাতের দেওয়াল তুলে, আবার কখনো-বা শ্রেণীর নামে ধুয়ো তুলে। জনগণের এই বিখণ্ডিত-বিচ্ছিন্ন অবস্থাই তো স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের শক্তির উৎস। কি, কিছু ভুল বললাম না-কি ?'

দত্তবাবু মুশকিলে পড়ে ঢোক গিললেন। বেচারা বুঝতেই পারছেন না কি বলে দা-সাহেবের এই বড়-বড় কথার সমর্থন জানাবেন।

কিন্তু দা-সাহেব তাঁর সমর্থনের অপেক্ষায় রইলেন না। যার কথা গভীর নিষ্ঠারই ফলশ্রুতি, সে বাইরের সমর্থনের জন্য লালায়িত নয়। কখনো কখনো ভাবের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গিয়ে দা-সাহেব একটু দার্শনিক-গোছের হয়ে পড়েন।

'কিন্তু আমিই-বা কেন অন্যের উচিত-অনুচিত কাজের ওপর মন্তব্য করতে যাব ? আমি শুধু যেন নিজের কর্তব্যের রাস্তা ধরে চলতে পারি আর অন্তরের আহ্বানকে অবহেলা না করি, এটুকুই আমার কাছে যথেষ্ট। গীতা পড়ে এটুকুই তো শিখেছি আমি।' দু'চোখ বুজে দা-সাহেব মনে-মনে যেন গীতাকেই প্রণাম জানালেন। চোখ খুলতেই মুখের চেহারায় দুশ্চিন্তা, বিষাদ বা অভিযোগ কিছুই নেই। মনে হলো মুহূর্তের মধ্যে গীতা যেন তাঁর সবকিছু ধুয়েমুছে নিয়ে তাঁকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে দিয়েছে। ঠিক আগেকার মতোই সৌম্য, শান্ত, সংযত মুখ !

সমস্ত প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রেখে দত্তবাবুর সঙ্গে নতুনভাবে কথা শুরু করলেন, 'ঠিক আছে, ওসব কথা ছাড়ুন। বলছিলাম আপনারা আগের মতো কোনোরকম বাধানিষেধ এখন অনুভব করেন কি ? যদি তাই হয় খোলাখুলি বলুন। যে স্পষ্ট কথা বলে, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।' দত্তবাবু কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই দা-সাহেব আবার বলতে শুরু করলেন, 'আগের সরকার সরকারি দপ্তরগুলোকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে বিশেষ কিছু-কিছু সংবাদপত্রকে যেন সরকারি বিজ্ঞাপন না দেওয়া হয়। এই খবরের কাগজগুলো সত্যকথা বলার সাহস দেখিয়েছিলো। হয়ত এটাই তার শাস্তি। কিন্তু তাই সৎসাহসের জন্যে তো পুরস্কৃত করা উচিত। আমি কিন্তু ওসব বাধানিষেধ একদম তুলে দিয়েছি। সংবাদপত্রের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকার অর্থই হলো প্রজাতন্ত্রের মৃত্যু।' দা-সাহেব একটু চুপ করে দত্তবাবুর ওপর নিজের কথার প্রতিক্রিয়া দেখে নিলেন। দত্তবাবুর চেহারায়, ভাব-ভঙ্গিতে অপরিসীম শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ফুটে উঠেছে। সেই মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে সেকথা কে-না জানে, আমরা তো আপনার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ...।'

'না, না কৃতজ্ঞ হওয়ার কি আছে ? এ তো আমার কর্তব্য। এ তো আমার করতে হতোই।' তারপর একটু সতর্ক করার ভঙ্গি নিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনাদের সংবাদপত্রগুলো পূর্ণ অধিকার তো পেয়েই গেছে। এবার দেশের প্রতি,

সমাজের প্রতি এবং বিশেষ করে এদেশের গরীব জনসাধারণের প্রতি আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। সংবাদপত্রের কাঁধে অত্যন্ত গুরুভার ন্যস্ত আছে। আর আমি চাই যে গুরুভার সম্বন্ধে সচেতন হোন—আপনি ···।' এই 'আপনি' কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে দা-সাহেব গলাটা একটু বাড়িয়ে এমনভাবে চাইলেন যেন সেই চাউনির মাধ্যমে দায়িত্বের গুরুভার দত্তবাবুর কাঁধে চাপিয়ে দিলেন।

'আজ্ঞে, আপনি ঠিকই বলেছেন।' দায়িত্বের ভারে অভিভূত হওয়ার ভঙ্গিতে দত্তবাবু বললেন, 'আজ্ঞে, হুকুম করুন কি করতে হবে।'

'কি বলছেন?' দা-সাহেবের প্রশ্নের ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত অশ্রুতপূর্ব কিছু তাঁর কানে এসেছে। গলার স্বর একটু শক্ত করে বললেন, 'অন্যের হুকুম মতো চলে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারবেন? হুকুম দেওয়ার জন্যে নয়, আমি শুধু আপনার কর্তব্যটা কি সেটা জানানোর জন্যেই আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।' গলার স্বর আবার মোলায়েম হয়ে এলো। 'চাইছিলাম, এখন থেকে অন্তত এই ভাষাটা ভুলে যান।' দত্তবাবু একটু লজ্জা পেয়ে মনে-মনে ভাবলেন, লোকটা তো কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না, কি বলা যায়।

'সরকারি বিজ্ঞাপন তো পাচ্ছেন। কাগজের কোটা ঠিকমতো পাচ্ছেন তো?'

'আজ্ঞে, ওখানটাতেই একটু অসুবিধে হচ্ছে ···মানে কথাটা হলো···'

'বলুন কি অসুবিধে? অসুবিধে দূর করতেই তো আমি এখানে বসেছি।'

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে গেলেন দত্তবাবু। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাঁকে ডেকে তাঁর অসুবিধের কথা জিজ্ঞাসা করছেন, 'আজ্ঞে, কোটাটা যদি বাড়িয়ে দেন···'

'হাঁ, সেসব হয়ে যাবে'খন। এর জন্যে ফর্ম টর্ম যা আছে তা ফিল্-আপ করে দিন। আর কোনো অসুবিধে থাকলে বলুন।' পাশে-রাখা ফাইলটা সামনে টেনে নিলেন দা-সাহেব।

দত্তবাবু ইশারাটা ধরতে পারলেন। অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, এবার যদি আজ্ঞা হয়···।'

'হুঁ···!' ফাইলের পাতা উল্টোতে-উল্টোতে দা-সাহেব বললেন, 'এবার আপনি যেতে পারেন, কিন্তু মনে থাকে যেন এবার থেকে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন।' তারপর দত্তবাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে একটু শক্ত গলায় বললেন, 'আপনাদের সাপ্তাহিক কাগজটার কিছু-কিছু সংখ্যা আমি দেখেছি। প্রকৃত ঘটনার ওপর আপনাদের তেমন নজর থাকে না, ঐ গোয়েন্দা কাহিনীগুলোর মতো রোমাঞ্চকর উত্তেজনায়-ভরা ভাষায় ঘটনাগুলো পেশ করেন আপনি। এবার থেকে এটা যেন না হয়।' উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জোড়ালাথির চোট খেয়ে দত্তবাবুর তো ভিরমি খাবার জোগাড়! তোতলাতে-তোতলাতে বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে সেকথা···।'

'যা ঘটে গেছে তার কোনো কৈফিয়ৎ চাইছি না আমি। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান।' বলেই দা-সাহেব ফাইলের মাঝে ডুব দিলেন।

দা-সাহেবের ওখান থেকে বেরোবার সময় দত্তবাবু যুগপৎ আতঙ্ক ও উল্লাসে অভিভূত। সোজা প্রেসের পথে পা বাড়ালেন। কালকের সংখ্যা বোধহয় পুরোটাই ছাপা হয়ে গেছে। খুনের ব্যাপারটা তো তিনিই লিখেছেন, বেশ গরমা-গরম ভাষায়। দা-সাহেবের শেষ কথাটা আর তাঁর সেই মুহূর্তের মুখের চেহারা মনে পড়তেই দত্তবাবুর ভেতর অব্দি কেঁপে উঠলো। এখনই গিয়ে ছাপার কাজ বন্ধ করাতে হবে। যেমনভাবেই হোক, আজ রাতেই আবার ছাপিয়ে নিতে হবে। সরোহা থেকে সুকুলবাবুর ভাষণের রিপোর্ট নিশ্চয়ই এখনো আসেনি। তিনি এটাও জানেন না ভবানী কাকে ওখানে পাঠিয়েছে। এমনিতে আগামী সংখ্যায় ওটা ছাপাবার কথা। কিন্তু যদি আজ রাতেই এসে পড়ে তো এই সংখ্যাতেই দিয়ে দেবেন। এবারের সংখ্যা এমনভাবে বার করতে হবে যাতে দা-সাহেবের মনে ধরে। একবার নেক-নজরে পড়লে তারপর তো "মশাল"-এর পোয়াবারো।

প্রেসে পৌঁছে দেখলেন ভবানী শেষ ফর্মার ম্যাটার পাস করে দিয়ে মেশিনে চাপাবার ব্যবস্থা করে বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছে। এমনিতে এমনটা কখনো হয় না। যেদিন নতুন সংখ্যা বেরোয়, তার আগের রাতটা ভবানীকে প্রেসেই কাটাতে হয়। তাই তাকে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হতে দেখে দত্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় চললে এখন?' ভবানী সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে সিনেমার গোটা-তিনেক পাস বার করে টেবিলের ওপর মেলে ধরলো, তারপর হেসে বললো, 'আজ রাতটা ভাই ভবানীর 'ভবানীর' জন্যে রিজার্ভ করা আছে। আর শেষ ফর্মাটা মেশিনে চাপাতে বলে দিয়েছি। সকালের সংখ্যা একদম তৈরি।'

'চুলোয় যাও তুমি আর তোমার 'ভবানী'! আজ যাওয়া-টাওয়া হবে না. জানো এখন কোত্থেকে আসছি?' দত্তবাবু ভবানীর কাঁধে চাপ দিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

'সে যে-চুলো থেকেই আসো না কেন, আজ আমার যাওয়া আটকাতে পারবে না। না গেলে আজ আমার গর্দান যাবে।' দত্তবাবুর কবল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে-করতে ভবানী বললো।

'গর্দান তো তোমার এমনিতেই যাবে এই সংখ্যাটা আবার নতুন করে ছাপতে হবে।'

'কি?' কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলো না ভবানী। দত্তবাবু মেশিন বন্ধ করার কথা বলে এসে, ভবানীকে দা-সাহেবের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা আদ্যোপান্ত শোনালেন।

'দা-সাহেব নিজে তোমায় ডাকিয়ে এসব বলেছেন? দা-সাহেবের অনুগ্রহ পেয়ে গেলে "মশাল"-এর আলো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেরি হবে না।' যে

ভবানী বাড়ি যাবার জন্যে এত ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলো, সেই এখন জুতো খুলে চেয়ারে পা'টা তুলে দিয়ে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসলো।

'বিশ্বাস কর ভাই, ভেবেছিলাম "মশাল" বন্ধ করার কারণটা 'জরুরী অবস্থা'র ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বেশ বড় গোছের দাঁও মারব। কিন্তু বুড়ো ভারি ঘাঘু। আসল কারণটা জানে। উল্টে আমার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়লো। মিনিট-খানেকের জন্যে তো আমার সত্যি-সত্যিই দমবন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সেই যে কথায় বলে না, "পুত চাইতে, ভাতার খোয়ানো" ? আমারও তখন ঠিক সেই অবস্থা। অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ ঘাঁটাননি।'

'সবার আগে গিয়ে কাগজের কোটাটা ডবল করিয়ে নিয়ে এসো।'

'সেসব পরে করলেই চলবে। সবচেয়ে আগে আগামী সংখ্যা ছাপাবার ব্যবস্থা কর তো। কাকে পাঠিয়েছিলে সরোহাতে ? সুকুলবাবুর ভাষণের রিপোর্ট এসে গেছে ?'

'এত তাড়াতাড়ি কোত্থেকে আসবে ? আর এ সংখ্যায় সেটা যাবার তো কথা নয়। নরোত্তম যদি এসেও থাকে, কাল সকালেই যোগাযোগ করা যাবে।'

'না, রিপোর্ট এই সংখ্যাতেই যাবে। সকালে না হলে সন্ধ্যেয় বার করব। কিন্তু এমন ছেপে বার করব যাতে সবার মনে ধরে।

'হ্যাঁ, অন্তত যেন দা-সাহেবের মনে ধরে।'

আগামী সংখ্যায় পত্রিকা এনে দেখা গেলো প্রথম আর শেষ পাতা বদলে দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

ভবানীর বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দু'জন কম্পোজিটারকেও ডেকে পাঠানো হলো। দত্তবাবু কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন। রোজ একটা-না-একটা-কিছু যাকে লিখতে হয়, তার পক্ষেও কলম চালানো যে কত কঠিন, সেটা দত্তবাবু আজ প্রথম বুঝতে পারলেন। কিছু লেখা দত্তবাবুর কাছে বাঁ হাতের ব্যাপার। তবু আজ দায়িত্বের গুরুভারে তিনি এত সন্ত্রস্ত যে কলম সরতেই চায় না। দু'লাইন লেখেন তো চার লাইন কাটেন। লেখা নিজের চোখ দিয়ে নয়, দা-সাহেবের চোখ দিয়ে পরখ করে দেখতে হচ্ছে! দত্তবাবু লিখে-লিখে দিচ্ছেন, কম্পোজিটর কম্পোজ করে যাচ্ছে। ঐ রাতেই ভবানী গিয়ে নরোত্তমকে ঘুম থেকে তুললো। নরোত্তম রিপোর্টই তৈরি করেনি। তাই ওকে সঙ্গে করে ভবানী প্রেসে এলো। এখানে বসেই দত্তবাবুর সহায়তায় রিপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে।

এভাবেই শহরের তৃতীয় প্রান্তে যারা বিসুর মৃত্যুতে একরকম নিষ্ক্রিয় ছিলো, তারা আজ হঠাৎ কেমন কর্মমুখর হয়ে উঠলো। সমস্ত রাত ধরে সে এক অদ্ভুত কর্মব্যস্ততা —বেশ-একটা উত্তেজনার ভরা চাঞ্চল্যের ভাব।

পরদিন "মশাল" বেরোলো। সম্পূর্ণ নতুন এক ভঙ্গিমায়। হেডলাইনে বিসেসরের মৃত্যুর খবরই ছিলো। সঙ্গে এক সুদীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে জানানো

হয়েছে যে এখনও অবধি তদন্তের মাধ্যমে পুলিশ যা জানতে পেরেছে, তা থেকে মনে হয় এ ঘটনা কোনো খুন নয়, বরং আত্মহত্যা। বক্তব্যে দা-সাহেবের ঐ কড়া আদেশের কথাও বলা হয়েছে যে তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ দপ্তরকে তদন্তের পূর্ণ রিপোর্ট পেশ করতে তাগাদা দিয়েছেন। পরিশেষে, সুকুলবাবুর ভাষণকে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে নেহাৎই দায়িত্বজ্ঞানহীন, অপপ্রয়াস বলে অভিহিত করা হয়েছে। বক্তব্যে এই অভিযোগও করা হয়েছে যে, উনি একটা অতি-তুচ্ছ ঘটনাকে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ইচ্ছেমতো বিকৃত করে জনগণের মনে অকারণ উত্তেজনা বৃদ্ধির মতো নিন্দনীয় কাজ করেছেন।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সংক্ষেপে তীক্ষ্ণ ভাষায় এই সমস্ত তথ্যের সমীক্ষা করার পর জনগণকে সতর্ক করা হয়েছে যে তারা যেন আর এ ধরনের রাজনৈতিক চাল ও নির্বাচনে জেতার ছল-চাতুরীর শিকার না হন।

অর্থাৎ বিশুর মৃত্যুতে "মশাল" পত্রিকা প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাতারাতি এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রে পরিণত হলো আর দত্তবাবু হলেন তার দায়িত্বশীল সম্পাদক।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষামন্ত্রী ত্রিলোচন সিং রাওতের বাসভবন। কিন্তু এ নামে খুব কম লোকই তাঁকে চেনে। লোচন-ভাই বলেই তাঁকে বেশির ভাগ লোক চেনে। শুধু নামেই লোচন নন, এই কিছুদিন আগেও বাস্তবিকই জনগণের নয়নের মণি ছিলেন তিনি। খুব বেশি পুরনো দিনের কথা নয়—বড়জোর বছর-চারেক আগেকার কথা। তখন তিনি সুকুলবাবুর বিধানসভার সদস্য ছিলেন। সে সময়ে রাজনীতিতে এমন এক সর্বনাশা ঝড় বইতে শুরু করেছিলো যে তাবড়-তাবড় নেতারাও মেরুদণ্ডহীন স্তাবকে পরিণত হয়ে পড়েছিলেন। ওপরওলাদের জো-হুজুর করা ছাড়া আর কোনো কাজই ছিল না তাঁদের। ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির করার মতো প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে 'প্রজা' শব্দটাই ছিল নিরর্থক, আর 'তন্ত্র' তো মুষ্টিমেয় কিছু লোকের স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। তখন এই লোচনবাবুই নিজের মেরুদণ্ডের জোরে দাঁড়িয়ে সুকুলবাবুর বিরোধিতা করে-ছিলেন। বিরোধিতা করার মূল্য তো দিতেই হয়—দিয়েও ছিলেন। কিন্তু সেই দিন থেকে তিনি আপামর জনগণের লোচন-ভাই। আর এমনই কপাল যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি উসুল করার সুযোগও চটপট এসে গেলো। জনগণও সুযোগ পেয়ে নিজেদের প্রিয় লোচন-ভাইকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে সসম্মানে বিধানসভার সদস্য করে পাঠালেন। জনগণ তাদের ভালোবাসার প্রমাণ তো দিলেন। এবার লোচন ভাইয়ের দেবার পালা। অনেক বড়-বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লোচনবাবু। অনেক লম্বা-চওড়া আশ্বাস। আর সেগুলোই তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিলো। সেগুলো এড়াতে অবশ্য তিনি চাননি! তবে সাহসের সঙ্গে সে চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন, এমন অনুকূল পরিস্থিতি তাঁর ছিল না।

যেদিন হরিজন-বস্তিতে আগুন লাগে, সেইদিন থেকেই তাঁর বাড়িতেও ধিকিধিকি আগুন জ্বলছিলো। ঠিক বাড়িতে নয়, বরং বলা উচিত লোচন-ভাইয়ের মনে তুষের আগুন জ্বলছিলো। সরোহার নির্বাচনের জন্যে সুকুলবাবুর সমকক্ষ প্রত্যেকটি বিরোধী প্রার্থীর নাম নস্যাৎ করে দিয়ে যেরকম নির্লজ্জের মতো ভুঁইফোঁড় লখনকে দাঁড় করানো হলো, তাতে সে আগুনে ইন্ধন পড়লো (সে আগুন আরো খুঁচিয়ে তোলা হলো)। কিন্তু বিসুর মৃত্যুতে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। আত্মগ্লানির যন্ত্রণা যে কি বস্তু, তা সেদিন মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন লোচন ভাই! দেশের সর্বহারা জনসাধারণের প্রতি উৎসর্গীকৃত-প্রাণ লোচন-ভাইয়ের কাছে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। 'অনেক সহ্য করেছি, আর এক মুহূর্ত নয়'-গোছের একটা ভঙ্গি নিয়ে গত সপ্তাহ থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন লোচন-ভাই।

কেবল লোচন-ভাই-ই নন, দা-সাহেবের মন্ত্রিসভার অন্য আরো অনেক বিধায়কও অসন্তুষ্ট। আর সে অসন্তোষের আলাদা-আলাদা কারণ। সত্যি কথা বলতে কি, এই অসন্তোষের আবহাওয়া যেদিন মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছে, সেদিন থেকে শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সে সময়ে পরিস্থিতি এমন ছিলো যে সবাই সদ্ভাব, ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও একতার মুখোশ পরে আদর্শের নামাবলী গায়ে চাপিয়ে বসেছিলেন। ভেতর ভেতর অসন্তোষ, আর বাইরে সব চুপচাপ! কিন্তু এমন-সব ঘটনা ঘটতে লাগলো যে সেই মুখোশে দেখা দিলো অসংখ্য ছিদ্র আর নামাবলী টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। বিশেষ করে বিসুর মৃত্যুতে সেই মুখোশগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। এত-দিন যাঁরা ভেতরে-ভেতরে গুমরে মরছিলেন এবার তাঁদের চেহারাগুলো উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে পড়লো—মুখে অসন্তোষের চিহ্ন স্পষ্ট, হাবভাবে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার তৎপরতা পরিষ্কার! গতকাল রাত দু'টো অব্দি এইসব নির্লজ্জ, অসন্তুষ্ট বিধায়কেরা এ বাড়িতে এমন ভেড়েফুঁড়ে যাতায়াত শুরু করেছেন যেন একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটতে চলেছে। আর এইবার সত্যিই কিছু-একটা ঘটিয়ে ছাড়বেন লোচন ভাই! তাঁর ভেতরে পাঁচ-বছর আগেকার সেই পুরনো লোচন জেগে উঠেছে।

মুখে সমস্ত রাত জাগার ক্লান্তি থাকলেও শরীরে কোথাও একফোঁটা শিথিলতা নেই। দিব্যি তাজা ঝরঝরে—যেন মহড়া নেবার জন্যে প্রস্তুত। দলের সম্পাদক সদাশিব আত্রের অপেক্ষায় বসে আছেন লোচন-ভাই। জনসাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় আপ্পাসাহেব নামে। সকালে যখন আপ্পাসাহেবের কাছে দেখা করার সময় চেয়েছিলেন, তখন আপ্পাসাহেব নিজেই জানান যে তিনি একটা কাজে এ'দিকেই আসছেন আর ঠিক ন'টায় ওঁর বাড়িতে আসবেন। বলেছেন যখন, তখন নিশ্চয়ই আসবেন। আর ঠিক ন'টার সময়েই আসবেন। আপ্পাসাহেবের জীবন এমন কিছু-কিছু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে কেটেছে যে, সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হয়ত কথা ঠিক-ঠিক রাখতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সময়জ্ঞান এত প্রখর যে লোকে তাঁর যাওয়া-আসা দেখে স্বচ্ছন্দে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারে।

কাঁটায়-কাঁটায় ন'টায় এসে পৌঁছালেন আপ্পাসাহেব। পরনে কড়া মাড়-দেওয়া ধপ্‌ধপে সাদা খাদির পোষাক, মাথায় গান্ধীটুপি। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই অবিচ্ছেদ্য তাঁর মাথার টুপি। আপ্পাসাহেবের মাথায় টুপি নেই, এ দৃশ্য সম্ভবত কেউ দেখেনি। হাতে ছড়ি থাকে সবসময়। বয়সের ভারের জন্যে নয়, তাঁর বাঁ-পা একটু খোঁড়া তাই। সেই খোঁড়া পায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে গর্ব করে বলেন, 'এ হলো বিয়াল্লিশের আন্দোলনে পাওয়া পুরস্কার!' তারপর হঠাৎ নিজের সমসাময়িক দেশবাসীর প্রশস্তি গাইতে গিয়ে দু-একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দেন, 'আমাদের যুগের মানুষ শুধু ত্যাগ করতেই জানতেন। মনে কখনও কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা স্থান পায়নি। আর এখনকার মানুষ এক-কণা ত্যাগ করে প্রতিদানে এক-মণ

আশা করে।' কথাটা ঠিকই। আপ্পাসাহেবের সমবয়কার ঐসব মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করতে-করতেই একদিন শহিদ হয়েছেন। তাঁদের শতকরা একশো জনের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। আর যাঁরা বেঁচে রইলেন, সে বেচারারা আর কি করেন? ...ঘোর কলি! তাই করার কিই-বা আছে?

লোচনবাবু এগিয়ে এসে বিনা প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে একটু ধরে আপ্পাসাহেবকে সোফায় বসালেন —বোধহয় একটু অন্তরঙ্গভাব দেখানোর জন্যেই।

'কাল অনেক রাত অব্দি তোমার এখানে বৈঠক চলেছিলো শুনলাম —বেশ জোরদার বৈঠক!' সোফার ওপর একটা পা তুলতে-তুলতে আপ্পাসাহেব বললেন। কথার সুরে বোঝা গেলো না সেটা প্রশ্ন না অভিযোগ। তারপর সিধে আসল কথায় চলে এলেন। আলতু-ফালতু কথা বলার তাঁর সময়ও নেই, বোধহয় ধৈর্যও নেই!

'হ্যাঁ, ও ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।' একটু থামলেন লোচনবাবু যেন পরের কথাগুলো বলার আগে সাজিয়ে নিচ্ছেন। 'গতকাল এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আমরা আর একদিনও মন্ত্রিপরিষদের অঙ্গ হিসেবে থাকব না। যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে আর সহ্য করা অসম্ভব।' লোচনবাবু তাঁর কথার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে আপ্পাসাহেবের মুখের পানে দৃষ্টি ফেলে আবার শুরু করলেন। 'আর এরপর দা-সাহেবের মন্ত্রিসভাও টিকবে না।'

'আমরা কারা?' আপ্পাসাহেবের মুখ ভাবলেশহীন! প্রশ্ন অত্যন্ত সরল।

'যেন আপনি জানেন-ই না? সে যাক্, নামটাম পরে জানলেও চলবে। আপাতত উপস্থিত সংখ্যাটা জেনে রাখাই যথেষ্ট। দলের একশো চল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে পঁচাশি জন আমার পক্ষে। নিঃসন্দেহে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ!'

'আর তুমি এঁদের নেতা?' এবার আপ্পাসাহেবের গলার স্বরে স্পষ্ট অভিযোগের সুর শোনা গেলো, আর সে অভিযোগে দলের সম্পাদক-সুলভ উদ্বেগের আভাস।

'এতে কিছু যায়-আসে না। যেভাবে খোলাখুলি জুলুম আর বাড়াবাড়ি চলছে তাতে আমাদের সবাইকে এসবের ভাগীদার হতে হচ্ছে —আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত!' উত্তেজনায় লোচনবাবুর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো। 'অত্যাচারীকে বাঁচাও আর নিপীড়িতকে দলে মারো —এই নীতিকে সঙ্গে নিয়েই কি আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম?' লোচনবাবুর গলায় স্পষ্ট চ্যালেঞ্জের সুর।

'কিন্তু আমাদের নীতি এবং আদর্শ তো এটাও ছিল না যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের প্রশ্নকে দলীয় সংহতি এবং আদর্শের ওপরে স্থান দেবো।' ঠাণ্ডা গলায় আপ্পাসাহেব কথাগুলো বললেও তা শুনে লোচনবাবু জ্বলে উঠলেন। রাগতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে নিজের স্বার্থ দেখছে? গরীব মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবাকে কি আপনি নিজের মঙ্গলের কথা বলে ভাবেন? অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা কি ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা?'

'মুখ্যমন্ত্রী হবার আশ্বাস পেয়েছ না-কি ?' কণ্ঠে ক্রোধের প্রকাশ না থাকলেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হুল ফোটালেন তিনি।

লোচনবাবু হকচকিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন। আপ্পাসাহেব যেন তাঁর এই উত্তেজনাকে তাঁর দুর্বলতা না ভেবে বসেন। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে মানসিক চাপ ঝেড়ে ফেলে একটু ব্যঙ্গের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে জবাব দিলেন, 'অধিকাংশ সময়ই আপনার দা-সাহেবের সঙ্গে কাটে তাই আপনি এ সিদ্ধান্তে যদি পৌঁছে থাকেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।'

এইসময় লোচনবাবুর মেয়ে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কাপটা ধরে আপ্পাসাহেব সস্নেহে তার হাত ধরে নিজের পাশে বসালেন। বললেন, 'সোনা, তুই খুব চটপট বড় হয়ে উঠছিস, আর একটু তাড়াতাড়ি বড় হয়ে বাবাকে একটু শাসন করতে শুরু কর তো। তোর বাবা বড্ড ফোঁস-ফোঁস করে।' বলেই মুরুব্বির হাসি হাসলেন আপ্পাসাহেব। সোনা কোনো জবাব দিলো না, আপ্পাসাহেবের হাত থেকে ছাড়া পেতেই সে ছুটে পালালো ভেতরের দিকে। আপ্পাসাহেবের কথায় যে হালকা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো সোনার সঙ্গে সঙ্গে তাও উধাও হলো।

নিজের-নিজের কাপে চুমুক দিতে-দিতে তাঁরা দু'জনেই পরস্পরের কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। চায়ের কাপ শেষ করে আপ্পাসাহেব একপাশে তা সরিয়ে রাখলেন, পকেট থেকে রুমাল বার করে আলতোভাবে তা ঠোঁটে ঠেকিয়ে আবার পকেটে ঢোকালেন। তারপর অন্যভাবে আবার কথা শুরু করলেন। বদলে গেলো তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর বাচনভঙ্গি।

'দেখো লোচন, তোমাদের অসন্তোষের কথা প্রায়ই ওঠে, বরং বলা উচিত দু-তিন দিন অন্তর-অন্তরই উঠছে। তোমরা যে খুব ভুল করছ তা আমি বলছি না। ভাবছ আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। যা ঘটছে, যেভাবে ঘটছে তাতে কি মনে করছ আমি খুব খুশি ?' বলার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই দুঃখ ও অসন্তোষের হালকা ছোঁয়া আপ্পাসাহেবের মুখে ফুটে উঠলো।

'ভুল হচ্ছে এবং তার ফলে সবাই আজ অসন্তুষ্ট এ কথা ঠিক। কিন্তু এ কথা ভুলে যেও না যে আজ আমরা এমন এক চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছি যেখান থেকে চোখ বুজে কোনো একটা রাস্তা বেছে নেওয়া যাবে না।' একটু থামলেন আপ্পাসাহেব, তারপর আবার শুরু করলেন, 'একবার ভেবে দেখেছ, এখন যদি তোমাদের মধ্যে বিরোধ মাথাচাড়া দেয় এবং তার ফলে যদি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে তাহলে সরোহা নির্বাচনের কি হাল হবে ? প্রশ্ন শুধু নির্বাচনের একটা আসন নয় প্রশ্ন হলো সুকুলবাবু ফিরে আসবেন কি-না। তাঁর জয়লাভের অর্থই হলো আমাদের অযোগ্যতাকে ঢাকঢোল পিটিয়ে মানুষের সামনে ঘোষণা করা, নয়-কি ? সেটা

কি পার্টির পক্ষে ভালো হবে ? পার্টির ভাবমূর্তিই-বা কি হবে ? মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারগুলো একটু ভেবে দেখো।'

কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় লোচনবাবু ভাববেন কেমন করে। এই মুহূর্তে তাঁর মাথায় আগুন জ্বলছে, দাউদাউ আগুন। তাই আপ্পাসাহেবের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো সে আগুনে নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। আপ্পাসাহেবের প্রশ্নগুলোকে আদৌ গুরুত্ব দিলেন না লোচনবাবু, আগের মতো ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সরকারি রেট অনুযায়ী মজুরদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে না …জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে …প্রতিদিন বেড়ে চলেছে অত্যাচার …নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই… বিসুর মৃত্যু …এই-সমস্ত ঘটনায় বুঝি পার্টির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ? পার্টির কথা আজ আর কে ভাবছে ?'

উত্তেজনায় থমথম করছে লোচনবাবুর মুখ। কি আর করবেন, আসলে তাঁর ধাতটাই এইরকম। লোচনবাবুর উত্তেজিত কথাবার্তায় আপ্পাসাহেব দুঃখ পেলেন না। দলীয় সংহতি এবং সুনাম দুই-ই বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁর এবং তিনি তাঁর এ দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

'হ্যাঁ, এ সমস্ত ঘটনায় পার্টির সুনাম কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বৈকি, এখন যা সামান্য অবশিষ্ট রয়েছে তুমি এবার সেটুকুও ধুলোয় মিশিয়ে দাও।'

এক অদ্ভুত অসহায়-বোধ আপ্পাসাহেবের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো, 'মানুষের অপরিসীম বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছার দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা সত্ত্বেও আমাদের পার্টির দিন ঘনিয়ে এসেছে।' গভীর ক্ষোভে কাঁধ ঝাঁকালেন আপ্পাসাহেব।

'মনে হচ্ছে আপনারা সম্ভবত ভুলে যাচ্ছেন যে দা-সাহেব ছাড়াও পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে।' লোচনবাবুর গলায় স্পষ্ট অভিযোগের সুর ফুটে উঠলো। আপ্পাসাহেব মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন কিন্তু পরক্ষণেই তা সামলে নিয়ে বললেন, 'তুমি ভুল বুঝছ। আমি কেবল এটাই বলতে চাই যে সুকুলবাবুর জয়লাভ আমাদের পার্টির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, এ কথা ভুলো না।'

'পার্টি …পার্টি …পার্টি। যেন পার্টির অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের আজ একমাত্র লক্ষ্য। একদিন গলা উঁচু করে আমরাই বলেছিলাম যে এই পার্টির মাধ্যমে আমরা কিছু ভালো কাজ করতে চাই। সে সবের কি হলো ?'

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে না পারার ক্ষোভ ফুটে উঠলো লোচনবাবুর কণ্ঠে এবং মুখমণ্ডলে, কিন্তু আপ্পাসাহেব নির্বিকার। শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, 'কখনো-কখনো এ-তো ঘটেই। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে আমরা পথ তৈরি করি …কিন্তু যখন পথ তৈরি হতে থাকে তখন সেই নির্মাণ-কার্যই আমাদের একমাত্র

লক্ষ্যবস্তু—মনোযোগের কেন্দ্রস্থল। এই পথ তৈরি হওয়ার পরই গড়ে ওঠে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার আসল পথ।'

একটা লাগসই উপমা দিতে পেরে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন আপ্পাসাহেব। তাঁর মনে হলো এই উপমার মধ্যে দিয়েই যেন তিনি তাঁরও অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। কিন্তু লোচনবাবু যা জবাব দিলেন তাতে তাঁর সব সন্তুষ্টি ঘুচে গেলো।

'যে রাস্তা প্রতিদিন একগজ তৈরি হয় আর দু'গজ খুঁড়ে ফেলা হয়, আপনি কি বিশ্বাস করেন সে রাস্তা কোনোদিন তৈরি হবে? মিথ্যার জগতে যদি আপনি বাস করতে চান, অবশ্যই করবেন। কিন্তু এই দু'মুখো জীবন-যাপন করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।'

যেন শেষ কথা শুনিয়ে দিলেন লোচনবাবু। আপ্পাসাহেব কোনো জবাব দিলেন না, শুধু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন লোচনবাবুর দিকে যেন নিজের চোখের চাউনি দিয়ে লোচনবাবুর সিদ্ধান্তকে ওজন করে নিচ্ছেন।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। লোচনবাবু একটু ঝুঁকে পড়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন এবং কার ফোন সেকথা পুরোটা না শুনেই ঘণ্টাখানেক পরে ফোন করার আদেশ দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

'আমি চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শক্তি-পরীক্ষার জন্যে আপনি দলের বিধায়কদের বৈঠকের একটা দিন ঠিক করবেন।'

এটা লোচনবাবুর অনুরোধ, না আগ্রহ অথবা আদেশ তা বোঝা মুশকিল।

'হুঁ। দা-সাহেবও দলের বিধায়কদের বৈঠক ডাকার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি কয়েকজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে চান। প্রতি পদে-পদে বিরোধ নিয়ে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।' আপ্পাসাহেব লোচনবাবুর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে তাঁর মুখের ওপর হালকাভাবে দৃষ্টি বুলালেন।

'ব্যাপারটা আমিই থামিয়ে রেখেছি। নিজেদের এই মতভেদ যদি অন্তত নির্বাচন পর্যন্ত দূরে সরিয়ে রাখা যায় তাহলে খুবই মঙ্গল। সম্পাদক হিসাবে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে এই মুহূর্তে সকলের একজোট হয়ে আমাদের নির্বাচন অভিযানে লেগে পড়া উচিত।'

'লখনের জন্যে?' ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের হাসি ঝরে পড়লো লোচনবাবুর ঠোঁটে।

'না পার্টির জন্যে।'

'এই সমস্ত বাহ্যিক কারণ তুলে ধরে ভেতরের মতবিরোধ আর তিক্ততা ধামাচাপা দিতে পারবেন না, আর তা ঠিকও নয়। আমরা পাঁচ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করতে চলেছি, পার্টি ···সংহতি এ সমস্ত প্রশ্ন তুলে আমাদের সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারবেন না।'

আলোচনার উপসংহারে লোচনবাবু শেষ কথাটি শুনিয়ে দিলেন। আপ্পাসাহেব

নির্নিমেষ নয়নে লোচনবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে তাঁর ছড়িটা তুলে নিলেন, দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন ছড়িটাকে এবং মেঝেতে অকারণ ঠুকতে-ঠুকতে বললেন, 'যাদের ওপর ভরসা করে তুমি মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিচ্ছ তারা যে আরো বেশি লাভের আশায় তোমাকেও পরিত্যাগ করে যাবে না সে বিশ্বাস তোমার আছে তো? বেড়ার ওপর বসে যারা দিনরাত নিজেদের দরদস্তুর করে, তুমি তাদের ওপর নির্ভর করেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ ...আমার ভয় হচ্ছে তোমার মুখে চুনকালি না পড়ে।'

আপ্পাসাহেব তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা লোচনবাবুকে আর একবার সতর্ক করে দিতে চাইলেন।

'আমি কাউকে প্রলোভনও দেখাইনি, কিনেও নিইনি। ব্যক্তিগত আদর্শের প্রতি যাঁদের সামান্যতম নিষ্ঠা আছে, তাঁরা স্বেচ্ছায় আমার পাশে এসেছেন।'

'আদর্শ!' স্মিত হাসি হাসলেন আপ্পাসাহেব। তারপর বোঝাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখো, বিরোধীদলের লোকেরা বিসুর মৃত্যুকে যদি একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে তার অর্থ তবু বোঝা যায়, কিন্তু...।' কথাটা শেষ করলেন না আপ্পাসাহেব। হাতের ছড়ির ওপর দেহের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। লোচনবাবুও উঠে দাঁড়ালেন, আপ্পাসাহেব তাঁর একটা হাত রাখলেন লোচনবাবুর কাঁধে।

'তোমাদের গত রাতের মিটিঙ সম্পর্কে আজ সকালে দিল্লীর কর্তাদের সঙ্গে কথা হলো। গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনের মুখে তোমার এই আচরণে তাঁরা খুবই অসন্তুষ্ট। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত আমায় নিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে?' যেতে-যেতে আপ্পাসাহেব লোচনবাবুর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেন। কিন্তু লোচনবাবু নির্বিকার। তিনি শুধু বললেন, 'আপনাদের কিন্তু বেশ উচ্চ মূল্য দিতে হবে।'

আপ্পাসাহেবের স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি ব্যাহত হলো। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলালেন তিনি লোচনবাবুর মুখের ওপর। যেন লোচনের অন্তস্তলে অবগাহন করে তিনি তার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ জানতে চাইলেন। কিন্তু লোচনের মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। পূর্বের সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে তিনি অবশেষে যে প্রশ্ন এতক্ষণ পর্যন্ত এড়িয়ে চলছিলেন সেই প্রশ্নটাই ছুঁড়ে দিলেন। 'মনে হচ্ছে সুকুলবাবুর সঙ্গে তোমার একটা সমঝোতা হয়েছে? শুনলাম গোপনে তুমি তাঁর হয়ে নির্বাচনে কাজ করছ?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন লোচনবাবু। হাসি শেষ করে শুধু বললেন, 'মনে হচ্ছে দা-সাহেব তাঁর সমস্ত মনোযোগ গুপ্তচর বিভাগের ওপরই ন্যস্ত করেছেন। এই কারণেই বোধহয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাঁর নিজের হাতে রেখেছেন, অন্য কাউকে দিতে

চাইছেন না। যাক্, অন্তত এই বিভাগের অতিরিক্ত সজাগ ও সক্রিয় কাজকর্মের জন্যে তিনি ধন্যবাদের পাত্র।'

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরতেই লোচনবাবু আপ্পাসাহেবকে ধরে ভেতরে বসতে সাহায্য করলেন।

লোচনবাবুর হাসি এবং কথায় আপ্পাসাহেব কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত। বোধহয় তাঁর ঐ কথাগুলো বলা উচিত হয়নি। আসলে তিনি নিজেও তো এই কথাটা বিশ্বাস করেন না।

লোচনবাবু গাড়ির দরজা বন্ধ করতে গেলে বাধা দিলেন আপ্পাসাহেব। আগ্রহভরে হাত ধরে ভেতরের দিকে টেনে বললেন, 'মিনিট দু'য়েকের জন্যে একটু বসো।'

লোচনবাবু বসলেন না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বললেন, 'বলুন'।

লোচনের হাতের ওপর নিজের হাত বুলাতে-বুলাতে আপ্পাসাহেব গভীর স্নেহ আর অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'দেখো, এই পার্টি গড়ে তুলতে তুমি অনেক সহযোগিতা করেছ এবং আমি জানি এই পার্টির প্রতি তোমার আস্থাও রয়েছে ...বরং বলা উচিত তোমার এই পার্টির প্রতি একটা মোহ রয়েছে। নিজের হাতে তৈরি-করা জিনিসের প্রতি এই মোহ থাকে। তাই বলছি তোমার এই সিদ্ধান্ত কিছুদিনের জন্যে মুলতবি রাখো। নির্বাচনের পর তুমি যেমন চাইবে তাই হবে। এটা তো ঠিক যে দা-সাহেবকে নতুন করে দলের বিধায়কদের আস্থা অর্জন করতে হবে।' আপ্পাসাহেব থামলেন। তাঁর মনে হলো, লোচন নিশ্চয়ই কোনো পাল্টা জবাব শুনিয়ে দেবেন কিন্তু লোচনবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি গাড়ির কাঁচের ভেতর দিয়ে দূরে কিছু লক্ষ্য করছিলেন। তাই দেখে আপ্পাসাহেবের সাহস একটু বাড়লো, বললেন, 'শুধু মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েই যদি ব্যাপারটা থেমে যেতো তাহলে আমি কখনই তোমার কাছে ছুটে আসতাম না। কিন্তু তুমি যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এই মুহূর্তে কিছু করে বসো তাহলে পুরো পার্টিই পথে বসবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি অন্তত পার্টির সঙ্গে এমন...।' আপ্পাসাহেব কথা শেষ করলেন না।

চোখ ফিরিয়ে লোচনবাবু আপ্পাসাহেবের মুখের পানে চাইলেন এবং স্থিরদৃষ্টি মেলে রইলেন। তারপর অত্যন্ত সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কোন কথাকে বিশ্বাস করব —এখন যা বলছেন তাকে, না দু'মিনিট আগে যে অবিশ্বাস ব্যক্ত করলেন তাকে?'

'শুধু এটুকু বিশ্বাস কর, আজ আমরা খুব অসহায়, আমাদের নিজেদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, আমাদের পারিপার্শ্বিকতার ওপরও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।'

এবং হঠাৎ আপ্লাসাহেবের কণ্ঠস্বর এক অজানা মানসিক যন্ত্রণায় আর্দ্র হয়ে উঠলো। তিনি তাড়াতাড়ি লোচনবাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করলেন এবং গাড়ি চালাতে বললেন। মোটরের কর্কশ শব্দের মাঝে আপ্লাসাহেবের আওয়াজ ভেসে এলো, 'ফোন করব।'

গাড়ি চলে গেলো, লোচনবাবু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখ ফ্যাকাসে। তিনি আপ্লাসাহেবের ক্রোধ-অভিযোগ-ব্যঙ্গ-চাতুরীর অনেক রূপ দেখেছেন, কিন্তু এই রূপ! একে তিনি কি নামে অভিহিত করবেন হঠাৎ ঠিক করতে পারলেন না। তবে তিনি এটা অনুভব করলেন যে কোনো-এক গভীর অসহায় অবস্থার কারণে আপ্লাসাহেবের এই আর্দ্র কণ্ঠস্বর যেন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যথিত হৃদয়তন্ত্রীকেই স্পর্শ করলো। গত তিন মাস কি তিনি নিজেই এই অসহনীয় পরিস্থিতির দ্বারা পরিবেষ্টিত নন? যে কাজ তিনি করতে চান তা করতে পারছেন না, যা করছেন তা তিনি করতে চাইছেন না। এক অসহ্য দু'মুখো জীবন-যাপন করতে হচ্ছে তাঁকে। কিন্তু না, আর কিছুতেই না।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাও এবং উন্নয়নমন্ত্রী চৌধুরী অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আপ্লাসাহেব আর লোচনবাবুর মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে তা শুনলেন। 'মন্ত্রিসভা হঠাও' অভিযানে এঁরা দু'জনে লোচনবাবুর ডান এবং বাঁ হাত। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তাঁদের মধ্যে বিরাট ফারাক থাকলেও এই মুহূর্তে তাঁরা একই নৌকার যাত্রী, সুতরাং তাঁরা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। সব কথা শোনার পর রাও সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আপনার মনে আর কোনো কিন্তু নেই তো লোচন-ভাই?'

'না, না।'

'হ্যা-হ্যা, আর খুব বেশি চিন্তা-ভাবনার ঝামেলায় পড়বেন না। আগুন লাগার ঘটনার পরই যদি আমরা জিদ ধরতাম তাহলে আজ সরোহা উপনির্বাচনে আমাদের লোকই প্রার্থী হতো। অথচ প্রত্যেকবারই আমাদের জোর করে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে আর আমরা মুখ বুজে সহ্য করেছি। কখনো অনু-শাসনের নাম করে, কখনো পার্টির সংহতির দোহাই দিয়ে। আমরা কখনো আপ্লাসাহেবের হাঁটুর তলায় আবার কখনো-বা দিল্লীর বুড়ো আঙুলের তলায়। কিন্তু এবার…।'

'এবার কপালে সব গেলো।' মাঝপথেই চৌধুরী রাও-এর কথা লুফে নিলেন। 'এটা একটা দারুণ সুযোগ। ঘটনা যেভাবে ঘটে চলেছে তাতে সাধারণ মানুষের কাছেও দা-সাহেব ক্রমশই হেয় হয়ে পড়ছেন। আমরাও যদি এখন আমাদের অসন্তোষের কথা তুলে ধরি তাহলে তা আরো ওজনদার হবে। কিন্তু সরোহা নির্বাচনে যদি জিতে যান তাহলে তাঁর দেপদপি আবার তুলে আর

তখন আমাদের অসন্তোষ প্রকাশ করাও নিষ্ফল। পরিস্থিতি যখন জটায়-জটায় বদলাচ্ছে তখন খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা না করাই ভালো। আপনি বরং নোটিশের একটা মুসাবিদা করে ফেলুন।'

লোচনবাবুর মনে যতটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জেগেছিলো এঁদের কথায় তা দূর হয়ে গেলো। উৎসাহিত লোচনবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, আমি মুসাবিদা করে ফেলছি এবং যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব বিধায়কদের দিয়ে সই করিয়ে আল্লাসাহেবের হাতে তুলে দিচ্ছি।'

'হুঁ!' এবার রাও-এর গলায় একটা দুশ্চিন্তার ছোঁয়া পাওয়া গেলো এবং সেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেতেও বিলম্ব ঘটলো না। রাও সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'নোটিশ দেবার আগে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি কিছু কথা বলে নিলে ব্যাপারটা আরো ভালো হতো না? সহজ-সরল মারপ্যাঁচহীন কিছু কথাবার্তা?' বলার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর কটা চোখে অস্পষ্ট ধূর্ততা ফুটে উঠলো।

রাও-এর উদ্দেশ্য বুঝতে লোচনবাবুর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হলো না এবং তিনি না বোঝার ভাণও করলেন না, কেবল বললেন, 'সেসব তো পরে করলেও চলবে। প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করুন।' লোচনবাবুর হিমশীতল কণ্ঠস্বর রাওকে বিচলিত করলো না, তিনি বিনা সঙ্কোচে বললেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কি-ভাবে সম্ভব হবে? শুধু বাতাসে তলোয়ার ভাঁজতে কে আর রাজি হবে? পাঁচ জন মন্ত্রী ইস্তফা দিতে তৈরি ...কিন্তু কেন তাঁরা ইস্তফা দেবেন?'

'কেন? দা-সাহেবের আদর্শের সঙ্গে সংঘাত বাধছে তাই।'

রাও অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, যেন লোচনবাবু দারুণ হাসির কথা বলেছেন। হাসি থামলে তাঁর কটা চোখ দু'টো লোচনবাবুর মুখের ওপর নিবদ্ধ করে বললেন, 'এখানে আপনি তো আর জনতার সামনে ভাষণ দিচ্ছেন না লোচন-ভাই, হাড়িকাঠে মাথা দিয়েছে এমন দু'টো ছাগলের সামনে কথা বলছেন। তাদের জন্যে অন্তত কিছু ঘাস-পাতার ব্যবস্থা তো করবেন, না-কি?'

অকস্মাৎ লোচন-ভাইয়ের আল্লাসাহেবের সেই কথাগুলো মনে পড়লো, 'যারা প্রতিদিন নিজেদের দর-কষাকষি করে চলেছে তাদের ওপর ভরসা করে তুমি এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছ...', একথা মনে পড়তেই মুহূর্ত-পূর্বের সেই উৎসাহের বেগ আবার স্তিমিত হয়ে গেলো।

'মনে হচ্ছে আপনারা হিসেব-নিকেশ করেই এসেছেন। তাহলে নিজেদের দামটাও বলে ফেলুন।' কথাতে না হলেও, লোচনবাবুর বাচন-ভঙ্গিতে বাঘের এমন তীক্ষ্ণতা প্রচ্ছন্ন ছিলো যা মানুষের ভেতর পর্যন্ত ফালা-ফালা করে চিরে দিতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবেশে বসবাস করে যাদের গায়ের চামড়া গণ্ডারের মতো শক্ত হয়ে গেছে তাদের ওপর এত সহজে কোনো প্রভাব পড়ে না!

'না হিসেব করে আসিনি, তবে করতে এসেছি।' রাও-এর গলায় সংকোচ বা দ্বিধা কোনোটাই নেই। তাঁর প্রতিটি কথায় চৌধুরী যেভাবে ঘাড় নাড়াচ্ছিলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো তাঁরা নিজেদের ঘুটি সাজিয়ে ফেলেছেন।

'ঘাস-পাতা দেবার আমি কে?' লোচনবাবুর কণ্ঠে ক্ষোভমিশ্রিত এক অসহায় মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

'লোচন-ভাই, আপনার এই ধরনের কথাবার্তা মনে বড় ধাঁধা জাগিয়ে তোলে। এ কথা তো সবাই জানে যে যারা বিক্ষুব্ধ তাদের মধ্যে আপনার সমর্থকই বেশি। শাসনের লাগাম থাকবে আপনারই হাতে ...ঘাস-পাতা যোগাবার জন্যে আর কে আসবে বলুন?'

রাও-এর কথায় লোচনবাবুর মন-মেজাজ দারুণ খিঁচড়ে গেলো, নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'সন্তোষ তো আমরা সবাই জড়ো হচ্ছি। আপনারা যা চাইবেন যেমনটি বলবেন তাই হবে ...আমার দিক থেকে ও বিষয়ে তেমন কোনো বাধা আসবে না।'

সমস্ত ব্যাপারটির প্রতি লোচনবাবুর কণ্ঠস্বরে এমন এক ঔদাসীন্য ছিলো যে অপ্রস্তুত রাও এবং চৌধুরী পরস্পরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। তারপর পুরো ব্যাপারটিকে সহজ করে তোলার জন্যে রাও বললেন, 'ঠিক আছে লোচন-ভাই, আমরা তো আপনার হুকুমের চাকর। আপনি নোটিশ তৈরি করুন... আমরা সই করব এবং অন্যদের দিয়েও সই করাব।'

যাওয়ার আগে রাও বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন, 'হুঁ, রাও নিজের হাতে কোনো কাজ নেয় না আর যদি নেয় তাহলে তরীকে সে কূলে ভিড়িয়ে তবেই ছাড়ে। এ কথা জেনে রাখুন যে বিসুর মৃত্যু এবার দা-সাহেবের মন্ত্রিসভার মৃত্যুতে পরিণত হবে।'

এই ঘোষণার দ্বারা লোচনবাবুর মনে নিজেদের প্রাধান্য সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করবার পর তাঁরা বিদায় নিলেন।

কিন্তু লোচনবাবু মন্ত্রিসভার মৃত্যু-ঘোষণা শুনে আদৌ পুলকিত হলেন না, রাও এবং চৌধুরীর মূল্যের কথা ভেবেও তিনি চমৎকৃত হলেন না। শুধু একটা প্রশ্ন তাঁকে কুরে-কুরে খাচ্ছিলো—কি উদ্দেশ্যে তিনি এসব করছেন? আর কেনই-বা?

এই পরিবর্তন চেয়েই কি তিনি সুকুলবাবুর পার্টি এবং বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন? তিনি কি এই বিপ্লবের স্বপ্নই দেখেছিলেন? এই নীচ বেসাতির জন্যেই কি তিনি এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর কথা চিন্তা করছেন? নাম-মুখাকৃতি-প্রতীক আলাদা-আলাদা হলেও এদের মধ্যে তফাৎ কোথায়? সুকুলবাবু ...দা-সাহেব ...রাও ...চৌধুরী...।

তাহলে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

তখনো আকাশ ফর্সা হয়নি। চারদিকে অন্ধকারের রেশ রয়ে গেছে। দা-সাহেব খালি-পায়ে সবুজ ঘাসের ওপর পায়চারি করছেন। শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর হাঁটলে শুধু যে চোখের জ্যোতিই বাড়ে তাই নয়, মন-মেজাজও এমন তরতাজা হয়ে ওঠে যে সমস্ত দিন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা যায়। মনে শান্তি আসে, প্রফুল্লতা জাগে!

দা-সাহেবের সঙ্গে পাণ্ডেজীও আছেন। ভোরের মন-মাতানো প্রাকৃতিক শোভা, ঠাণ্ডা বাতাস এবং মানসিক শান্তিদাতা দা-সাহেব সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডেজীর চোখে-মুখে একরাশ দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠেছে!

লোচনবাবুর বাড়িতে কাল রাত দু'টো অব্দি যে বৈঠক হয়ে গেছে তার পুঙ্খানু-পুঙ্খ বিবরণ শোনাবার দা-সাহেবকে পরও তাঁর দুশ্চিন্তার বোঝা এতটুকু কমেনি।

আজই আপ্পাসাহেবের সঙ্গে লোচনবাবুর দেখা হওয়ার কথা, কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে অন্যান্যবারের মতো এবার আর তাঁরা কথা শুনতে রাজি নন। মুকুলবাবু এই নির্বাচনে প্রার্থী আর সে কারণেই এই নির্বাচন একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনই তো সকলের একজোট হয়ে কাজ করা দরকার।...পাণ্ডে বললেন, 'অথচ সাহায্য করা তো দূরের কথা, ঠিক এই সময়ই...' তাঁর গলার স্বরে ক্ষোভের সুর এমন গভীরভাবে ফুটে উঠলো যে বাকি কথাগুলো চাপা পড়ে গেলো।

খুব মনোযোগ সহকারে দা-সাহেব কথাগুলো শুনছিলেন। মনে একটু-আধটু দাগও কাটছিলো, কিন্তু চেহারায় তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না।

'সবশুদ্ধ পঁচাশি জন লোচনবাবুকে সমর্থন জানাতে চলেছেন।'

'লোচন খুবই আশাবাদী! ঠিকই তো, এই বয়সেই তো মানুষের আশাবাদী হওয়া উচিত। নিছক আশার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু করে ফেলতে পারে।'

এই সমস্ত কথাবার্তা শোনার ধৈর্য এখন পাণ্ডেজীর নেই। তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোচনবাবুর সঙ্গে আপনি দেখা করবেন? একটা সময় ঠিক করে ফেলি? এবার বোধহয় আপ্পাসাহেবের ব্যাপা...।'

'পাণ্ডে?' মাঝপথেই বাধা দিলেন দা-সাহেব। 'সবোহা নির্বাচনের কাজ-দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তুমি ওদিকটাই সামলাও। এ সমস্ত কথা ভেবে তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই।'

কোনো মানুষ যাতে তার নিজের দায়িত্ব এবং অধিকারের সীমা না ছাড়িয়ে যায়, তার প্রতি দা-সাহেবের তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি

যথাসম্ভব হস্তক্ষেপ না করারই চেষ্টা করেন, কিন্তু অধিকারের পরিধি অতিক্রম করার প্রশ্রয় তিনি কাউকেই দেন না।

এটা ঠিক যে শহরের কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সেসব খবরাখবর দা-সাহেবের কাছে পৌঁছে দেওয়াই পাণ্ডেজীর কাজ কিন্তু ঐ পৌঁছে দেওয়া পর্যন্তই। সে ঘটনায় দা-সাহেবের প্রতিক্রিয়া অথবা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানার অধিকার তাঁর নেই। তবে হ্যাঁ, সরোহা নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব আস্থা-সহকারেই দা-সাহেব তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন, কাজ করার যথেষ্ট অধিকারও তিনি দিয়েছেন। সেই কথাটাই এই প্রসঙ্গে টেনে নিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন দা-সাহেব, 'সরোহায় জনসভা ১৫ তারিখে তো ···মানে পরশু ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রস্তুতি কেমন হয়েছে ?'

'কুটির শিল্প যোজনার প্রচার জোর-কদমে চলছে। আমাদের লোকরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে লোকজনদের বুঝিয়ে ফর্ম ভর্তি করাচ্ছে।'

'মানুষের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কেমন ?'

'কিছু লোকের মধ্যে তো বেশ উৎসাহ রয়েছে। আবার বেশ কিছু লোক ঠিক বিশ্বাস করছে না, তাদের বক্তব্য হলো, এসব অনেকদিন থেকেই শুনে আসছে। আসলে কিছুই হবে না, সবই ভড়ং।'

'এই নিছক কাগুজে পরিকল্পনায় মানুষ তো একসময় অবিশ্বাসীই হয়ে ওঠে!'

পাণ্ডেজীর মনে হলো এজন্যে তাঁকেই দায়ী করা হচ্ছে। তাই কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'কিন্তু এই কাজের জন্যে তো ···!'

'থাক্, ওসব কথা ছাড়ো।' পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে অযথা সময় নষ্ট করা দা-সাহেবের ধাতে নেই। 'দু'টো ব্যাপারে খেয়াল রাখা হয়েছে তো ? কোনো অবস্থাতেই পঞ্চায়েত যেন এই পরিকল্পনার মধ্যে নাক না গলায়। সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েতের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।'

'আজ্ঞে না, একটা আলাদা দপ্তর এ ব্যাপারে দেখাশোনা করছে। অবশ্য তার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকছে'

'এই পরিকল্পনায় সুবিধার সিংহভাগটা যেন হরিজন এবং ক্ষেতমজুররা পায়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তোমার ওপর কোনো কাজের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্তেই থাকি। কারণ আমার প্রত্যাশার চেয়েও তোমার কাছ থেকে বেশি কাজ পাওয়া যায়।'

দা-সাহেবের দৃষ্টি স্নেহ এবং প্রশংসায় ভিজে উঠলো। পাণ্ডেজীও আহ্লাদে গদগদ হয়ে গেলেন।

যাঁরা দা-সাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেন, তিনি যে তাঁদের শুধু প্রশংসাই করেন তাই নয়, সুযোগ পেলে যথাসম্ভব পারিশ্রমিক দিতেও কার্পণ্য করেন না।

সুকুলবাবুর মিটিঙের ধুলো তখনো থিতিয়ে পড়েনি, গাঁয়ে নতুন করে সোরগোল শুরু হয়ে গেলো। পরদিন সকাল হতে না হতেই অলিতে-গলিতে, বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে কুটির শিল্প যোজনার পোস্টার সেঁটে দেওয়া হলো এবং সন্ধ্যের মধ্যেই অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে যতদূর দৃষ্টি যায় সর্বত্রই দা-সাহেবের হাসিভরা মুখের ছবি এবং তার নিচে যোজনার রূপরেখা। যেন মনে হচ্ছে, দা-সাহেবের হাসির ঝর্ণাধারা থেকেই এই যোজনা বেরিয়ে আসছে। জনা পাঁচ-সাতেক স্বেচ্ছাসেবক-গোছের লোক বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সবিস্তারে বোঝাচ্ছে, ফর্ম ভর্তি করাচ্ছে এবং অবশ্যই একথা বলতে ভুল করছে না যে আগামী ১৫ তারিখে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই পরিকল্পনার শুভ উদ্বোধন করার জন্যে গ্রামে পদার্পণ করছেন। দু'কামরা-বিশিষ্ট একটা ছোট্ট বাড়িতে একটা অস্থায়ী কার্যালয় খোলা হয়েছে, সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মানুষের লাইন। কাজ যে রকম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হচ্ছে দিন-সাতেক যেতে না যেতেই সব বাড়িতে এক একটা ছোটখাটো শিল্প গড়ে উঠবে এবং দেখতে-দেখতে এই গাঁ শতাব্দীকালের দারিদ্র্য-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে! কয়েকদিনের মধ্যেই এই পরিকল্পনা গাঁয়ের চেহারা আমূল বদলে দিয়েছে। এখন এই পরিকল্পনার কথা শুধু যে গ্রামের লোক-জনের আলোচনার বিষয়বস্তুই হয়ে দাঁড়ালো তাই নয়, তাদের চিন্তার খোরাকেও পরিণত হলো!

হ্যাঁ, গাঁয়ে অবশ্য এমন একদল মানুষেরও আবির্ভাব ঘটেছে যারা শুধু খোলাখুলি ভাবে এই পরিকল্পনারই বিরূপ সমালোচনা করছে তাই নয়, গাঁয়ের মানুষকে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সাবধানও করে দিচ্ছে এবং তারা বিশুর মৃত্যু-প্রসঙ্গকে জিইয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশু মারা গেছে। ঠিক আছে। কিন্তু বিশুর মৃত্যু-প্রসঙ্গও যদি চাপা পড়ে যায় তাহলে এরা কেমন করে বেঁচে থাকবে? গাঁয়ে এক অদ্ভুত দোটানার খেলা শুরু হয়ে গেলো।

আর আজ সেই দড়ি-টানাটানির খেলা চরমে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী দা-সাহেব গাঁয়ে আসছেন। একদিকে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্যে তোড়জোড় চলছে। সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত দা-সাহেব। তাঁর কঠোর আদেশে তাঁর সম্বর্ধনায় বাড়তি জাঁকজমক না থাকলেও বেশ উৎসাহ দেখা দিয়েছে এবং সেই উৎসাহ চারদিকে যাতে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্যে চেষ্টা চলছে। গাঁয়ে যেন নতুন সুখের বান ডেকেছে। দলে-দলে পুলিশ এসেছে, কারো-কারো গায়ে পুলিশের পোষাক; অবশ্য বেশ-কিছু

পুলিশ সাদা পোষাকে এসেছে। মুকুলবাবুর মিটিঙের দিনের তুলনায় আজ ব্যস্ততা দ্বিগুণ। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। গদিতে আসীন আর গদিবিহীন মন্ত্রীর মধ্যে কি বিরাট ফারাক! অপর দিকে, কালো পতাকা এবং বিরাট-বিরাট পোস্টার টাঙানো হয়েছে। তাতে আগুন লাগানোর ঘটনার এবং বিসুর মৃত্যুর কৈফিয়ৎ দাবি করা হয়েছে জোরালো, তীক্ষ্ণ ভাষায়। ঝুমন পালোয়ানের আখড়ায় কবাডি খেলার সময়ে যে তামাশা জমে ওঠে, গাঁয়ের লোকের কাছে এ তামাশা তার চেয়ে কম মজাদার নয়।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই দা-সাহেবের গাড়ি এসে পৌঁছালো। সামনে-পেছনে আরো কয়েকটা গাড়ি। দা-সাহেবের গাড়ি মঞ্চের দিকে না গিয়ে বিসুর বাড়ির পথ ধরলো। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ঘাবড়ে গেলেন, তাঁর নির্ধারিত কার্যক্রমে তো এটা নেই। কিন্তু যাঁরা দা-সাহেবকে খুব কাছ থেকে চেনেন তাঁরা দা-সাহেবের এ ব্যাপারে আদৌ আশ্চর্য হবেন না। তাঁরা জানেন, যেখানে মানবতার প্রশ্ন মুখ্য হয়ে ওঠে সেখানে দা-সাহেব তাঁর কার্যসূচীকে এইভাবে ভাঙচুর করে থাকেন। বিসুর বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি চলার পথ নেই, তাই কেউ-কেউ বললেন হীরাকে এখানে আনা হোক। কিন্তু দা-সাহেব সে প্রস্তাব কানেই তুললেন না। গাড়ি থেকে নেমে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চললেন। সঙ্গের আমলারা এবং স্থানীয় লোকদের একটা বড়-সড় ভিড়ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললো।

দা-সাহেব পৌঁছাবার পূর্বেই কিছু লোক আগেভাগে গিয়ে হীরাকে বার করে আনলো। সে বেচারা তো বিস্ময়ে হতবাক, বুঝতেই পারলো না কি বলবে; কি করবে। দা-সাহেব সহানুভূতির সঙ্গে তার পিঠে হাত রাখতেই, হীরার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে-পড়া জল বলিরেখার মাঝে অদৃশ্য হলো।

'বিসেসরের মৃত্যুতে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি, কিন্তু এবার তুমি সাহসে বুক বাঁধো।' দা-সাহেব খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন এবং তারপর হীরার কাঁধে হাত রেখে তাকে গাড়ির কাছে নিয়ে এলেন। গাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে সে বেচারা হাতজোড় করে জবুথবু হয়ে দাঁড়ালো। নির্বাক, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় সে অত্যন্ত বিচলিত, কৃতজ্ঞ বোধ করছে। দা-সাহেব স্বয়ং তার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এ সম্মান জীবনে ও কখনও পায়নি আর বোধহয় ভবিষ্যতেও কখনও পাবে না। কিন্তু দা-সাহেব যখন তাকে গাড়িতে বসতে বললেন, তখন বিস্ময়ের ধাক্কায় তার মূর্ছা যাওয়ার দাখিল। জীবনে কখনও তার গাড়িতে চড়ার সৌভাগ্যই হয়নি, তাও আবার দা-সাহেবের গাড়িতে! সে না পারছে না বলতে, না পারছে গাড়িতে চড়ে বসতে। কিন্তু দা-সাহেব তার কাঁধে হাত রেখে একরকম ভেতরে ঠেলে দিলেন। গুটিসুটি মেরে এক কোণে গিয়ে বসলো সে, তার

পাশে বসলেন দা-সাহেব। এ দৃশ্য দেখে গাঁয়ের মানুষ উল্লসিত হয়ে উঠলো। দা-সাহেবের বিরাট হৃদয়ের কাছে সকলেই মাথা নোয়ালো। বয়স্ক ব্যক্তিদের শবরী ও নিষাদের গল্পের কথা মনে পড়লো। কেউ-কেউ আবার হীরার সৌভাগ্যে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছিলো। অনেকেই তো সন্তান হারায়, কিন্তু এমন সম্মান ?

হীরাকে সঙ্গে নিয়ে দা-সাহেব মঞ্চে উঠলেন। এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখে পাণ্ডেজী তো থ। দা-সাহেব তাঁকে নিজেই বলেছিলেন যে তাঁর গাঁয়ে আসা এবং মিটিঙের প্রচার যেন কুটির শিল্প পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করেই করা হয়। বিসুর মৃত্যু এবং নির্বাচন প্রসঙ্গকে যেন বেশি গুরুত্ব না দেওয়া হয়। কিন্তু এখন ?

দর্শকদের মধ্যে কালো পতাকা আর পোস্টার নিয়ে যারা বসেছিলো তারা বিসুর নাম করে মাঝে-মাঝে স্লোগান দিচ্ছিলো। কিন্তু তাতে কোনো প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। কেবল থেকে-থেকে বাতাসে অনুরণিত হচ্ছিলো বিসুর নাম। গত পাঁচ দিন পাণ্ডেজী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে একটি কাজই করেছেন —সুকুলবাবুর সমস্ত পোস্টারের ওপর দা-সাহেবের পোস্টার সেঁটে দিয়েছেন আর প্রতিটি বাড়িতে বিসুর মৃত্যু প্রসঙ্গের বদলে কুটির শিল্প পরিকল্পনার প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর বক্তব্য কোথা থেকে শুরু করবেন ? কি বলবেন ? পাণ্ডেজীর সংকটের কথা বোধহয় দা-সাহেব উপলব্ধি করলেন এবং নিমেষে তাঁকে উদ্ধারও করে ফেললেন। সাধারণত বক্তৃতা শুরু হওয়ার আগে যেসব চিরাচরিত প্রথা পালন করা হয়, তার কোনো সুযোগ না দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন দা-সাহেব, হাতে মাইকটা টেনে নিলেন এবং সোজা দর্শকদের সম্বোধন করলেন,

'ভাই সব, এক দুঃখের এবং শোকার্ত পরিবেশে আজ আমি আপনাদের মাঝে এসেছি। এখানে আসার সময়ে আমায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছিলো যে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেই আমি যেন এখানে আসি। আমি সে কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। আত্মীয়-পরিজনের মাঝে মানুষ তো এমনিতেই নিরাপদ। তাহলে এই অতিরিক্ত নিরাপত্তা কার জন্যে ? কেন ?'

মুহূর্তের জন্য দা-সাহেব থেমে, ভিড়ের ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'আমাকে বলা হয়েছিলো, আপনারা খুবই অসন্তুষ্ট। শুনেই মনে হলো তাহলে তো আমার একা আসাই দরকার। আমার ওপর আপনারা যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে তার দায় তো আমার, অন্যদের সেই দায়ের ভাগীদার করা ঠিক নয়। কিছুদিন আগে আপনারাই আমাকে আপনাদের ভালোবাসা এবং আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন। আমি আপনাদের সেই দান মাথা পেতে নিয়েছিলাম। আজ যদি আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করতে চান, আপনাদের সেই আদেশও আমি নতমস্তকে গ্রহণ

করব। আমার যদি কোনো ভুলচুক হয়ে থাকে তাহলে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়ার অধিকার আপনাদের আছে। আর তাকে মোকাবিলা করার দায়িত্বও আমার।'

দা-সাহেব থামলেন। সভাস্থল সম্পূর্ণ শান্ত। তবে হ্যাঁ, সামনের দিকে বসে থাকা কিছু যুবকের মাঝখানে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেলো, কিন্তু সে গুঞ্জনও চাপা পড়ে গেলো।

'মনে হয়েছিলো বিসেসরের মৃত্যুতে আপনারা খুবই উত্তেজিত। তা যদি হতো আমি অবাক হতাম না, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। গ্রামে উত্তেজনা নেই, এ উত্তেজনা কালো পতাকায় জড়িয়ে বাইরে থেকে এখানে আমদানি করা হয়েছে। আপনাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন আপনারা একে প্রশ্রয় দেবেন না। আমি জানি বিসুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আপনাদের মনে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই আমি ডি. আই. জি.-কে নির্দেশ দিয়েছিলাম তিনি যেন নিজে সমস্ত এজাহার খুব মন দিয়ে পড়ে দেখেন। তিনি সে নির্দেশ পালনও করেছেন এবং তাঁর মতে ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট।' থামলেন দা-সাহেব, যেন পরের কথাগুলো মনে-মনে হিসেব করে নিচ্ছেন। তারপর অত্যন্ত সহজকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ঘটনা সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয় বিসেসর আত্মহত্যাই করেছে।' রহস্য উদ্ঘাটন করার ভঙ্গিতে দা-সাহেব কথাগুলো না বললেও সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিক্রিয়া অনেকটা সেই ধরনেরই হলো।

'মিথ্যা কথা ...মিথ্যা কথা ...এটা একটা হত্যাকাণ্ড।'

সামনে বসে-থাকা যুবকদের মাঝ থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো। উত্তেজনা অন্যান্য লোকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা পোষাকের পুলিশ শূন্যে হাত তুলে ধরে তাদের চুপ করাতে লাগলো।

'না-না, কেউ বাধা দেবে না। বলতে দাও।' দা-সাহেব মাইকের স্ট্যাণ্ডটা নিজের হাতে টেনে নিলেন, কণ্ঠস্বর আরো জোরালো এবং কঠোর করে আদেশ দিলেন, 'সকলেরই কথা বলার, মন খুলে কথা বলার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার পাইয়ে দেবার জন্যেই আমরা কঠোর সংগ্রাম করেছি ...জেল খেটেছি... আর সেই অধিকার আজ আমরা কেড়ে নেব? তা যদি হয় তাহলে তা বিরাট অন্যায় কাজ হবে।' তারপর সেই যুবকদের সম্বোধন করে বললেন, 'আপনাদের দেখে তো মনে হচ্ছে না আপনারা এখানকার বাসিন্দা। তবুও বলুন, আপনাদের যা বলার আছে মন খুলেই বলুন।'

মুহূর্তের জন্যে সব চুপ। তারপর এক যুবক বলে উঠলো, 'বিসেসরকে মারা হয়েছে —খুন করা হয়েছে ওকে।'

'আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি?' দা-সাহেব প্রশ্ন করলেন, যুবকটি

কোনো উত্তর দিলো না। দা-সাহেব একটু হাসলেন এবং বললেন, 'নেই, তাই তো? কিন্তু আমি এ কথা পরিষ্কারভাবে বলছি যদি ও খুন হয়ে থাকে, তাহলে তা প্রকাশিত হবেই। সত্য কখনও চাপা থাকে না। আর এ ব্যাপারে আমারও কড়া নজর রয়েছে। আমি ডি. আই. জি.-কে বলেছি তিনি যেন কোনো বড় অফিসারকে দিয়ে নতুন করে আপনাদের এজাহার নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি কাউকে পাঠাবেন। আপনারা মন খুলে কথা বলুন ···পুলিশকে প্রমাণ সংগ্রহের কাজে সাহায্য করুন।'

কিছুক্ষণ আগে এসেছে একটি যুবক। সে দাঁড়িয়ে ছিলো সভার একপাশে, একটু তফাতে। হঠাৎ সে সামনে এসে দা-সাহেবকে সম্বোধন করে বলে উঠলো, 'দা-সাহেব, কেন এসব নাটক করছেন? হরিজনদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো, আপনার সরকার এবং পুলিশ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তামাশা দেখলো, তারপর একমাস ধরে নিজেরাই তামাশা করে চলেছে। আজ পর্যন্ত তার কিছু হয়েছে?'

মঞ্চের ওপর যারা বসেছিলেন তাদের গলা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, 'বিন্দা এসেছে ...বিন্দা এসেছে...', 'দূর করে দাও হারামজাদাকে' ইত্যাদি পাঁচ-মেশালি আওয়াজে চারপাশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। কালো পতাকাধারীরাও দু-চারটে স্লোগান বাতাসে ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু দা-সাহেবের জোরালো গলার আওয়াজে সব গোলমাল চাপা পড়ে গেলো।

'ভাই, তুমি ঠিকই বলেছো। রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন ক্রোধ জমে ওঠে তখনই সে অন্যায় দূর হয়। কিন্তু শুধু রাগ হলে তো চলবে না ···সাহসও চাই। সারা গ্রামে সনাক্ত করার মতো, সাক্ষী দেওয়ার মতো একটা মানুষও জুটলো না!'

'সাক্ষী কে দেবে ...সনাক্ত করতে গিয়ে মরবে কে? দিন-চারেক এখানে থাকুন ...আতঙ্ক কাকে বলে তা টের পেয়ে যাবেন!'

মাঝপথে থামিয়ে দিলেন দা-সাহেব, তারপর প্রসঙ্গের খেই টেনে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, কেবল গ্রামেই নয়, পুরো দেশটারই এই অবস্থা হয়েছিলো। আতঙ্ক সারা দেশের মানুষের গলা টিপে ধরেছিলো ...টুঁ শব্দের অধিকার কারো ছিলো না। তাই শুরু থেকেই আমরা চেষ্টা করেছি যাতে মানুষ আতঙ্ক-মুক্ত হয়। নির্ভীক হয় ...মন খুলে অন্তরের কথা বলে। কিন্তু এখনো মানুষের মনে আতঙ্ক বাসা বেঁধে আছে। সত্য কথা বলার সাহস এখনো পাচ্ছে না।'

একটু থামলেন দা-সাহেব।

'আর বিনা প্রমাণে পুলিশই-বা কি করতে পারে?'

'চুলোয় যাক্ প্রমাণ। আগুন কে লাগিয়েছিলো সে কথা সবাই জানে। আপনি জানেন না? তাহলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন? যদি কোনো গরীব মানুষ এ ব্যাপারে জড়াতো তাহলে সে বেচারাকে এতক্ষণে পিষে ফেলা হতো।'

বিন্দার উত্তেজিত কথায় ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো মঞ্চে এবং সভায়। কিন্তু দা-সাহেব অত্যন্ত সংযম এবং ধৈর্যের সঙ্গে সে পরিস্থিতি সামলে নিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার সামান্য ছোঁয়াও পাওয়া গেলো না, বোঝাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'না ভাই না। এটা গরীব বা আমীরের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা আইনের। আর আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার জন্যে প্ররোচিত করো না। আইন যখন হাতের মুঠোয় এসে যায় তখন মানুষ মুকুটহীন সম্রাটে পরিণত হয়। আপনারা তো সকলেই সেই স্বেচ্ছাচারিতার বিষময় ফল ভোগ করেছেন। মন্নিমতো লোকদের ধরে-ধরে জেলে পোরা হয়েছিলো —কোনো মোকদ্দমা নেই ...কোনো শুনানি নেই ...কোনো আদেশ নেই ...কোনো সাজা নেই। আইন হাতের মুঠোর মধ্যে, পুলিশ হুকুমের তাঁবেদার। যাকে খুশি ভিটে-ছাড়া কর, যাকে খুশি আছড়ে মারো।'

'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। আমি আপনার কাছ থেকে বিসুর মৃত্যুর জবাব চাই, প্রতিটি অন্যায়ের জবাব আপনাকে দিতে হবে। বিন্দা ভয় পায় না ...সে চুপ করেও থাকবে না। যে টাকা আপনি এখানে বিলোতে এসেছেন সে টাকায় সে নিজেকে বিকিয়েও দেবে না।'

সাদা পোষাক-পরা পুলিশ আর দু-তিন জন লেঠেল বিন্দার পাশে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তাকে ধরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করার আগেই দা-সাহেব বাধা দিলেন, বললেন, 'আপনাকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এই মনোভাবকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি। আপনাদের আমি বিভ্রান্ত করছি না। বেশিদূর যেতে হবে কেন? যে বিসেসরকে ঘিরে আপনার মনে এত ক্রোধ, তাকেও কি সেইভাবে জেলে যেতে হয়নি? এক-আধ দিনের জন্যে নয়, চার-চারটে বছর কাটাতে হয়নি তাকে জেলে? শুধু জেলেই নয়, অমানুষিক নিপীড়নও জুটেছিলো তার কপালে। এ সব কথা তো আমার চেয়ে আপনারাই ভালো জানেন।'

নিঝুম সভাস্থল। বিন্দা দা-সাহেবের মুখ দেখছিলো একদৃষ্টিতে আর সভার শ্রোতারা চেয়েছিলো বিন্দার মুখের দিকে। সেই শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার আগেই দা-সাহেব আবার শুরু করলেন, 'সুকুলবাবু এখানে এসেছিলেন তাঁর সহানুভূতি জানাতে এবং বিসুর মৃত্যুর কৈফিয়ৎ দাবি করতে। তা আপনারা তাঁকে প্রশ্ন করলেন না কেন যে তাঁর রাজত্বকালে বিনা কারণে, বিনা মামলায় কেন বিসেসরকে জেলে যেতে হয়েছিলো? এ প্রশ্ন তাঁকে করা উচিত ছিলো। বিসেসর তো অত্যন্ত ভদ্র এবং সৎ ছিলো।'

সভার নিঝুম ভাব ক্রমশ নিস্তব্ধতায় পরিণত হতে লাগলো। 'এ প্রশ্ন কেবল বিসেসরের নয়, বিসসরের মতো হাজার-হাজার ভদ্র এবং সৎ লোককে জেলে পোরা হয়েছিলো। আমরা যখন তাদের মুক্তি দিলাম তখন সে প্রায় শেষ হয়ে গেছে

নিঃশেষিত জীবনীশক্তি, সামান্যতম আঘাত সহ্য করার শক্তিও আর সে দেহে অবশিষ্ট নেই। তার আত্মহত্যা করার পেছনে এও একটা কারণ।'

ক্ষণেক থামলেন দা-সাহেব। সভার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এতক্ষণের পরিশ্রম এবং আত্মপ্রসাদ এই দু'টি ভাব একই সঙ্গে ফুটে উঠলো তাঁর মুখমণ্ডলে। তিনি এবার হালকাভাবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।

'সুকুলবাবু বুদ্ধিমান লোক ...আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এই মনোভাব আমাদের মধ্যেই বিষ ছড়াবে। আমি তাঁর এই মনোভাবকে ঠিক বলে মনে করি না। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে মানুষ কখনো-কখনো এমন বিবেকহীন কথাবার্তা বলার জন্যেও উস্কানি দেয়।'

থামলেন দা-সাহেব।

'আর এবার তো সবাই লক্ষ্য করেছে যে ঐক্যবদ্ধ জনতার প্রচণ্ড শক্তি। যেন ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি সুপ্ত রয়েছে। যখন ঝড় ওঠে, সমূলে উপড়ে যায় বড়-বড় গাছ। মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, উল্টে যায় বড়-বড় রাজত্ব। ছিন্নমূল লোকরা এ কথাটা বেশ ভালোভাবেই জানে। গদিতে যদি বসতে চাও তবে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কর ...গদি যদি বাঁচাতে চাও তাহলে মানুষের মাঝে ফারাক সৃষ্টি কর। জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তি গদির পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ। আমি কি বলতে চাই, আপনারা বুঝতে পারছেন তো? আপনারা নিজেরাই ...।'

হঠাৎ দা-সাহেবকে বাধা দিয়ে বিন্দা চিৎকার করে উঠলো, 'তিরিশ বছর ধরে শুধু আপনাদের কথাই শুনে আসছি। তার ফলটা কি হলো? পেটে দু'মুঠো ভাত জোটে না, শুধু আপনাদের কথা ...কথা ...আর কথা! যেমন সুকুলবাবু, ঠিক তেমনই আপনি।' বলেই সে একপাশে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিয়ে সভার নিস্তব্ধতা ভেঙে দ্রুতগতিতে চলে গেলো।

চারদিকে শুরু হয়ে গেলো হৈচৈ। সুযোগ বুঝে কালো পতাকাধারীরা শুরু করলো স্লোগান দিতে। পাণ্ডেজী মাইকটা সামলে জনতাকে শান্ত হতে অনুরোধ করতে লাগলেন।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে, দা-সাহেব আবার মাইক হাতে নিলেন, 'এই যুবকটি অত্যন্ত রাগী এবং সাহসী। এর দৃঢ়তা দেখে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি, যে গ্রামে যুবকদের মধ্যে এই গুণ রয়েছে ...সে গ্রামে কোনো জুলুম, কোনোরকম অন্যায় চলতে পারে না। গরীব মানুষদের প্রতি কি গভীর মমত্ববোধ। আমার এই পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে এইরকম নির্ভীক যুবকই দরকার। আমি চাই আপনারা নিজেরাই কুটির শিল্প পরিকল্পনার কাজ সামলান। বাপুর স্বপ্ন ছিলো আমাদের দেশের সব গ্রাম এবং সমস্ত গ্রামবাসী আর্থিক দিক

থেকে স্বাধীন, স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। সেই স্বপ্নকে রূপায়িত করার পথে এ হলো আমার প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু আপনাদের সাহায্য ছাড়া তো এ কাজ সম্পূর্ণ হবে না। আমি যে কাজের সূচনা করলাম, আপনারা তাকে সম্পূর্ণ করুন।'

তারপর হীরার দিকে তাকিয়ে দা-সাহেব বললেন, 'এই পরিকল্পনা উদ্বোধন করার জন্যে বিসেসরের বাবার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে হতে পারে?'

পাণ্ডেজী আবার হোঁচট খেলেন। উদ্বোধন করার কথা তো ছিল দা-সাহেবের। কিন্তু দা-সাহেবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে তিনি আবার মুগ্ধ হলেন। দা-সাহেব কথা শেষ করে বললেন, 'বিসেসর গরীবদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলো। হীরা উদ্বোধন করলেই বিসেসরের আত্মা শান্তি পাবে।'

'শান্তি তো তখনই পাবে যখন আপনি আসল খুনীকে গ্রেপ্তার করবেন ...অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দেবেন।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা রাগত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, কিন্তু বক্তাকে দেখা গেলো না। কিন্তু যে দিক থেকে আওয়াজটা ভেসে এলো সে দিকে মুখ ফিরিয়ে অদৃশ্য বক্তাকে সম্বোধন করে দা-সাহেব বললেন,'আমি তো আগেই বলেছি আপনারা সকলে মিলে সাহায্য করুন যাতে অপরাধী ধরা পড়ে। আমি ফিরে গিয়েই কোনো একজন বড় অফিসারকে পাঠাব এজাহার নেওয়ার জন্যে। এবার কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া করবেন না ...যদি করেন তাহলে দোষী আমি হব না, দোষী হবেন আপনারা।'

এই প্রথম দা-সাহেবের কণ্ঠে হালকা ক্রোধের আভাস ফুটে উঠলো। পাণ্ডেজী তড়িঘড়ি মাইকটা টেনে নিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

সভা শেষ হলো। কালো পতাকাধারীরা স্লোগান দিতে শুরু করলো, 'মিথ্যা আশ্বাস চাই না ...চাই না', 'বিসুর মৃত্যুর জবাব চাই'। কিন্তু চারপাশের কোলাহলে চাপা পড়ে গেলো স্লোগান। পাণ্ডেজী, দা-সাহেব এবং হীরা একটা ট্র্যাক্টরের ওপর বসে, অনেকটা মিছিল করে 'কুটির শিল্প পরিকল্পনা দপ্তর' পর্যন্ত গেলেন। মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা চেক হীরার মাধ্যমে অস্থায়ী দপ্তরের এক অস্থায়ী অফিসারের হাতে তুলে দেওয়া হলো। নিজের ছোট্ট ভাষণে পাণ্ডেজী স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, বিধানসভায় এ বাবদে যখন অর্থ বরাদ্দ হবে, তখন হবে। আপাতত দা-সাহেব তাঁর তহবিল থেকে এই কাজের শুভারম্ভ করলেন।

হাততালি বাজলো ...হর্ষধ্বনি হলো এবং 'দা-সাহেব জিন্দাবাদ' জয়ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলো।

ঘরে-ঘরে বিন্দুর মৃত্যু-আলোচনায় যে প্রসঙ্গ সুকুলবাবু সূত্রপাত করেছিলেন তা চার-পাঁচটি বাড়িতে সীমিত রইলো, বাকি বাড়িগুলোতে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাপ্য টাকা কিভাবে বিতরণ করা হবে তার হিসেব-নিকেশ শুরু হলো।

তৃতীয় দিন প্রকাশিত হলো "মশাল" পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা। তার প্রথম পাতায় বড়-বড় অক্ষরে ছাপা হলো—'ক্ষেতমজুর এবং হরিজনদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে দা-সাহেবের সরকার কর্তৃক সুদৃঢ় এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ'। দা-সাহেবের ভাষণের বিশদ বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনার সমস্ত বিষয়ের প্রতি গভীর আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়াও এই পরিকল্পনাকে অপরাপর প্রদেশের অনুকরণযোগ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। একটা বড় ছবি ছাপা হয়েছে—হীরা অফিসারের হাতে চেক তুলে দিচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দা-সাহেব; তাঁর মুখে বাপুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলার আন্তরিক উল্লাস এবং তৃপ্তি ফু:ট উঠেছে। পাণ্ডেজী "মশাল"-এর এই সংখ্যাটি প্রত্যেকটি বাড়িতে পৌঁছে দিলেন, অবশ্যই বিনামূল্যে।

গতকাল সকালেই, সুকুলবাবু দা-সাহেবের ভাষণের পুরো রিপোর্ট পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই সারাটা দিন তাঁর বড্ড অস্বস্তির মধ্যে কেটেছে, কিন্তু আজ সকালে "মশাল" পত্রিকার এই সংখ্যাটা হাতে পাবার পর থেকেই তাঁর থলথলে শরীর উত্তেজনায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এই সভায় এমন হৈচৈ বাধবে যে নিজের হাতে বয়ে-আনা সব ক'টি দানের ঘুটি দা-সাহেবকে তাঁর ধুতির খুঁটে বেঁধে নিয়ে ফিরে যেতে হবে। বিহারী-ভাইয়ের সঙ্গে বসে তিনি পুরো পরিকল্পনাটাই ছকে নিয়েছিলেন এবং গত পাঁচ দিন ধরে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলার জন্যে সবরকমের প্রচেষ্টাই চালিয়ে গেছেন। বিহারী-ভাই ভার নিয়ে-ছিলেন যে তিনি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবেন যাতে দা-সাহেব সভাই না করতে পারেন। এক-আধটু মারদাঙ্গা, খুনখারাপির আশঙ্কা অবশ্যই ছিলো ...কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয়, ইদানীং এ-সমস্ত নির্বাচনেরই অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরং এ জাতীয় ঘটনা ঘটলে কাজকর্মও অনেক বেড়ে যায়। মানুষের মধ্যে উৎসাহ এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তখন শুধু প্রয়োজন পরিবেশকে স্বপক্ষে টেনে আনা। এবং এই আশ্বাসই বিহারী-ভাই দিয়েছিলেন। কাশী তো তাঁর মিটিঙের পর ওখানেই থেকে গেছে, সুকুলবাবুর জমি তৈরি করছে। দু'জনেই বেশ তুখোড় লোক। আর বিহারী-ভাই তো এসব কাজে একেবারে সিদ্ধহস্ত! সবচেয়ে বড় কথা হলো এরা দু'জনেই অত্যন্ত বিশ্বস্ত, চোখ বুজে এদের ওপর বিশ্বাস করা যায়! সুকুলবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তো এদের পোয়াবারো ছিলো, বিহারী-ভাই

তো দু'হাতে লুটেছে ...কিন্তু নুন খেয়ে নেমকহারামি করেনি, বরং বলা যায় আজ তাঁর অসময়ে এরা সেই ঋণ শোধ করছে।

মিটিঙ শেষ করে ফেরবার পথে সুকুলবাবু যখন বিসুর বাড়ি গিয়ে শুনলেন বিন্দা নামে কে-একজনের সঙ্গে বিসুর বাপ-মা শহরে গেছে, তখনই তাঁর টনক নড়েছিলো। শেষে দা-সাহেব ওদের ডেকে পাঠাননি তো? ...উল্টো-পাল্টা বুঝিয়ে ...কিছু নগদ নারায়ণ হাতে গুঁজে দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করেননি তো? এই হাড়-হাভাতেগুলোকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। ট্যাঁকে কিছু ঢুকলেই এদের শোক-দুঃখ অর্ধেক উবে যায়। তার ওপর মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যদি ডেকে পাঠান তো আহ্লাদে পথের ধুলোয় গড়াগড়ি দেবে। মনে করবে, জনমই সার্থক হয়ে গেলো। আর দা-সাহেব যদি ডেকে পাঠান তাহলে তিনি শুধু নগদ-বিদায় দিয়েই ক্ষান্ত হবেন না ...মুখেও নিশ্চয়ই কিছু ঢেলে দিয়েছেন। এখন তো চারদিকে ঐ গাওনাই গেয়ে বেড়াবে হতভাগাগুলো। বিসুর মৃত্যু অনুকূল একটা পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে খুবই সহায়ক, কিন্তু তা নির্ভর করছে কে কতখানি বুদ্ধি খরচ করে নিজের কোলে ঝোল টানতে পারে তার ওপর। শেষে অবস্থা এমন না হয় যে তাঁর থালায় বেড়ে-দেওয়া অন্ন দা-সাহেব উদরস্থ করে ফেলেন! সুকুলবাবু বিহারী-ভাইকে তাঁর মনের এই গোপন দুঃখের কথা খুলে বলতেই সে পরদিন দুপুর নাগাদ সব খবর যোগাড় করে নিয়ে ফিরে এলো।

বিন্দা বিসুর প্রাণের বন্ধু ...যেমন তার প্রচণ্ড রাগ তেমনি তার দুঃসাহস। কাউকে সে ডরায় না। তার স্ত্রী রুকমাও অত্যন্ত বদমেজাজি এবং স্পষ্টবক্তা। বিয়ের আগে সে ছিলো বিসুর স্কুলের ছাত্রী এবং বিসুকে খুব শ্রদ্ধা করতো। বিসুর মৃত্যুর পর থেকেই ওরা দু'জনে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন ওরা আইনের শলা-পরামর্শ নিতে উকিলের কাছে গিয়েছিলো। দা-সাহেবের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেবার লোক বিন্দা নয়। ও তো সবাইকে প্রকাশ্যেই গালাগাল করছে! কথাগুলো শুনে সুকুলবাবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন এবং এ কথা ভেবে আরও আশ্বস্ত হলেন যে বিন্দা একাই দা-সাহেবকে ঘোল খাইয়ে ছাড়বে। বরং এটাই সবথেকে ভালো হবে, কারণ গাঁয়ের কেউ যদি গালাগাল করে তবে পুরো ব্যাপারটার গুরুত্বই অন্য রকম দাঁড়াবে। ঐ শালা সেদিন শহরে টো-টো করে ঘুরে বেড়ালো ...মিটিঙের মাঝে যদি বা এলো তা দু-চারটে বুকনি ঝেড়েই সটকে পড়লো। অথচ যদি চাইতো তাহলে ও একাই সেদিন মিটিঙের শুষ্টি তুষ্টি করে দিতে পারতো। কিন্তু এই গেঁয়োদের নিয়ে এটাই মুশকিল। হতভাগারা শুধু উত্তেজনার মাথাতেই কাজ করে বসে। আর সেদিন তো বিসুর বাপ-মাকে বগলে পুরে শহরেই চলে গেলো। তাঁর তো বিসুর বাড়ি যাওয়াই কালতু হয়ে গেলো সেদিন। আর দা-সাহেব পরমানন্দে হীরাকে নিজের গাড়িতে বসিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন এবং ওঁকে দিয়েই পরিকল্পনার

উদ্বোধন করালেন আর আজ কাগজে সে ছবিও বেরিয়ে গেলো। গাঁয়ের লোকগুলোর মনে একেবারে পাকাপাকি সিলমোহর পড়ে গেলো। হত্যাকারীকে সামলে রাখো আর নিহতের প্রতি সহানুভূতি জানাও—আহা, দুই হাতেই দুই লাড্ডু!

মনে হচ্ছে বিহারী-ভাই কাল ফেরেনি, নইলে নিশ্চয়ই আসতো একবার। আসল খবর ওর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। শালা রেডিওতেও কাল থেকে দা-সাহেবের ঐ বক্তৃতাই প্রচার করে চলেছে যেন পৃথিবীতে আর অন্য খবর নেই! প্রচার মাধ্যম তো পুরো তাঁরই মোসাহেবি করে চলেছে। মনে হচ্ছে "মশাল" পত্রিকার দত্তবাবুকেও বেশ কড়া দাওয়াই দেওয়া হয়েছে, এখন তো ওরাও দা-সাহেবের গুণকীর্তন করবে।

সুকুলজী একরাশ মমতা নিয়ে আঙুলের নীলাটার ওপর চোখ বোলালেন। কি জানি, সুকুলের কপাল এতে ফিরবে কি-না? মনে তো হচ্ছিলো বিসুটা মরে গিয়ে হরিজনদের হারিয়ে-যাওয়া ভোটগুলো ওঁরই ঝুলিতে লাফিয়ে পড়ছিলো। কিন্তু গতকাল থেকে মনে হচ্ছে সেসব দা-সাহেবই কেড়ে-কুড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিহারী-ভাইয়ের দর্শন মিললো। গত দু'দিন ধরে ছোটাছুটির ধকলের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার সর্বদেহে। নির্বিঘ্নে দা-সাহেবের সভা সম্পন্ন হওয়ার ক্ষোভও প্রকাশিত হচ্ছে তার চোখে-মুখে। অথচ গত পরশু দিন এখানেই সে বড় মুখ করে ঘোষণা করেছিলো, যে কোনো অবস্থাতেই সে দা-সাহেবের সভা অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। কিন্তু তার খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেলো!

'কি খবর হে?' সুকুলবাবু সোফায় একটু সরে বসে বিহারী-ভাইয়ের জন্যে জায়গা করে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাশী ফেরেনি?'

'ঐ মোড়ের মাথায় পান কিনছে। এখুনি আসবে।'

সুকুলবাবু ভাবছিলেন যে বিহারী-ভাই নিজেই কথা বলতে শুরু করবে কিন্তু সে গুম মেরে বসে রইলো। সুকুলবাবু জানেন বিহারী রেগে গেলে এই রকমই গুম মেরে যায়। তাই তিনি নিজেই প্রশ্ন করলেন, 'শুনলাম দা-সাহেবের মিটিও বেশ জমিয়েই হয়েছে। তোমরা কি করছিলে?'

'ঘোড়ার ঘাস কাটছিলাম আর ধুলো খাচ্ছিলাম। গাঁয়ে ধুলো ছাড়া আছেই বা কি?' বিহারী-ভাইয়ের মনে দু'দিন ধরে যে প্রচণ্ড ক্রোধ জমা হয়েছিলো, সুকুলবাবুর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ফেটে বেরুতে লাগলো।

'গাঁয়ের লোকেরা কোনো ঝামেলা পাকায়নি? তখন তো মনে হচ্ছিলো ওরা প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট?'

'গণ্ডগোল না ছাই! এই শালা গাঁইয়ারা এক আজব চীজ। পরশু সকাল থেকে কত বোঝালাম, পাখি-পড়া করে সব শিখিয়ে দিলাম; কিন্তু দা-সাহেব হীরার বাড়ি গিয়ে যেই ওকে মোটরে নিজের পাশে বসালেন অমনি ওদের যেন জনম সার্থক হয়ে গেলো! মিছিল করে গাড়ির পেছন-পেছন এমনভাবে যেতে লাগলো যেন স্বয়ং রামচন্দ্র সদলবলে চলেছেন!'

'নিজেদের লোকজনদের দিয়ে অন্তত কিছু স্লোগান তো দেওয়াতে পারতে··· তাতেও তো খানিকটা কাজ হাসিল হতো।'

'সেসব কিছু করা সম্ভব ছিলো না। গত পাঁচ দিন ধরে কাশী একটা কথাই সকলকে বুঝিয়েছে যে কেউ যেন গণ্ডগোল না করে ···দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধায়। কেবল কালো পতাকা নিয়ে মৌন প্রতিবাদ জানাবে···একেবারে অহিংস পদ্ধতিতে।' বিহারী-ভাই কাশীর গলা হুবহু নকল করে কথাগুলো বলেই রাগে ফেটে পড়লো। 'গান্ধীজীর পর বেচারী অহিংসা মাথা লুকোবার জায়গা শেষে কাশীর ধুতির তলাতেই পেয়েছে কিনা! যত্তোসব ···।' রাগে সে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো।

সুকুলবাবু কোনো রা কাড়লেন না। রাগের আসল কারণটা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হলো না, নিশ্চয়ই বিহারী আর কাশীর মধ্যে একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে।

'তাছাড়া কে জানতো যে দা-সাহেব গাড়ি থেকে নেমেই সোজা হীরার বাড়ি যাবেন! বাড়ি তো নয় যেন শালা দেবমন্দির, সেখানে মাথা না ঠেকালে কোনো কাজই শুরু করা যায় না। কোনোরকমে কিছু লোকজন যোগাড় করে আমি মঞ্চের সামনে বেশ জমিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলাম ···ওরাই তো যা দু-চার কথা বললো-টললো।'

ঠিক সেই সময়ে কাশী ঘরে ঢুকলো, মুখে পান আর এক হাতে ধরা রয়েছে ধুতির কোঁচা। তার সারা শরীর ঘামে জবজব করছে। পানের পিক যাতে না পড়ে তার জন্যে মুখ কিছুটা ওপরের দিকে তুলে ধরে সে বললো, 'খবর সব পেয়েছেন তো? বিহারী-ভাই বড্ড গজগজ করছে, একটু শান্ত করুন তো ওকে।' পানের পিক ফেলতে কাশী ভেতরে গেলো, ফিরলো কিছুক্ষণ পর রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে। বোধহয় জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এলো, তাই বেশ ঝরঝরে দেখাচ্ছিলো ওকে। সামনে একটা চেয়ারে বসতে-বসতে বললো, 'হরিজনদের মধ্যে আমরা বিপ্লব করতে গিয়েছিলাম কিন্তু "মশাল"-এর লোকজন তো বলছে সে কাজ দা-সাহেবই সম্পন্ন করে দিলেন। এখন আমাদের জন্যে তাহলে অন্য কোনো একটা উপায় ভাবুন।' উত্তেজনা কিংবা রাগ, কাশীর কণ্ঠে অথবা চেহারায় তার কোনোটাই নেই, বেশ সহজ-সরলভাবেই সে কথা বলছিলো। আর কাশীকে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে বিহারী-ভাইয়ের অন্তর জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিলো। এই নির্বাচনে কাশীর চেয়ে বিহারী-ভাইয়ের স্বার্থ অনেক বেশি জড়িত। শুরু থেকেই কাশী সুকুলবাবুর সঙ্গে ছিলো এবং আজও আছে···

ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রতিদানে সে কিছু আশা কোনোদিন করেনি, এখনো করে না। বহা কাজিল আর ভীষণ আমুদে লোক এই কালী। সুকুলবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন দু'হাতে মজা লোটার সুযোগ তার ছিলো, সে ছিলো দশ জনের এক জন, মাতব্বরিই ছিলো তার কাজ। বাস্, তাতেই সে খুশি। কিন্তু বিহারী-ভাইয়ের নানারকম পরিকল্পনা জড়িয়ে আছে সুকুলবাবুর ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে। বরং বলা উচিত তার পুরো পরিবারের স্বার্থই জড়িয়ে রয়েছে সুকুলবাবুর সঙ্গে! আর তাই এই নির্বাচন সুকুলবাবুর কাছে যতখানি মূল্যবান বিহারী-ভাইয়ের কাছে তার মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু কালী সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা তামাশা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বিহারী কি করবে? সরোহার ওপর প্রভাব তো কালীরই রয়েছে।

'সুকুলবাবু, খাওয়ার তো এখনো দেরি আছে ...এখন একটু চা-টা খাওয়ান। আর বিহারী-ভাইয়ের জন্যে বরং ঠাণ্ডা কিছু আনালেই চলবে।'

'নিশ্চয়ই ...নিশ্চয়ই।' সুকুলবাবু যেন নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন। তিনি পাশের সুইচটা টিপতেই চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

'দেখেছ, কিষণ ঠিক জানে কালী যখন এসেছে তখন চা তার চাই-ই। সুকুলবাবু ভুলে যেতে পারেন কিন্তু কিষণ ভোলে না।'

মুচকি হাসতে-হাসতে কিষণ কাপে চা ঢালতে লাগলো এবং তারপর কাপগুলো হাতে-হাতে তুলে দিলো।

চেয়ারের ওপর পা দু'টো তুলে দিয়ে কালী জুত করে বসলো। তারপর চায়ে চিনি মেশাতে-মেশাতে বললো, 'দেখো বিহারী-ভাই, এখন গাঁয়ের মানুষগুলোকে গালিগালাজ করে আর লাভ নেই। ওরা যা রয়েছে, তাই থাকবে।' চায়ে চুমুক মারলো কালী, তারপর বললো, 'তুমি তো ওদের জন্যে জীবনে কোনোদিন কুটোটাও নাড়োনি, কিন্তু বিসু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এই মানুষগুলোর জন্যে জীবনটা উৎসর্গ করেছিলো। কিন্তু পাঁচ বছর আগে ওকে যখন গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হলো তখনো সবাই মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলো। তখন তো জরুরী অবস্থা ছিলো না, তবুও কেউ টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেনি!' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কালী আবার বলতে শুরু করলো, 'সেই আগুন লাগার ঘটনার পর হরিজন-পাড়ার লোকজনরা সপ্তাহখানেক বিসুকে এড়িয়ে চলতে থাকে, এমন কি ওদের ওখানে যাতায়াত করতেও বিসুকে ওরা নিষেধ করেছিলো। ওরা ভীত হয়ে পড়েছিলো। বলা যায় না, বিসুর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে হয়ত ওদেরই জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলবে কোনোদিন। এসবই আমি জানি, সবই আমার নিজের চোখে দেখা!'

'তাহলে কেনই-বা আপনি সারাদিন ভাষণ দিয়ে বেড়ান —বিপ্লব গ্রাম থেকেই শুরু হবে...গ্রাম থেকেই বিপ্লবের সূচনা হবে...গরীব মানুষের মধ্যে থেকেই হবে?'

'ঠিকই তো। অনুকূল পরিস্থিতি যখন গড়ে উঠবে…'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ', বলেই তেড়েফুঁড়ে ঘাড় নেড়ে বিহারী-ভাই কাশীর বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিতে চাইলো।

'তোমার ঐ হুঁ হুঁ-তে কিছু যায় আসে না বুঝলে? বিপ্লব যখন আসবে তখন গ্রামের ঐ গরীব মানুষদের কাছ থেকেই আসবে। তোমার-আমার দ্বারা বিপ্লব কখনই হবে না আর ঐ ভাড়াটে লুচ্চাগুলোকে দিয়ে তো নয়-ই।' কাশী যেন চরম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো।

'আরে রাখো! এই লোকগুলো আজ যদি এক পয়সার লাভের মুখ দেখে তো সারা ভবিষ্যৎ জীবনটাই বন্ধক দিয়ে দেবে। এরা করবে বিপ্লব!'

বিহারী-ভাইয়ের রাগ বা উত্তেজনা কোনোটাই এক তিল কমলো না।

'সে তো ঠিকই।' কাপে দ্বিতীয়বার চা ঢালতে-ঢালতে কাশী জবাব দিলো, 'ওরা তো তোমার মতো শাস্ত্র পড়েনি আর ব্যাগ-ভর্তি টাকাও নেই ওদের। যাদের একটা পয়সার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, তারা পয়সার মুখ দেখলে তো ঝাঁপিয়ে পড়বেই।'

'তবে তো ঠিকই আছে। জোরাওরের ভোটগুলোতো দা-সাহেবের হাতের মুঠোতেই রয়েছে, এখন যদি হরিজনদের ভোটগুলোও তাঁর পকেটে যায় তাহলে এখানে বসে-বসে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? নিজের-নিজের বাড়ি গিয়ে আরাম করে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে একটু ঘুম দেওয়া যাক্…চার বছর পরে চোখ খুললেই হবে।' কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েই বিহারী-ভাই আলোচনার সমাপ্তি টেনে দিলো, তারপর সারা শরীরটাকে হেলিয়ে দিলো সোফার ওপর।

মুকুন্দবাবু এতক্ষণ চুপচাপ বসে-বসে ওদের বাক্‌যুদ্ধ শুনছিলেন, এবার রাগে ফেটে পড়লেন, 'ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে অহেতুক কেন সময় নষ্ট করছ তোমরা? মিছিলের প্রস্তুতি কেমন চলছে তাই বলো? যদি প্রয়োজন হয় আরো দিন-চারেক সময় নাও। কিন্তু মনে রেখো, মিছিল এমন করতে হবে যাতে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায়। ঐ মিছিলে যেন সমস্ত হরিজন আর ক্ষেতমজুররা উপস্থিত থাকে। সঙ্গে থাকবে ওদের বৌ-ছেলেমেয়ে। এই মিছিল আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে।'

'কাশীকে বলুন…ব্যবস্থা তিনিই করবেন।' এমন অভিমানী শিশুর মতো বিহারী-ভাই জবাব দিলো যে কাশী শব্দ করে হেসে উঠলো এবং হাসতে-হাসতেই বললো, 'বিহারী-ভাই দেখছি আমার ওপর দারুণ চটে গেছে!' তারপর একটু থেমে বললো, 'দেখুন মুকুন্দবাবু, আমাদের রাজনীতিতে ন্যায়-অন্যায়ের বালাই কোনোদিনই ছিলো না…ইদানীং আমাদের রাজনীতিতে ভদ্রতাবোধটুকুও উবে গেছে। কিন্তু রাজনীতির নাম করে মারদাঙ্গা বা গণ্ডগোল বাধানো আমার

যাবা সম্ভব নয়, এ কথা আমি স্পষ্টই জানিয়ে রাখছি!' দু'হাত ঝাঁকিয়ে কাশী তার মনের কথা জানিয়ে দিলো। 'গত নির্বাচনেও তো বিহারী-ভাই এই একই জিনিস করেছে ...লাভ কি হয়েছে? পরাজয় আর অপবাদ! এর পরেও?'

'আপনিও তো সারা সপ্তাহ ওখানে জমে গিয়েছিলেন। তা কেমন ভদ্র রাজনীতি আপনি করে এলেন সেই কথাটাই এখন সুকুলবাবুকে বলুন! আপনি কি দা-সাহেবের মিটিঙের বন্দোবস্ত করছিলেন?'

কাশীর দুঃখ হলো না বরং বিহারী-ভাইয়ের ব্যঙ্গভরা কথা শুনে সে খুব মজা পেলো! একটু হেসে বললো, 'আরে, দা-সাহেবের মিটিঙে তো শ্রোতার সংখ্যাই কম, সংগঠকের সংখ্যাই তো বেশি ...আমি আর নতুন করে কি বন্দোবস্ত করব! কিন্তু ওখানে বসে যখন ছিলাম তখন কিছু তো নিশ্চয়ই করেছি এবং বেশ পাকা কাজই করে এসেছি!'

সুকুলবাবুর চোখে-মুখে অসম্ভব কৌতূহল ফুটে উঠলো, বিহারী-ভাই চেষ্টা করেও নির্বিকার থাকতে পারলো না। দু'জনের কেউই কোনো প্রশ্ন করলেন না, কেবল তাঁদের উৎসুক চোখের চাউনি কাশীর মুখের ওপর নিবদ্ধ হলো।

'দেখুন, জোরাভরের ভোটগুলোই দা-সাহেবের হাতের তুরুপের তাস। শতকরা পঁয়ত্রিশটা নিশ্চিত ভোট। এই ভোটের একটাও টস্‌কাবে না।'

'ঠিকই বলেছেন, একদম ঠিক। এই কারণেই তো গীতাভক্ত, বাপুর ব্যাটা দা-সাহেব আজ মস্তানকে শূলে চড়িয়ে দিয়েছে! কিন্তু ওকে দিয়ে কি আপনি কোনো কাজ করাতে পারবেন? আপনার ভদ্র রাজনীতি অথবা মূক প্রতিবাদের সাহায্যে বাকি শতকরা পঁয়ষট্টিটা ভোট কব্জা করতে পারবেন কি?' বিহারী ভাইয়ের গলায় আবার সেই ক্রোধ এবং বিক্ষোভের সুর শোনা গেলো।

'না। তা থেকেও দা-সাহেব শতকরা বিশ-পঁচিশটা ভোট এইসব যোজনা টোজনায় ধোকা দিয়ে নিজের পকেটে পুরবেন, কিন্তু এর থেকে বেশি ভোট এদের কাছ থেকে পাবেন না। আমার হিসাব নির্ভুল। তাও যদি খুব উঠে-পড়ে লাগেন তবেই এই ভোট তিনি পেতে পারেন, নইলে নয়। সে ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি।' আনন্দে গদগদ কাশী ডিবে থেকে দু'টো পান বার করে মুখে পুরলো, আঙুলে কিছুটা চুন লাগিয়ে তা চালান করে দিলো জিভে।

পঁয়ত্রিশ যুক্ত পঁচিশের সহজ সরল যোগের পর, হিসাব করার আর কি থাকতে পারে; বিহারী-ভাই তাই শরীরটাকে সোফায় এলিয়ে দিলো। কিন্তু সুকুলবাবু বুঝলেন কাশী আরো কিছু বলবে এবং বলবে কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে, ওর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে। আবেশের সুরে শুধু বললেন, 'কাশী!'

'জোরাভরকে ভোটে দাঁড়াতে রাজি করে ফেলেছি। শেষ দিনে ও মনোনয়ন পত্র দাখিল করবে।'

একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কাশী পানের পিক ফেলতে ভেতরে চলে গেলো। সুকুলবাবু এবং বিহারী-ভাই দু'জনেই অবাক! কাশীর এ সমস্ত কথাবার্তাকে সত্যসত্যই কি বিশ্বাস করা যায়? দা-সাহেবের ছত্রছায়ায় থেকেই তো জোরাওর যা খুশি তাই করে বেড়ায় আর জোরাওরের কাঁধে ভর দিয়েই তো দা-সাহেব তাঁর পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছেন। তাহলে জোরাওর দা-সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কেন? কাশী ফিরে আসতেই সুকুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি দাঁড়াতে বললে আর অমনি ও রাজি হয়ে গেলো?'

'হ্যাঁ। রাজি হলো। আমি নিজে অবশ্য ওর কাছে যাইনি ...তবে আমি রাজি করিয়েছি ওকে।'

'ও জানে না যে এই দু'টো ঘটনার পর ওর প্রাণ দা-সাহেবের হাতের মুঠোয় পোরা রয়েছে।'

'ওকে এটাই বোঝানো হয়েছে যে এই সমস্ত যদি চলতে থাকে তবে সারাটা জীবনই ওকে দা-সাহেবের গোলামি করে কাটাতে হবে। একদিকে টাকা ঢেলে যেতে হবে আর অন্যদিকে পায়ের তলায় পড়ে-পড়ে মার খেতে হবে। একবার যদি ভোটে জিতে বিধানসভায় ঢুকে যেতে পারিস তখন দেখবি দা-সাহেবই তোর মুঠোতে বন্দী। ব্যস্, টোপটা ও গিলে ফেললো।' একটু থেমে কাশী আবার শুরু করলো, 'একে তো জাতে জাঠ, তার ওপর প্রচুর পয়সার মালিক; মাথা ওর সব সময়ই গরম। গোলামি করা তো দূরের কথা, গোলামি কথাটাও ওর সহ্য হয় না। উপরন্তু দা-সাহেবের এই কুটির শিল্প পরিকল্পনার ওপরও সে বড্ড ক্ষেপে রয়েছে। ওকে বোঝানো হয়েছে যে দা-সাহেব এবার ওর শেকড় কাটতে শুরু করেছেন। মলদা যতটুকু তোলবার তা তোর মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আগেই তুলে নিয়েছেন!'

'হুঁ।' পুরোপুরি বিশ্বাস না হলেও সুকুলবাবু অঙ্ক কষতে শুরু করে দিলেন। মনে-মনে একটা নতুন পরিকল্পনার ছক কাটতে লাগলেন। সব শুনেও বিহারী ভাই নির্বিকার। সে না পারছে বিশ্বাস করতে, না পারছে কোনো পরিকল্পনার ছক কাটতে।

'ব্যস্, এবার ক্ষেতমজুর আর হরিজনদের আমাদের দলে টানার কাজ শুরু করে দাও। পরিকল্পনার টাকা ওরা সরকারের কাছ থেকে নেবে আর ভোট দেবে আমাদের। গত নির্বাচনে ওরা আমাদের সঙ্গে যা করেছিলো এবার দা-সাহেবের সঙ্গে সেটাই করুক! আর তা হয়েও যাবে। এইসব পরিকল্পনা-টরিকল্পনা ঠিকই আছে —কিন্তু সাধারণ মানুষ ভীষণ আশাহত, এই সরকারের প্রতি তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।'

সাধারণ মানুষ আশাহত, এ কথা ভাবতেই সুকুলবাবু অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে উঠলেন। উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'এবার এমন একটা মিছিলের ব্যবস্থা কর যা

এই প্রদেশের ইতিহাসে কখনও হয়নি। দা-সাহেব শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখবেন। এর জন্যে যদি জলের মতো টাকা খরচ করতে হয় তাতেও পরোয়া নেই।'

'সেসব বিহারী-ভাইয়ের কাজ। টাকা দিয়ে লোক জোটাতে ও ভালোই পারে। আপনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এ কাজের তালিম ও ভালোই পেয়েছে! ভাড়াটে লোক দিয়ে মিছিল-মিটিঙ করতে ও দারুণ ওস্তাদ।'

এই প্রথম কাশী বিহারী-ভাইকে একটা খোঁচা মারতেই মুকুলবাবু থমকে উঠলেন। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে এ সময় নিজেদের মধ্যে মনান্তর ঘটুক তা তাঁর পছন্দ নয়। এখন তো মিলেমিশে একজোট হয়ে কাজ করার সময়। বিহারী-ভাইকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললেন, 'হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিহারী-ভাই এমন সমস্ত মিছিল-মিটিঙের ব্যবস্থা করেছে যে আমিই অবাক হয়ে গেছি। আজ সন্ধেবেলায় পার্টির মিটিঙ আছে। সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলো তারপর কাজে লেগে যাও। মিছিলের প্রচার তো চলছেই।'

'বিন্দাকে পটিয়ে যদি দলে ভিড়িয়ে নেওয়া যায় তো কাজ আরো সহজ হয়ে যাবে। আমি শুনেছি ঐ আগুন লাগার যে সমস্ত প্রমাণ বিনু সংগ্রহ করেছিলো তা এখন বিন্দার কাছেই রয়েছে। কিন্তু সে হতভাগা তো কাউকে ধারেকাছেও ঘেঁষতে দিচ্ছে না। এই ধামাচাপা-পড়া মামলাকে আবার খাড়া করে তুলতে ও একাই ছোটাছুটি করছে।'

মুকুলবাবু সব কথাই শুনেছেন, চেষ্টাও করেছেন আপ্রাণ। বিন্দাকে তিনি বহু আশ্বাসও দিয়েছেন —প্রমাণগুলো দিয়ে দাও, সব রকমের সাহায্য পাবে··· টাকা পয়সা এবং অন্য সাহায্যও। বিধানসভায় আসল ঘটনা তুলে ধরে এমন তুল-কালাম কাণ্ড করবেন, যে তার ধাক্কায় দিল্লী পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। কিন্তু বিন্দা তো মুখ খুলতেই চায় না। তাই কাশীর কথা শুনে মুকুলবাবু শুধু বললেন, 'গোমুখ্যু একটা ···নিজের ভালো-মন্দও বোঝে না।'

'ও মূর্খ নয়', হাসলো কাশী, 'তবে এ কথা ঠিক যে কেমন করে নিজের কোলে ঝোল টানতে হয়, ও সত্যিই জানে না।'

এমন সময় চাকর এসে খবর দিলো খাবার তৈরি। প্রথমেই উঠে দাঁড়ালো কাশী, তারপর বিহারী-ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'চলো, এবার গরম-গরম খাবারের সঙ্গে মিছিলের ব্যাপারটা আলোচনা করা যাবে। আমার দ্বারা আর কিছু না হোক অন্তত একটা পোস্টার হাতে নিয়ে অবশ্যই ট্রাকে উঠে বসব এবং সারা রাস্তা স্লোগান দিতে-দিতে যাব।'

বিহারী-ভাইয়ের উদাসীনতা গরম-গরম খাবারের গুণেই হোক বা মিছিলের উৎসাহী আলোচনার জন্যেই হোক কেটে গেলো। মুকুলবাবুর বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দেখা গেলো বিহারী-ভাই তার আসল মেজাজ ফিরে পেয়েছে।'

সপ্তম অধ্যায়

সকাল থেকেই বেশ তোড়জোড় করে থানা ঝাড়পোঁছ চলছে। টিনের চেয়ারগুলো বিদায় করে দেওয়া হয়েছে, সে জায়গায় আনা হয়েছে কাঠের চেয়ার। চেয়ারগুলোর ওপর পাতা হয়েছে মোটা গদি। দু'টো বেঞ্চি পাতা হয়েছে। ঘর সাজাবার নামে দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে দু'টো ক্যালেণ্ডার —একটা হর-পার্বতীর এবং অন্যটা ভারত-মাতার। ভারত-মাতার একপাশে গান্ধীজী বসে-বসে চরকা কাটছেন, অন্য প্রান্তে তেরঙা পতাকা হাতে নিয়ে জওহরলাল। ভারতবর্ষ এক লহমার জন্যেও গান্ধী-নেহেরুকে ভুলতে পারে না! সর্বত্র এঁদের দর্শন পাওয়া যাবে এবং তা যদি নিষ্প্রাণ ছবির মধ্যে দিয়েও হয় তাহলে তাই সই। থানার দারোগা থেকে চৌকিদার সবার গায়েই কড়া মাড়-দেওয়া উর্দি, তাতে পেতলের বোতাম এবং বকলস্ ব্রাসো ঘষে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। সবকিছুই ঝকঝকে তকতকে।

থানা বলতে রয়েছেই-বা কি? একটা বারান্দা আর দু'টো ঘুপচি-ঘুপচি কুঠুরি। পেছনে একটা কাঁচা উঠোন, তার একদিকে রয়েছে সুড়ঙ্গের মতো একটা সরু লম্বাটে ঘর। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে এবং দুর্গন্ধে ভরা। ত্রিশটি গ্রামের শান্তি রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই থানার। এবং এই অঞ্চলের শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে সবসময়ই বিশ-পঁচিশ জন ঝামেলাবাজকে এই সুড়ঙ্গের ভেতর বন্ধ করে রাখা হয়। ওরা ভেতরে বসে গান গায়...খিস্তি-খেউড় করে...জুয়ো খেলতে-খেলতে ঝগড়া হলে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। কিন্তু আজ পরিষ্কার ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কেউ যদি একটা টুঁ শব্দও করে তাহলে তাকে রাতের বেলা চাবুকে সিধে করে দেওয়া হবে।

থানার সামনে যে এক টুকরো জমি পড়ে রয়েছে তাতে বালতি-বালতি জল ছেটানো হচ্ছে যাতে ধুলো না ওড়ে। নয়ত জুন মাসের এই সময়ে সারাদিন বিচ্ছিরি ধুলো উড়ে বেড়ায়। এ অঞ্চলের লোকরা এতে অবশ্য অভ্যস্ত, কিন্তু শহরের বাবুদের অসুবিধা হতে পারে! স্বয়ং দা-সাহেবের নির্দেশেই এস. পি. সাকসেনা আসছেন। বিশেষ তদন্তের কাজ হবে, বোধহয় দু-তিন দিন লাগবে। আবার সবার এজাহার নেওয়া হবে। এখন সারা গ্রামে এই একটাই আলোচনা চলছে। দা-সাহেব বলে গিয়েছিলেন যে এজাহার নেওয়ার জন্যে তিনি বড় কোনো অফিসারকে পাঠাবেন। এবার যেন সবাই প্রাণ খুলে কথা বলে, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সবার কথাই শোনা হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এস. পি. সাহেব কোনো হেঁজিপেঁজি লোক নন, পুলিশ বিভাগের একজন হোমরা-চোমরা অফিসার। বড় অফিসারের নজরও বড় চোখা হয়...সবই ধরে

ফেলবেন! এবার বিন্দুর মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবে! আগের মতো সমস্ত ব্যাপারটা গোলে হরিবোল হয়ে যাবে না। এর আগে এমন বিশেষ তদন্ত হয়েছেই-বা কবে? এবার দা-সাহেব নিজে আদেশ দিয়েছেন, এবং তিনি যে কথা রাখেন তা প্রমাণিত হলো। যা মনে এলো তাই বলে দিলেন, তার পরমুহূর্তেই সব ভুলে মেরে দিলেন, দা-সাহেবের ধাতে তা নেই। তিনি মুখে যা বলবেন, তা হাতে-কলমে করেও দেখিয়ে দেবেন। মানুষের মনে দা-সাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জেগে উঠতে লাগলো। মনে হলো, গরীব মানুষের জন্যে কেই-বা এত চিন্তা করে?

আজ যাদের এজাহার নেওয়া হবে দারোগাবাবু তাদের আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। যোগেসর সাহু, মহেশবাবু, হীরা এবং বিন্দার এজাহার আজ নেওয়া হবে। মহেশবাবু লেখাপড়া-জানা মানুষ …কথা এবং কথার গুরুত্ব দুই-ই বোঝেন। এই এজাহার দেওয়ার ঝামেলায় তিনি মোটেই নিজেকে জড়াতে চাননি কিন্তু বিশু রোজই তাঁর বাসায় যেতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা বলতো; সুতরাং এজাহার তাঁকে দিতেই হবে। দারোগাবাবুর ধারণা মহেশবাবু নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেই আসবেন এবং ঠিক সময়েই আসবেন। বাকি তিন জনকে ধাতানি দিয়ে বলে দিয়েছেন ঠিক আটটায় হাজিরা দিতে। এই বিশেষ তদন্তের ব্যাপারে গাঁয়ের লোকদের অতি-উৎসাহ দেখে তিনি কড়া হুকুম জারি করে দিয়েছেন যেন থানার সামনে ভিড়ভাট্টা না হয়। এ তো আর খ্যামটা নাচ নয় যে দলে-দলে ভিড় জমাতে হবে! কিন্তু এই গেঁয়োগুলোকে কোনো কিছু হাজারবার বোঝালেও তা মাথায় ঢোকে না। আটটা বাজতে না বাজতেই হীরা আর যোগেসরের সঙ্গে বিশ-পঁচিশ জন এসে হাজির হলো। দারোগাবাবু তেড়ে উঠতেই তারা বললো, 'হুজুর, আমরা ঐ দূরে বসে থাকব।' তারা থানার বাইরে খোলা মাঠে এক ঘন গাছের তলায় দল বেঁধে বসে রইলো।

অন্য কোনো সময় হলে দারোগাবাবু ওদের কষে ধাতানি দিতেন কিন্তু আজ নিজেকে সামলে নিলেন। ওপরতলার আদেশ, কারো সঙ্গে কোনোরকমের কড়া ব্যবহার করা চলবে না। ভালো, তার কি? …তার কিছু করারও নেই, বলারও নেই। এই দেহাতিদের পাল্লায় পড়লে একদিনেই টের পাওয়া যাবে কত ধানে কত চাল! শহরে লোকদের তো নরম কথাতেই কাবু করা যায় —কিন্তু এই দেহাতি আকাটগুলো? ডাণ্ডা মেরে সিধে করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা আছে কি? আর এই বিন্দাকে দেখো। এখনো পর্যন্ত শালার কোনো পাত্তা নেই। উদ্ভট এক লোক। কোনো দেহাতি একবার শহরের হাওয়া খেলে মনে করে লাটসাহেব হয়ে গেছে। আমায় তো বেইজ্জত করে ছাড়বে দেখছি। দারোগাবাবু হুকুম করলেন অথচ সে এলো না …দারোগাবাবু, না শালা… যাকগে, আমার কি?

ওপর থেকে চিঠি না দিলে হারামিকে আমি পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে আসতাম। ঠিক আছে, এস. পি. সাহেব নরম সুরেই ডেকে পাঠান।

যে লোকগুলো এসে জুটেছে দারোগাবাবু দু-দু'বার তাদের সতর্ক করা সত্বেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। থাকতে না পেরে আবার গিয়ে কড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এস. পি. সাহেবের জীপ যেমনি ঢুকবে কথাবার্তা একদম বন্ধ। একদম চুপ। যার এজাহার নেওয়া হবে সেই কেবল ভেতরে আসবে। বাকি সবাই, কেউ এক পা-ও নড়বে না। ভেতরে যখন এজাহার নেওয়া হবে, বাইরে বারান্দায় তখন কেউ উঁকিঝুঁকি মারবে না। বুদ্ধিসুদ্ধি তো সারাজীবনেও তোমাদের হবে না। তবে মনে রেখো এস. পি. সাহেবের সামনে দেহাতিপনা একদম চলবে না! যা জিজ্ঞাসা করা হবে, শুধু তারই জবাব দেবে। এটা-সেটা ফালতু কথা একদম নয়।'

যোগেসর যে-মুহূর্তে শুনেছে যে এস. পি. সাহেবের সামনে এজাহার দিতে হবে, তখন থেকেই তার বুকে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে। দারোগাবাবুর ঘন-ঘন ধাতানিতে ওর মনে হচ্ছিলো যে তার বুকের ধুকপুকুনি না বন্ধ হয়ে যায়। জীবনে কখনও থানা-পুলিশের ঝামেলায় তাকে পড়তে হয়নি। আর আজ খোদ এস. পি.'র সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে? কিছু না করেও কোত্থেকে এক উটকো বিপদ এসে হাজির হলো! কে জানে কি কুক্ষণে যে বিসুর লাস তার চোখে পড়েছিলো!

ঠিক সেই সময়ে জীপের আওয়াজ শোনা গেলো। দারোগাবাবু অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এস. পি. সাহেব গাড়ি থেকে নামতেই দারোগাবাবু ঠকাস করে কষে এক স্যালুট মারলেন। এস. পি. সাহেবের সঙ্গে গোটা-তিনেক কনস্টেবলও ছিলো। সাকসেনা চারদিকে একবার চোখ বুলালেন। কই, হাওয়ায় তো কোনো উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না! দূরে যে লোকগুলো বসে আছে তাদের দেখিয়ে বললেন, 'এতগুলো লোকের এজাহার নেওয়া হবে?'

'না স্যার। এজাহার তো কেবল জনা-চারেকের নেওয়া হবে।' তারপর একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'বেশ কড়া হুকুমই দিয়েছিলুম যাতে তামাসা দেখার জন্যে কেউ অহেতুক ভিড় না জমায়। কিন্তু এই দেহাতি লোকগুলো, স্যার...'

'হুঁ।' সাকসেনা মাঝপথেই বাধা দিলেন। তাঁর সঙ্গে-আসা কনস্টেবল জীপ থেকে ফাইল বার করে এনে অফিসের টেবিলের ওপর রাখলো। দারোগাবাবু সবিনয়ে তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলেন। ঘরের এককোণে চায়ের সব ব্যবস্থা তৈরি। বেশ বাহারি টি-সেট। সঙ্গে আছে বিস্কুট ...নিমকি ...মিষ্টি ইত্যাদি। সাকসেনা

চেয়ারে বসতেই দারোগাবাবু বিনীতভাবে বললেন, 'একটু কিছু মুখে দিয়ে নিলে হতো না স্যার, একটু চা ?'

'এখন ? এখন কাজের সময়, না চা খাওয়ার সময় ?' সাকসেনার মেজাজ দেখে দারোগাবাবু কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেন।

'যাদের এজাহার নেবার কথা, তারা সবাই এসে গেছে ? তাহলে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক্।'

'স্যার বিন্দা ছাড়া আর সবাই এসে গেছে,' দারোগাবাবু তোতলাতে লাগলেন, বললেন, 'লোকটা একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের। দু-দু'বার লোক পাঠিয়েছিলাম তবুও আসেনি।'

'হুঁ।'

'আপনি যদি হুকুম করেন তো ধরে নিয়ে আসি। এখন ওকে মাঠেই পাওয়া যাবে। নরম ব্যবহার করার হুকুম ছিলো তাই…'

'কারো সঙ্গেই কোনোরকম কড়া ব্যবহার চলবে না, বুঝেছ ?' ঠাণ্ডা গলায় সাকসেনা সেটা আবার মনে করিয়ে দিলেন। টেবিলের ওপর দা-সাহেবের নির্দেশ তখনো লটকানো ছিলো, 'সাকসেনা, এটা দেখো কারো ওপর যেন জুলুম না করা হয়। অযথা কারো প্রতি রূঢ় হয়ো না। লোকরা যেন সাহস পায়। তারা যেন খোলাখুলি মনের কথা বলতে পারে। গ্রামের লোকরা যেন বুঝতে পারে যে তাদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কথা বলার সুযোগ পেলে মন হালকা হয়ে যায়। আর এখন তো আমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।' সাকসেনাও ঠিক করে নিয়েছেন যে তিনি কারো প্রতি রূঢ় হবেন না। তাঁরও লক্ষ্য মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা।

'যোগেসর সাহুকে ডাকো', বলার সঙ্গেসঙ্গেই চৌকিদার হাঁক পাড়লো। একটু পরে যোগেসর সাহু কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে এসে ঢুকলো এবং নমস্কার করলো।

সাকসেনা তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে নিজের কাজ শুরু করলেন। নাম, বয়স, পেশা ইত্যাদি কলামগুলো ভর্তি করে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি বিসেসরের লাশ কখন দেখেছিলে ?'

'আজ্ঞে, এই ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটা নাগাদ।'

'সে সময়ে তুমি ওখানে কি করতে গিয়েছিলে ?'

'হুজুর, পায়খানা করার জন্তে তো ওদিক দিয়েই যেতে হয়।'

'হুঁ, তুমি দূর থেকে কি করে বুঝলে সাঁকোর ওপর পড়ে-থাকা লোকটা মৃত ?'

'না হুজুর। বুঝতেই পারিনি। মনে হচ্ছিলো কেউ ঘুমিয়ে আছে। সাঁকোর নিচে সেই যে নালাটা …আমার মনে হলো লোকটা একটু পাশ ফিরলেই নালায়

পড়ে পড়বে …যাই জাগিয়ে দিয়ে আসি। কাছে গিয়ে দেখি, আরে এ তো বিসু। ওকে জাগাবার জন্যে গায়ে হাত দিতেই বুঝলাম, মারা গেছে।'

'হুঁ।' খস্‌খস করে লিখে চলেছেন সাকসেনা। সব এজাহার আজ নিজের হাতে লিখবেন।

'হুজুর, আমি তো ভালো করতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেলাম। কিন্তু হুজুর, সত্যি বলছি পুরো ঘটনাটায় আমার কোনো দোষ নেই। বিসুর সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না, তো তার মৃত্যুর সঙ্গে।'

'যা জিজ্ঞেস করব, শুধু সেটুকুরই জবাব দেবে,' লিখতে-লিখতে সাকসেনা বললেন।

'হ্যাঁ, বেশি বক্‌বক করার দরকার নেই।' দারোগা ধমক দিতেই সাকসেনা হাতের কলটা তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন। ইশারা বুঝে দারোগাও ভয়ে গুটিয়ে গেলো।

'বিসুকে তুমি চিনতে?'

'হুজুর, গাঁয়ে তো সবাই সবাইকে চেনে।' গলার স্বরে এমন এক কাতর অসহায় ভাব যেন বিসুকে চেনা এক মহা অপরাধ।

'ছেলেটা কি রকম ছিলো?'

'আরে, একেবারে ক্ষ্যাপাটে, সাহেব। বরং বলা উচিত গোটা গাঁয়ের পক্ষেই এক আপদ ছিলো হতভাগা।'

"ক্ষ্যাপাটে" শব্দটার তলায় দাগ দিলেন সাকসেনা। 'ক্ষ্যাপাটে বলতে কি বোঝাতে চাও? পাগল-টাগল কিছু?' যোগেসরের মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন সাকসেনা। তীক্ষ্ণ চাউনির কাছে হকচকিয়ে গেলো যোগেসর। গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না।

'হ্যাঁ, বলো বলো।' সাহস যোগালেন সাকসেনা। 'তোমার কি ওকে পাগল মনে হতো? মাথা খারাপের কোনো লক্ষণ তোমার চোখে পড়তো কি?'

'পাগল ছাড়া আর কি, হুজুর। আপনিই ভেবে দেখুন, যার মাথার ঠিক আছে সে কি কোনো কাজকম্ম করবে না …কোনো চাকরি-বাকরি, রোজগার-পাতি? সেসব না। হরিজন-বস্তিতে বাউণ্ডুলের মতো খালি ঘুরে বেড়াতো। কোনো জ্ঞান-গম্যিওয়ালা মানুষ কি এ কাজ করতে পারে?' "পাগল" আর "বাউণ্ডুলে" শব্দ দু'টোর তলায় সাকসেনা দাগ দিলেন।

'তুমি লাসটা যখন দেখতে পেলে তখন আশপাশে কেউ ছিলো? কাউকে ঘুরে বেড়াতে অথবা কিছু করতে দেখেছ কি?'

'না, হুজুর। নিঝুম খাঁ-খাঁ করছিলো চারধার।'

'ওখানে কোনো জিনিস পড়ে থাকতে দেখেছিলে? এই ধরো যেমন লাঠি… ছুরি …পিস্তল, বা এমন কিছু যা দিয়ে কাউকে মারা যায়?'

'না হুজুর, ওসব কিছু চোখে পড়েনি। তাছাড়া অতশত খোঁজ করবই বা কেন ?'

'লাশ চোখে পড়ার পর তুমি কি করলে ?'

'কি আর করব হুজুর। আমি তো ভয়েই মরি। ছুট লাগালাম ওর বাপকে খবর দিতে।' তারপর যেন নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে বলে উঠলো, 'মিছিমিছি নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম। কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপচাপ চলে এলেই সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু ভয়ের চোটে…।'

দারোগাবাবু চোখ পাকাতেই যোগেসর থমকে গেলো।

'তুমি যখন ওর বাবার কাছে যাচ্ছিলে তখন রাস্তায় কারো সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি ?'

'না হুজুর। ও রাস্তাটা ফাঁকাই থাকে।'

'হুঁ!' সাকসেনাকে কিছুটা চিন্তিত দেখালো। যোগেসরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চাউনি মেলে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন। যোগেসরের ভেতর অব্দি যেন কেঁপে উঠলো। ও তার দৃষ্টি মাটির দিকে নামিয়ে আনলো, কিন্তু ওর কেবলই মনে হতে লাগলো সাকসেনা যেন তার দিকে তখনো চেয়ে রয়েছেন। পা-দু'টো থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

'গ্রামে কার-কার সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিলো তা বলতে পারো ?'

যোগেসরের মনে হলো শুনিয়ে দেয়, 'হতভাগা তো গাঁয়ের অর্ধেক মানুষকেই ওর শত্রু বানিয়ে ফেলেছিলো …এর সঙ্গে ওর লড়াই বাধিয়ে দেওয়া, ওর সঙ্গে এর। এ ছাড়া ওর আর আলাদা কাজই-বা কি ছিলো ? শান্ত, নিপাট মজুরগুলোকে দিনভর ক্ষেপিয়ে বেড়াতো।' কিন্তু সাকসেনার চোখে চোখ পড়তেই গলাটা শুকিয়ে গেলো। একটা কথাও বলতে পারলো না ও।

'ঠিক-ঠিক সব খোলাখুলি বলো। কোনো ভয় নেই। গাঁয়ের কারো সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিলো ?'

সাকসেনার কাছ থেকে আশ্বাস পেতেই যোগেসরের একবার মনে হলো জোরাভরের নামটা করে দেয়। কিন্তু যেন এক অদৃশ্য লাঠির আঘাতে ও নামটাই ভুলে গেলো। সাহসে ভর দিয়ে শুধু এটুকুই তার মুখ দিয়ে বেরোলো, 'আমি জানি না হুজুর। এসব বাউণ্ডুলেগুলোর থেকে আমি শত হস্ত দূরে থাকি।'

'হুঁ! তাহলে ওর কোনো শত্রুর কথাও তোমার জানা নেই ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। আমি সত্যিই জানি না। এমনিতেই অন্যের ব্যাপারে আমি বড়-একটা নাক গলাই না। একটা ছোট্ট মুদির দোকান আছে আমার। বাড়ি থেকে দোকান আর দোকান থেকে বাড়ি—এই-ই আমার জীবন আর তাতেই আমি সুখী। শান্তিতে দু'মুঠো খাই এবং ঘুমোই। কি আর বলব হুজুর,

লোকে যদি নিজের-নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে তবে তো সব ঝামেলাই মিটে যায়। নিজের-নিজের চরকায় তেল দাও! আরে বাবা, এ কি পাগলা কুকুরে কামড়েছে যে অন্যের ব্যাপারে নাক ...।'

কিছু লিখতে-লিখতে সাকসেনা তাঁর হাতের কলমটা নাড়ালেন আর তাতেই যোগেসরের মুখে লাগাম পড়লো। সাকসেনা মিনিটখানেক ছাদের কড়ি-বর্গার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো।' যোগেসর কিন্তু এক পা-ও নড়লো না। হাতজোড় করে মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, 'হুজুর, আমি আবার বলছি এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। হুজুর আমাদের মা-বাপ। আপনার সামনে মিথ্যে বলব না। আমি বিলকুল নির্দোষ। এখন আপনিই দেখুন হুজুর, আমি নিয়ম করে পুজো-আচ্চা করে থাকি ...আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর।'

ইশারা বুঝেই দারোগাবাবু তার হাতটা ধরে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেলেন। যেতে-যেতে যোগেসর সাকসেনার দিকে কাতর দৃষ্টি দিয়ে চাইলো।

কিছুক্ষণ লিখে চললেন সাকসেনা। তারপর ফাইল থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন দারোগাবাবু মুখে দেঁতো হাসি নিয়ে বরফ-দেওয়া ঠাণ্ডা জলের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছেন। জলটুকু শেষ করে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিতে-দিতে প্রশ্ন করলেন, 'যোগেসর লোকটা কেমন?'

'একেবারে নির্বিবাদী, সজ্জন, সাদাসিধে মানুষ। ঝুট-ঝামেলার ধারেকাছেও থাকে না কখনও। একটু ভীতুও বটে। যেদিন থেকে শুনেছে ...।'

'হুঁ।' সাকসেনা থামিয়ে দিলেন। 'মহেশ শর্মাকে ডাকো।'

একটু বাদেই মহেশ শর্মা এসে ঢুকলেন। শহুরে পোষাক, শহুরে ধরন-ধারণ। আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে সাকসেনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার শর্মা, আপনাকে তো এই অঞ্চলের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না?'

'আজ্ঞে আমি দিল্লী থেকে এসেছি।'

'কি ব্যাপারে?' সাকসেনার মুখে কৌতূহল-মেশানো বিস্ময় ফুটে উঠলো।

'আমার রিসার্চ প্রজেক্টের ব্যাপারে। গ্রামে ক্লাস স্ট্রাগ্‌ল্ এবং এই কাস্ট কনফ্লিক্ট ...!'

এ বিষয় সম্পর্কে জানার কোনো উৎসাহ সাকসেনার নেই। তাই তাঁকে বিরত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কদ্দিন আছেন এখানে?'

'এই মাস দেড়েক।'

'বিসেসরের সঙ্গে কি করে আলাপ হলো আপনার?'

'নিজের কাজের ব্যাপারেই গ্রামের লোকের সঙ্গে আমরা আলাদা-আলাদা ভাবে দেখা করেছিলাম। তখনই আলাপ হয়েছে।'

'আমরা কারা ? আপনার সঙ্গে কি আরো কেউ আছেন না-কি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার আর এক বন্ধু, অখিলন রামচন্দ্রন।'

'তিনি কোথায় ?'

'মায়ের অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে ও বাড়ি গেছে।'

'হুঁ। শুনলাম বিসু না-কি আপনার বাড়িতে রোজই যাতায়াত করতো ? সন্ধ্যেগুলো না-কি ওর আপনার কাছেই কাটতো ?' সাকসেনা মহেশের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

'আজ্ঞে রোজ না হলেও মাঝেমাঝেই আসতো।' সাকসেনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে মহেশ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

'আপনাদের সঙ্গে ওর কি ধরনের কথাবার্তা হতো ?' মহেশের মুখে একটু অপ্রস্তুত ভাব দেখা গেলো। কিছুতেই উনি বুঝে উঠতে পারলেন না বিসুর সঙ্গে তাঁদের যে কথাবার্তা হতো তা এককথায় তিনি কি করে বোঝাবেন।

'আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনাদের মধ্যে কি ধরনের কথাবার্তা হতো ?'

'আসলে ও খুব সেনসিটিভ ছিলো ···এক্সট্রা-সেনসিটিভ। ভাবনা-চিন্তাও করতো খুব। এখানে ওর মতো একটা লোকের দেখা পাবো তা আমরা কখনও ভাবিনি। ইট ওয়াজ রিয়েলি···'

'মহেশবাবু, আমার প্রশ্ন এটা নয়, আর আমি আমার প্রশ্নেরই উত্তর চাই।' কড়া গলায় সাকসেনা এটা বলার পরই মহেশ শর্মা নিজেকে একটু গুটিয়ে নিলেন। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'ওর কথাবার্তার নির্দিষ্ট কোনো বিষয় ছিলো না। আসলে ও প্রচণ্ড এক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতো ···একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। আর সে কথাই বলতো।'

'ওর যন্ত্রণা বা দুঃখের কারণটা কি আমি সেটাই জানতে চাই। কোনো ব্যক্তিগত কারণ কি ? আই মিন পারসোনাল ?'

'পারসোনাল ?' মহেশ শর্মা শব্দটা এমনভাবে ছুঁড়ে দিলেন, মনে হলো তিনি কথাটির অর্থই বুঝতে পারছেন না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারসোনাল! আপনি বললেন না ও এক্সট্রা-সেনসিটিভ ছিলো··· কাজকর্মও কিছু করতো না।' একটু থেমে বললেন, 'বয়সে তরুণ, বিয়ে-থাও হয়নি। এমন তো হতে পারে কোনো মেয়ে···।'

'না না স্যার। একদম নয়।' মহেশ শর্মা মাঝপথেই বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। তারপর শান্ত, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ও এ ধরনের ছেলেই ছিলো না।'

এবার সাকসেনা একটু হাসলেন, 'মেয়েদের সঙ্গে যারা প্রেম করে তারা কি আলাদা কোনো জাতের হয় না-কি ?'

মহেশ অসম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

'কি ধরনের ছেলে ছিলো সে ?'

মহেশের চোখে একটা অদ্ভুত অসহায় ভাব ফুটে উঠলো। তিনি ভেবে পেলেন না কি জবাব দেবেন। শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'বলার বিশেষ কিছু নেই। নাথিং ভেরি স্পেশাল ...নাথিং রোমান্টিক অ্যাবাউট হিম্। এক অতি-সাধারণ মানুষ। গ্রামের একটা গরীব ছেলে। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিলে তবেই খাবার জুটতো।'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে সাকসেনা মহেশের পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন এমনভাবে ফুটে উঠলো মনে হলো তিনি বিশুর সম্বন্ধে যা জানতে চাইছেন তা এখনো জানতে পারেননি।

'তবু একটা-কিছু ছিলো স্যার ...যদি ওর সঙ্গে আপনার একবার দেখা হতো, যদি একবার ওর সঙ্গে কথা বলতেন ...।'

'না দেখা হয়নি আর তাই তো জিজ্ঞাসা করছি ঐ "একটা-কিছু"টা কি?'

মহেশ শর্মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গলাটা একটু ঝুঁকিয়ে বললেন, 'না স্যার। কথায় বুঝিয়ে বলতে পারব না। ভীষণ কঠিন কাজ।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো। আপনি রিসার্চ করতে এসেছেন, থিসিস লিখে জমা দেবেন, অথচ ওঠা-বসা ছিলো এমন একজন লোক সম্পর্কে দু'লাইন বলতে পারছেন না।'

তারপর গলার আওয়াজ কঠিন করে বললেন, 'আপনি যেভাবে জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন তার যদি অন্য অর্থ করা হয়? আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'

মহেশের চোখে-মুখে এক করুণ ভাব ফুটে উঠলো। তিনি যতখানি ভয় পেলেন, তার চেয়ে যে কথা তিনি বলতে চান অথচ বলতে পারছেন না, তার যন্ত্রণা তাঁকে অসহায় করে তুললো।

'মিস্টার শর্মা, আমার প্রশ্ন কিন্তু এখনো ঐ একটাই —বিশুর মানসিক যন্ত্রণার কারণটা কি?' সাকসেনা মহেশ শর্মার মুখের দিকে চাইলেন। 'এমনিতেই এই পুরো সেট-আপ'টার ওপরই ও ক্ষুব্ধ ছিলো, কিন্তু গত মাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ও একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। হি ওয়াজ নট ইন প্রপার সেনসেস্!'

'হুঁ!' একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সাকসেনা।

'ওর বক্তব্য ছিলো পুরো ঘটনাটাই জেনেশুনে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। আর মিথ্যে একটা সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হতভাগ্য কনস্টেবলকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। ছোটখাটো অপরাধ যারা করেছিলো সাজা হলো তাদের কিন্তু যারা অপরাধের মাথা তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে রইলো ...আর ভবিষ্যতেও তাই থাকবে!'

মহেশ একটু থামলেন, তারপর আবার শুরু করলেন, 'এসব ব্যাপার নিয়েই ও আকাশ-পাতাল ভাবতো। ওর বক্তব্য ছিলো —মহেশবাবু, এটা কেবল কয়েক-জন মানুষেরই মৃত্যু নয়, বরং বলা যায় পুরো অঞ্চলের মানুষের মনোবলকে খুন করা হলো। গত আট মাস ধরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এমন তৈরি করে দিয়েছিলাম যে, বুক

ঢুকে যেন নিজের হকের পাওনা আদায় করতে পারে মানুষ ···এখন নিজেদের ন্যায্য পাওনা দাবি করার সাহস তারা বহুদিন পাবে না !

'হুঁ !' আবার পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন সাকসেনা, 'ছেলেটা নকশাল ছিলো না-কি ?'

'না, তবে সেসব নিয়ে কথাবার্তা বলতো ।'

'কথাবার্তা ?' প্রশ্নে স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুর ।

'ওদের কর্মপদ্ধতিকে ও ভুল বলে মনে করতো ।'

'বেশ, ওর নিজের কর্মপদ্ধতি কি রকম ছিলো ?'

'কাজ ! ও তো বিশেষ কিছু কাজ বোধহয় করতো না !'

'কেন ? শুনেছি হরিজন আর ক্ষেতমজুরদের না-কি ক্ষেপিয়ে বেড়াতো সে ? নকশালরাই তো সেসব করে থাকে ।'

'ক্ষেপিয়ে বেড়ায়নি তো, ওদের কেবল নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে দিতো । যেমন, সরকার যে মজুরি ঠিক করে দিয়েছেন সেটা অবশ্যই নাও —না দিলে কাজ করো না । কিন্তু ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা বা মারদাঙ্গার কথা তো ও কখনও বলেনি ।' একটু থেমে বললেন, 'এখানেই তার সঙ্গে নকশালদের তফাৎ ।'

'হুঁ !' একটু চুপ করে রইলেন সাকসেনা । তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দিক থেকে শুরু করলেন, 'আচ্ছা, বলুন তো যখন ও নিজের মানসিক যন্ত্রণার কথা আপনাদের বলতো, তখন আপনারা কি জবাব দিতেন ?'

'আমরা ?' একটু থমকে গেলেন মহেশবাবু । তারপর আমতা-আমতা করে বললেন, 'দেখুন স্যার । কথাটা হলো গ্রামের সমস্যাদি, ঘটনাবলী আর খোদ গ্রামের মানুষের সঙ্গে ইনভল্‌ভ হবার অনুমতি আমাদের নেই । আমাদের কাজের প্রথম শর্তই হলো আমরা যেন কোনো ব্যাপারে নিজেদের জড়িয়ে না ফেলি ।'

সাকসেনার চোখে-মুখে হালকা চিন্তার ছাপ । কথাটা পরিষ্কার করার জন্যে মহেশ আবার বললেন, 'আমি ঠিকই বলছি । আমাদের ফর্মে এসব কথাই লিখে দিতে হয় ! আর এসব ব্যাপার নিয়েই বিশু আমাদের ওপর খুব ক্ষুব্ধ ছিলো !'

'কেন ? ক্ষুব্ধ কেন ?'

'শুধু ক্ষুব্ধই নয়, আমাদের সঙ্গে দস্তুরমতো ঝগড়া করতো । বলতো, আপনাদের মতো লেখাপড়া-জানা লোক যদি বসে-বসে খালি তামাসা দেখেন, তবে গরীব লোকের হয়ে লড়াই করবে কারা ? যেখানে দিনদুপুরে এমন অত্যাচার চলে, সেখানে একজন মানুষ চুপচাপ বসে খালি দিস্তে-দিস্তে কাগজে লেখে কি করে ?' বলতে-বলতে মহেশের গলা হঠাৎ ধরে এলো । নিজেকে সামলে নিয়ে কথা শেষ করলেন, 'আমরা যে কতটা অক্ষম তা ওকে কখনও বুঝিয়ে উঠতে পারিনি ।'

'হুঁ !' কি যেন ভাবলেন সাকসেনা । তারপর আসল প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললেন, 'শুনেছি, বিশু যে রাতে মারা যায়, সেদিন সন্ধ্যেবেলা না-কি আপনার কাছে এসেছিলো ? এ কথা কি ঠিক ?'

'না, সেদিন নয়। তার আগের দিন এসেছিলো। সেদিন সন্ধ্যেবেলা অখিলনকে তুলে দেবার জন্যে স্টেশনে গিয়েছিলাম। ফিরতেও রাত হয়েছিলো।'

'তা, কি কথাবার্তা হয় সেদিন ?'

'সেদিন তাকে বেশ উৎসাহিত মনে হয়েছিলো। বলছিলো সে না-কি অনেক দৌড়াদৌড়ি করে এদিক-ওদিক থেকে অগ্নিকাণ্ডের প্রচুর প্রমাণ যোগাড় করেছে। সেসব এখানকার পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে দিল্লীতে গিয়ে যেভাবে হোক, যেমন করেই হোক আবার এই মামলার তদন্ত শুরু করিয়ে ছাড়বে।' একটু থেমে মহেশ আবার শুরু করলেন, 'দু'হাত ঝাঁকিয়ে আমার কাছে মিনতি করেছিলো, অন্তত এই ব্যাপারে আমি যেন ওকে সাহায্য করি, ওর সঙ্গে দিল্লী যাই। কিন্তু আমরা …' ঠোঁট দু'টো চেপে ধরে মহেশ চোখের জল সামলে নিলেন।

'কি প্রমাণ সে যোগাড় করেছিলো ?'

নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে যেমন-তেমন একটা উত্তর দিলেন মহেশ, 'সেসব আমি জিজ্ঞাসা করিনি। বললাম না আপনাকে …!'

'আপনি জিজ্ঞাসা না করতে পারেন। কিন্তু ও নিজে থেকে যদি কিছু বলে থাকে !'

'না !' গলার স্বর ভারি হয়ে এলো।

সাকসেনা মহেশের মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে একটু চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। ধরে নিচ্ছি, একজন ছাত্র হিসেবে আপনাকে এসব ব্যাপার থেকে দূরে সরে থাকতে হয়। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে আপনার তো কিছু বলার থাকতে পারে। আপনার মতে বিশুর মৃত্যুর কারণ কি হতে পারে ?'

'না, স্যার ! সামান্য কিছু বলাও আমার পক্ষে অসম্ভব।' একটু থেমে বললেন, 'শুধু এটুকুই বলব যে ওর মৃত্যুতে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি …এমন একটা আঘাত যা ভেতর অব্দি নাড়া দেয় ! ধরে নিন আমাদের সবার বেঁচে থাকা সম্পর্কে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়ে ও মৃত্যুবরণ করেছে।' সঙ্গে সঙ্গে মহেশের দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

'বী কাম্, মিস্টার শর্মা, বী কাম্ …।' সান্ত্বনার সুর ফুটে উঠলো সাকসেনার কণ্ঠে।

শার্টের হাতায় চোখের জল মুছে মহেশ বললেন, 'একস্‌কিউজ মি স্যার, এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে, মিস্টার শর্মা। এখন আপনি যেতে পারেন। প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাব।'

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন মহেশ, তারপর বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নেমে হনহন করে মেঠো পথ ধরে চলে গেলেন। মহেশের অপসৃয়মান মূর্তির দিকে

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সাকসেনা আর ওদিকে দারোগাবাবু পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। একটু বাদে সাকসেনা দারোগার দিকে চাইতেই তিনি একান্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'এবার একটু আরাম করুন, স্যার। এক রাউণ্ড চা যদি …?'

'না, এখন নয়!' সাকসেনা আবার গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

মহেশের এজাহার নেবার সময়ে যে বিষণ্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো, তা স্বাভাবিক করার জন্যে দারোগাবাবু বললেন, 'স্যার, এইসব শহুরে লোকেরা না গ্রামকে বুঝতে পারে, না গ্রামের সমস্যা। এদের কথায় এতটা গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো। রিপোর্টের কলামে ভর্তি করার কথা ছিল, ভর্তি হয়ে গেছে। স্যার এরা এসেছেই তো এই ক'দিন হলো। এঁদের কথার মূল্যই বা কতটুকু?'

'হীরাকে ডাকুন!' সাকসেনার আদেশে দারোগার মুখ বন্ধ হয়ে গেলো।

চোখের ইশারায় চৌকিদারকে আদেশ দিলেন দারোগাবাবু। চৌকিদার বেরিয়ে গেলো।

একটু বাদে হীরা লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে, ধীরে-ধীরে এলো। ছোট ভাই গনেশী হাত ধরে নিয়ে আসছিলো। কিন্তু যেই তারা বারান্দায় উঠতে যাবে, দারোগাবাবু আটকালেন, 'বাস্, বাস্। খালি হীরা ভেতরে যাবে। কতবার বলেছি…।'

'হুজুর, একটু ঢুকতে দিন। বিসু মারা যাওয়াতে দাদা বড্ড ভেঙে পড়েছে! আমি থাকলে একটু সাহস পাবে।'

'আরে, সাহসের কথা হচ্ছে কেন? এখানে কোনো …।'

'আসতে দিন। ওকেও আসতে দিন।' কড়া গলায় সাকসেনা দারোগাবাবুকে থামিয়ে দিলেন। থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন দারোগাবাবু। মনে-মনে কষে এক মোক্ষম খিস্তি ঝাড়লেন। 'সশালা সেই তখন থেকে আমায় বেইজ্জতি করে চলেছে। তুমি তো দু'দিন বাদেই সটকে পড়বে। আর দারোগাগিরি তো আমাকেই করতে হবে।' কিন্তু অপমান হজম করে একটু ফ্যাসফেসে, মিহি গলায় বললেন, 'এসো, এসো। তুমিও এসো! দেখেছ, তোমাদের সকলের ওপর হুজুরের কত দয়া?'

দু'জনেই ভেতরে এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালো। সাকসেনা হীরার ভাবলেশহীন মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন, 'বসো। তুমি বসে-বসেই এজাহার দিও।' তারপর সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'দেখো, যা জিজ্ঞাসা করব পষ্টাপষ্টি বলো, কেমন? ঘাবড়াবার কিছু নেই —সব কথা ঠিক-ঠিক বলো!'

'মিছে কথা বলব কেন, হুজুর? যা বলব, ঠিক কথাই বলব।'

'হ্যাঁ, সত্যি কথাটা বললেই তো সব কিছু জানা যায়, তাই না?'

'এখন জেনেই বা কি হবে, হুজুর? আমার বিসুই চলে গেলো।' জলে-ভেজা চোখ দু'টো মাটির দিকে নামিয়ে নিলো হীরা। সাকসেনাও মিনিট দু'য়েক চুপচাপ। ঠিক আছে, হীরা একটু সহজ হয়ে নিক। কিছুক্ষণ বাদে এজাহার নেওয়া শুরু হলো। প্রথম দিকের কলামগুলো ভর্তি করার পর সাকসেনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিসেসর তোমার ছেলে ছিলো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! আমার বড় ছেলে।'

'বয়স?'

'এক কুড়ি আর আট বছর, এই ভাদ্দর মাসেই তো তার জন্ম!'

'কিছু পড়াশুনা শিখেছিলো কি?'

'কিছু মানে? হুজুর, অনেকদূর অব্দি পড়েছিলো। চোদ্দ কেলাস পাস দিয়েছিলো। শহরে পাঠিয়ে পড়িয়েছিলাম। আমি মেহনত-মজদুরি করে আধ-পেটা খেয়ে আমার বিসুকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, হুজুর।' একটু থেমে আবার শুরু করলো, 'বিসুকে নিয়ে কত কি ভেবেছিলাম, কত স্বপ্ন দেখেছিলাম ···বড় হবে, চেয়ারে বসে কাজ করবে। কিন্তু ···' কান্নায় বুজে এলো হীরার গলা। ঘাড় নেড়ে হতাশ গলায় বললো, 'সব শেষ হয়ে গেলো।'

'কাজ কি করতো সে?'

'কিছুই না!'

'কিছুই না? আটাশ বছরের তাজা জোয়ান আর কিছুই করতো না?' সাকসেনা একটু ভ্রূ কোঁচকালেন। গলায় কৌতূহলের ছোঁয়া।

'প্রথমে তো এই গাঁয়েই নিজের ইস্কুল খুলেছিলো। ছোট-বড় সবাইকে পড়াতো ···আর কি সব জানি বোঝাতো।'

'কি সব বোঝাতো?' সাকসেনার চোখে ঈষৎ তীক্ষ্ণতা।

'আমি আর সেসব কিই-বা বুঝি, হুজুর। আমি তো মজদুর—কোদাল খুরপি চালাই। যে চোদ্দ কেলাস পাস দিয়েছে তার কথা আমার মাথায় কি করে ঢুকবে?'

'হুঁ। কে-কে আসতো ওর ইস্কুলে?'

'বললাম না, হুজুর, গাঁয়ের ছেলেমেয়েই আসতো। বড়রাও আসতো। হরিজন-বস্তিতে ও খোদ গিয়ে পড়াতো। পড়ানোর খুব সখ ছিলো ছেলেটার। কিন্তু সেসব তো তারপরে চুকেই গেলো।'

'কেন?'

'বা, জেলে গেলো না! চার বছরের ভেতর সব খতম হয়ে গেলো। ফিরে আসার পর ইস্কুল আর তেমন জমলো না।'

'জেলে গিয়েছিলো কেন?'

'কি জানি হুজুর! একদিন এলো আর ওকে ধরে নিয়ে চলে গেলো।'

'কিছু একটা নিশ্চয়ই করেছিলো। ...মারামারি ...ঝগড়াঝাঁটি ...মারদাঙ্গা ?'

'না, না !' উত্তেজিত হীরা মাঝপথেই বলে উঠলো, 'সেসব কিছু নয়। আমার বিসু কোনোদিন কারো সঙ্গে মারপিট করেনি। হুজুর, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না ...রাগটা ওর একটু বেশিই ছিলো ...রেগে গেলে আগুনের মতো লাল হয়ে উঠতো দু'চোখ ...কিন্তু হুজুর, আজ অব্দি কারো গায়ে হাত তোলেনি সে।'

'তাহলে জেল হলো কেন ?'

'সে তো হুজুর, আপনারাই জানেন ! আপনারাই তো ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

সাকসেনা দারোগাবাবুর দিকে চাইলেন। দারোগাবাবু একটু সামনে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস করে বললেন, 'ও ব্যাটা তো নকশাল ছিলো স্যার।'

দারোগার পানে চেয়ে থাকতে-থাকতে মহেশ শর্মার সেই কথাগুলো সাকসেনার মনে পড়লো, 'ও তো নকশালদের সমালোচনাই করতো।' এই দুই আপাত-বিরুদ্ধ কথার মধ্যে যেন সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা করলেন। একটু বাদে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে হীরার দিকে চেয়ে সাকসেনা আবার শুরু করলেন, 'সাজা ক'দিনের হয়েছিলো ?'

'হুজুর, সাজা তো কিছু হয়নি ! কোনো মোকদ্দমাই হয়নি। একদিন ভোরবেলা ওরা এসে ওকে বেঁধে নিয়ে চলে গেলো। দু'মাস ধরে আমি তো হুজুর পাত্তাই করতে পারিনি আমার বিসু আছে কোথায় ! জানটা বড়ো ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো, বড্ড ছট্‌ফট করতাম। আর ওর মা তো খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলো !'

বিসু যে কোনো দোষ করেনি সাকসেনাকে এটা বিশ্বাস করাবার জন্যে হীরা কান্নাভরা গলায় আবার বললো, 'হুজুর, আমি মিছে কথা বলছি না। আমার বিসু কোনোদিন কোনো অন্যায় করেনি। কোনো অত্যাচার করেনি।' তারপর হঠাৎ অনুনয়ের সুর ফুটে উঠলো তার গলায়, 'আপনিই বলুন হুজুর, আমার বিসুকে ওরা কেন ধরে নিয়ে গেলো ? যে কোনো দোষ করেনি তাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া কোন দেশের কানুন ?'

'জেলে কত দিন ছিলো ও ?' সাকসেনা নিজেকে নিজের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

'পুরো চার বচ্ছর, হুজুর। যেমনটি এক দিন ওকে ওরা বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলো, তেমনি এক দিন ছেড়েও দিলো।'

'নতুন সরকারের আমলে ছাড়া পেয়েছিলো না ?'

'হ্যাঁ হুজুর, ঐ সময়ে। আমি তো নতুন সরকারের খুব গুণ গাই। যাক্ আমার বিসু ঘরে তো ফিরে এলো ! আর দা-সাহেব তো দেবতা, হুজুর ! আমাদের মতো গরীব-গুর্বোদের কত খাতির করেন। সেদিন উনি আমার

বাড়িতে এলেন …আমাকে গাড়িতে তাঁর পাশে বসিয়ে নিয়ে গেলেন …নইলে গরীবের দুঃখের কথা কেই-বা জিজ্ঞেস করে ?'

কতকটা দুঃখে, কতকটা দা-সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় হীরার গলা ভারি হয়ে গেলো। সাকসেনা একটু চুপ করে রইলেন। হীরাকে দা-সাহেবের মহানুভবতার সাগরে তলিয়ে যাওয়ার সময় দিলেন।

'জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিসু কি করতো ?'

'কি আর করবে, হুজুর ? প্রথম দু-এক মাস তো এমনিই চুপচাপ পড়ে থাকতো। না কারো সঙ্গে কথা বলতো, না কোথাও যেতো। শুধু দু'হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে বসে থাকতো …খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে খোলা আকাশের পানে চেয়ে থাকতো। …খেতে দিলে খেতো, না খেতে দিলে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকতো।'

দারোগাবাবু হীরাকে চুপ করার ইশারা করতেই সাকসেনা থামিয়ে দিলেন, 'না, না, ওকে বলতে দাও।' হীরার এজাহারের প্রতিটি শব্দ নোট করে যাচ্ছিলেন তিনি।

'মাঝে-মাঝে আমার সন্দেহ হতো, এই কি আমার বিসু! কি বলব হুজুর, কি ফুর্তিবাজ তাগ্ড়া জোয়ান ছিলো সে! সবকিছু নিংড়ে নিয়েছে ওরা।'

চুপ করলো হীরা। সাকসেনা কিছুক্ষণ হীরার বলার অপেক্ষায় থেকে তারপর নিজেই বললেন, 'কিন্তু কিছু-একটা তো করতো ?…ওর চলতো কি করে ?'

'কি আর করবে, হুজুর ? সবসময় কি রকম ছটফট করতো! রাতভর খালি কাতরাতো। কি জানি, মনের ভেতর কি দুঃখ ?'

সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলোতে দাগ পড়লো।

'মানে, কোনো রোজগারপাতি করতো না ? কোনো কাজকর্ম বা অন্য কিছু ?'

'প্রথমে তো ওর ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কিছু-কিছু করে দিতো, যে যেমন পারে। কিন্তু হালে সে হরিজন-পাড়াতেই বেশি যাতায়াত করতো …ওরা আর ক'পয়সা দেবে হুজুর ? ওদের নিজেদেরই পেট চালানো মুশকিল!'

'তোমরা কিছু বলতে না ? জোয়ান মানুষ নিকর্মা হয়ে বসে থাকবে আর বুড়ো বাপ-মা খেটে মরবে ?'

'কি বলি হুজুর ? ওর মা এ নিয়ে খুব চেঁচামেচি করতো। নিজেরা না খেয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম কিন্তু ও সে কথাটা একবারও ভাবলো না। তখন তাকত ছিলো, হুজুর। এখন হাতে-পায়ে জোরই পাই না। তাই ওর মা বকাবকি করতো, শাপশাপান্ত করতো।' তারপর কান্নায় বুজে-যাওয়া গলায় বললো, 'কিন্তু আমার বিসু চলে যাওয়ার পর থেকেই ওর মায়ের চোখের জল আর শুকোয় না। কেঁদে কেঁদে সে বেচারি শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। আজও নিজেকে শাপশাপান্ত করে

বলে, "হায় ভগবান, আমি অনর্থক ঝগড়াঝাঁটি করেই তো ওকে মেরে ফেললাম। দু'টুকরো রুটির জন্যে কত খোঁটাই না দিয়েছি।" ছেলের শোকে বড্ড ছটফট করছে হুজুর। চোখে দেখা যায় না!'

গলা ভারি হয়ে এলো হীরার। চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে দু'গালের বলিরেখার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সাকসেনা প্রতিটি শব্দ সযত্নে লিখে, তলায় দাগ দিলেন। আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, 'ওর মা যখন চেঁচামেচি করতো, তখন বিসু কি করতো? কখনো কোনো সময়ে বাড়ি ছেড়ে চলে-টলে যাওয়ার কথা ...বা ...সে ধরনের কোনো কিছু...?'

'না, হুজুর। চলে যাবার কথা বলবে কেন? এই গাঁকে বড্ড ভালবাসতো সে। ও তো আমাদের বলতো, "মা তোমরা আর ক'দিন অপেক্ষা কর ...তারপর তোমাদের কোনো অভিযোগ রাখব না!" কি জানি হুজুর, ওর মনে কি ছিলো! মনের কথা মনের মাঝে চেপে রেখেই সে চলে গেলো!'

আবার হীরার গলা ধরে এলো।

সাকসেনা হীরাকে চোখ দিয়ে জরিপ করে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে তুমি বলছ বিসুর সঙ্গে কারো কখনও মারপিট হয়নি? ও যে কাজ করতো না, সেজন্যে বাড়িতে কখনো এমন ঝগড়াঝাঁটি কি হয়, যাতে মারামারি হওয়া সম্ভব ...?'

সাকসেনার তীক্ষ্ণ নজরের সামনে হীরা বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে সঙ্গেসঙ্গেই বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'না, না, হুজুর। কখ্খনও না ...একবারের জন্যেও না। আজ অব্দি বাড়িতে কোনো মারামারি করেনি। বাড়িতে কেউ ওর গায়ে হাত পর্যন্ত তোলেনি! ছোট ভাই দু'টো ওকে বড্ড ভালবাসতো আর তারা দাদার বড় বাধ্য ছিলো।'

'হুঁ!' সাকসেনা যেন একটু ধাঁধায় পড়ে গেলেন! হীরার মুখের ওপর আগের মতোই তীক্ষ্ণ নজর হেনে বললেন, 'জানো, ময়না তদন্তে তার শরীরে অনেক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে! কব্জি আর গোড়ালিতে এমন কিছু চোটের দাগ ছিলো যেন সেখানে পুরনো ঘা-মতো ছিলো। আর তুমি বলছ ও কখনও মারামারি করেনি। তাহলে এসব চোটের দাগ কিসের?'

সাকসেনা এমনভাবে প্রশ্নটা ছুঁড়লেন যাতে মনে হলো হীরার এই ধরনের সরল কথাবার্তায় তিনি আর ধোকা খেতে রাজি নন। কিন্তু, সাকসেনার তীক্ষ্ণ নজর, বা রহস্যের আসল জায়গায় পৌঁছাবার জন্যে তাঁর জেরা —এ-দু'টোর কোনোটার দিকেই হীরার মন নেই। যেন নিজেরই খেয়ালে সে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলো।

'সে চোট তো, হুজুর, জেল থেকে ছাড়া পাবার সময়েই ছিলো। যখন ফিরে এলো, হুজুর, তখন কব্জি আর গোড়ালিতে দগ্‌দগে ঘা। পুঁজ-রক্ত বেরোচ্ছে। ঘি-হলুদের পট্টি বেঁধে-বেঁধে ওর মা অতি কষ্টে ঘাগুলো সারিয়ে তুলেছিলো। চার

বহু ছর ধরে আমার বিন্দুর হাত-পায়ের বেড়ি খোলা হয়নি। বোধহয় খুব মার খেতো …সারা শরীরে জখমের দাগ …ভেতরে-বাইরে সব জায়গায়।' একটু থেমে কাঁপতে কাঁপতে বললো হীরা, 'আমার বিন্দুর শরীর বড্ড নরম ছিল …বড্ড মোলায়েম!'

হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো হীরা। গনেশী দাদার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। সাকসেনা, কনস্টেবলকে এক গ্লাস জল আনতে ইশারা করলেন।

বিদ্যুৎবেগে জল নিয়ে এসে কনস্টেবল বিনীতভাবে সাকসেনার সামনে ধরলো।

'আমাকে নয়, হীরাকে দাও।' গনেশী জলের গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, দাদার কান্না থামলে তাকে জল দেবে। এই অবসরে দারোগাবাবু সামনে ঝুঁকে একটু ইতস্তত করে বললেন, 'এবার একটু রেস্ট নিয়ে নিলে হতো না, স্যার? এক-রাউণ্ড চা হোক? এর মাঝে এরাও একটু চা-টা খেয়ে নিক।'

দারোগাবাবু মনে-মনে ভাবছিলেন, কত দৌড়াদৌড়ি করে গরমাগরম অমৃতি যোগাড় করেছিলাম আর এই শালা এস. পি. এমন কাজ-পাগল, যেন কাজ বন্ধ করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। স—ব বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেলো! …মনে-মনে এক খিস্তি ঝাড়লেন।

'ঠিক আছে, নিয়ে এসো!' তারপর হীরাকে বললেন, 'খাবার-দাবার কিছু আছে তোমার সঙ্গে?'

উত্তর এলো গনেশীর কাছ থেকে, 'আছে হুজুর। সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'না থাকলে, বাইরে ঐ-যে চায়ের দোকান, ওখান থেকে একটা কিছু কিনে নিও। যাও, এখন বাইরে যাও তো। একটু চা-টা খেয়ে নাও। মনটা ঠাণ্ডা হবে।' দারোগাবাবু তার কথা শেষ করতেই, সাকসেনার চোখে চোখ পড়ে গেলো। গলার আওয়াজ একটু কড়া হয়ে পড়ায় থাবড়ে গিয়ে মিহি গলায় বললেন, 'স্যার, এই দেহাতিগুলো থানা-কাছারি করতে এলে খাবার সঙ্গে করে নিয়েই আসে। এসব কাজে একটু-আধটু দেরি-টেরি তো হয়ই।'

দারোগাবাবুর ভয়, পাছে হীরা আর গনেশীকে এখানেই চা খেয়ে নেবার কথা বলে না ফেলেন। বড্ড দরদ দেখছি এস. পি. সাহেবের গাঁয়ের লোকগুলোর জন্যে! নিশ্চয়ই শালা ভেতরে কোনো ব্যাপার আছে? নয়তো গ্রাম বা শহর যেখানকারই হোক না কেন, পুলিশ অফিসার তো এতটা মিন্‌মিনে হয় না। সেই এসে থেকে খ্যাচখ্যাচ করে যাচ্ছে—একে বাধা দিও না …কড়া ভাষায় কথা বলো না …যতটা পারে বক্‌বক করতে দাও! একটু কিছু বললেই এমন কট্‌মট করে তাকাচ্ছে যে ভয়ে জিভ তালুতে সেঁধিয়ে যায়, মনে হচ্ছে শালা এখানে এজাহার নিতে আসেনি, পূজো করার জন্যে এদের ডেকে পাঠিয়েছে! উনি তো নিজের

কাজ হলেই কেটে পড়বেন আর গ্রামে দারোগাবাবুকে নিয়েই গালাগালির ধুম পড়ে যাবে, এ তো তিনি জানেন। এরপর তো তাকেই ছাপা সামলাতে হবে, সকালে বিন্দা না আসায় যতটা দুশ্চিন্তা হয়েছিলো, এখন তিনি ঠিক ততটাই স্বস্তি বোধ করলেন। দাঁড়াও, বিন্দা আসুক ...দু-চারটে খিস্তি ঝাড়লেই এই শহরেপনা আর মিন্‌মিনে ভাব উবে যাবে! তখন দেখব কড়া না হয়ে থাকো কি করে!

'দেখো, আমি কিন্তু চিনি খাই না,' টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কনস্টেবল চা ঢালছিলো, কথাটা তাকেই বললেন সাকসেনা। প্লেটে অমৃতি সাজাতে-সাজাতে দারোগাবাবু তক্ষুনি থেমে গেলেন, 'স্যার, একি? আপনার জন্যে স্পেশ্যাল মিষ্টির ব্যবস্থা করলাম, গাঁয়ে মিষ্টি আর কোথায় মেলে? তাই পঞ্চায়েতের প্রধান আপনার জন্যে··· ।'

'ডায়াবিটিসের রুগী আমি ···চিনি খাওয়া বারণ।' সাকসেনা কোনো আগ্রহই প্রকাশ করলেন না—না এই স্পেশ্যাল ব্যবস্থার, না পঞ্চায়েতের। পকেট থেকে সুইটেক্সের ডিবে বার করলেন, সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে কেসটা দারোগাবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন, দামী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট দেখে মনটা খুব ছুঁক-ছুঁক করছিলো, কিন্তু দারোগাবাবু শিষ্টাচারের কথা ভেবে হাত বাড়াতে পারলেন না।

'না স্যার, আপনিই খান।' কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে গেলেন দারোগাবাবু।

'কি ব্যাপার, সিগারেট খান না? আচ্ছা, চা-টা তো নিন।' সাকসেনাও টুক করে সিগারেট কেসটা বন্ধ করে পকেটে ঢোকালেন। আর একবার তো বলতে পারতেন, তা নয়, চোখের পলকে টেনে নিলেন, মনে এ কথা এলেও মুখে কিন্তু 'আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার' বলে সৌজন্য দেখিয়ে, চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে খুব সঙ্কুচিত হয়ে একটা চুমুক মারলেন দারোগাবাবু। চায়ের কাপে চুমুক মারতে-মারতে আর সিগারেটে টান দিতে-দিতে সাকসেনা কি যেন ভেবে যাচ্ছেন, সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠছে, মনে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনটাও ওপরে কোথাও উঠে গেছে। দারোগা-বাবুর ভারি ইচ্ছে এস. পি. সাহেব ওর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলুন। এই যেমন, গাঁয়ের লোকদের সম্বন্ধে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন অথবা এই কেস সম্বন্ধে তাঁর অভিমত চাইতে পারেন ···আসলে, প্রথম এজাহারটা তো উনিই নিয়েছেন।

'এখানে গরম একটু বেশি।'

বোঝো, এ তো দেখছি জলহাওয়ার কথা শুরু হয়ে গেলো! যাক্, যাই বলুক না কেন, ওকে তো জবাব দিয়ে যেতেই হবে।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার। ব্যাপারটা হলো যে চারদিকে তো খোলা মাঠ। আর গাছ-পালাও তেমন কিছু নেই, তাই সমানে লু চলে।'

'হুঁ !' সাকসেনা আবার চুপ। শেষ অব্দি সাহসে বুক বেঁধে দারোগাবাবু নিজেই কথা পাড়লেন।

'স্যার, হীরার পরে যার এজাহার নেওয়ার পালা—ঐ যে বিন্দা, সে এখনো আসেনি। আর আসবেও না। আপনাকে আমি বললাম না, একটাই ক্যাপাটে লোক আছে এখানে ? সাংঘাতিক লোক।'

'সাংঘাতিক ?' সাকসেনা এমন ভ্রূ কুঁচকে চাইলেন, যেন শব্দটার মানে জানতে চান। সে দৃষ্টির সামনে দারোগাবাবু হকচকিয়ে গিয়ে, যে কথাগুলো পেটের মধ্যে এতক্ষণ চুলবুল করছিলো সেগুলো এবার বলেই ফেললেন, 'আজ্ঞে, গাঁয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাই হোক না কেন, এই লোকগুলোর জন্যেই হয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, বিসুও এ রকমই ছিলো স্যার ! নিজে কাজকর্ম কিছুই করতো না। খালি যারা কাজ করতো তাদের ভাংচি দিয়ে বেড়াতো। উল্টোপাল্টা যত কথা…।'

'হুঁ !' মাঝখানেই থামিয়ে দিলেন সাকসেনা। একটু চুপ করে থেকে দারোগাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে ওর কি ব্যবস্থা হবে স্যার ? যদি বলেন, তাহলে…'

'আমি দেখছি,' সাকসেনার মনে যেন কোন দুশ্চিন্তাই নেই।

অদ্ভুত লোক তো ! এতে দেখার আছেটা কি ? এ কি কোনো তামাসা না-কি ! বললেই তো পিছমোড়া করে পাকড়ে আনা যায়। এমনিতে ওকে এখানে নিয়ে আসা খুব একটা সহজ হবে না। তবে এসব টেঁটিয়া লোককে কিভাবে টিট করতে হয়, তা তিনি ভালোই জানেন। একবার সুযোগ পেলে নিজের কীর্তিটা একটু দেখানো যায়। কিন্তু এ বেটা তো নিজের মধ্যে মশগুল হয়ে বসে আছে। দারোগাবাবুকে এজাহার তো এর আগেও নিতে হয়েছে …এই দেহাতি গ্রামগুলোতে তো কিছু-না-কিছু হরবকত লেগেই থাকে। কিন্তু এ রকম উদ্ভট ব্যাপার তিনি কখনও দেখেননি আর শোনেনওনি। কোথাও এতটুকু শাসনের নামগন্ধও নেই। পোষাকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও খানিকটা মাড় লাগিয়ে এলে বরং ভালোই হতো !

'এবার কাজ শুরু করা যাক।' কাপটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে সাকসেনা বললেন। 'ডাকান হীরাকে !'

'ইয়েস স্যার !' নিমেষে দারোগাবাবু অন্যের কাঁধে নির্দেশ চালান করে দিয়ে মনে-মনে খিস্তি করলেন—ষাঁড় কোথাকার !

একটু বাদে হীরা আর গনেশী আবার এসে ঢুকলো। ঠিক আগের জায়গাতেই

এসে বললো। তাদের পানে একটু চেয়ে থেকে সাক্সেনা সম্পূর্ণ নতুন এক প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করলেন, 'আচ্ছা, বলতো গাঁয়ে ওর বন্ধু কে-কে ছিলো? কাদের সঙ্গে ওর বেশি ওঠা-বসা ছিলো?'

'এমনিতে সদ্ভাব তো সবার সঙ্গেই ছিলো, হুজুর! কিন্তু হ্যাঁ, প্রাণের বন্ধু বলতে কিন্তু বিন্দা। এক মায়ের পেটের ভায়েদের মধ্যেও এতটা গলাগলি বড় একটা চোখে পড়ে না।'

'এই বিন্দা কে?' দারোগাবাবুর কাছে সাত কাহণ শোনার পরেও সাক্সেনা এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, যেন এ নাম এই প্রথম শুনলেন।

'রুক্মার স্বামী। আগে শহরে থাকতো।'

'এ গাঁয়ের বাসিন্দা নয়?' হালকা একটা ভাঁজ পড়লো সাক্সেনার কপালে। কি জানি, জেলের বন্ধু-টন্ধু নয় তো? দারোগাবাবু তো বললেনই —লোকটা বিপজ্জনক।

'না। শহরে থাকতো ...ওখানেই চাকরি করতো। কিন্তু যখন রুক্মার বাপ মারা যায়, তখন বাপের চাষ-বাসের কাজ সামলানোর জন্যে রুক্মাই ওকে এখানে নিয়ে আসে। ওর বাপের আর তো ছেলেপিলে ছিলো না। একমাত্র ওয়ারিস ঐ রুক্মা। চাষের ক্ষেত বিশ বিঘে। আর আছে ইঁদারা, গোরু, বলদ, মোষ, আমবাগান ...।'

'এই রুক্মা কে?'

'ওরই বউ, হুজুর! এই গাঁয়েরই মেয়ে ...আমার নিজের মেয়ের মতো।' হীরা এমন ঢঙে কথাগুলো বললো, যেন এমন জগদ্বিখ্যাত খবরটা সাক্সেনা জানেন না, এও কি হয়?

'খুব ভালো মেয়ে, হুজুর! বিসুকে খুব মান্যিগন্যি করতো। ওর কাজ করার জন্যে রুক্মা এক পায়ে খাড়া থাকতো।'

'হুঁ-ম্-ম্!' সাক্সেনা যেন পুরো কথাটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে চালান করে দিলেন।

'ওরই ইস্কুলে পড়তো, হুজুর। সে সময় থেকেই ...।'

'বিসুর ইস্কুলে পড়াশুনো করতো?'

'হ্যাঁ। তখন কি আর বিয়েশাদি হয়েছে? সে সময়েই পড়তো। খুব চৌকস ছিলো লেখাপড়ায়। বিসুও ওর কথা শুনতো ...খুব ভালোবাসতো।'

'হুঁ!' কথাগুলো মনের আরো গহনে চলে গেলো।

'বিসু জেলে যাওয়ার সময়ে ...বড্ড কেঁদেছিলো। ঠিক বিসুর মা'র মতো ছটফট করতো রুক্মা ...খাওয়া-দাওয়া অবধি ছেড়ে দিয়েছিলো।'

'হুঁম্-ম্!' কথাগুলো মনের আরো গভীরে ঠাঁই নিলো। এজাহারের প্রতিটি শব্দের তলায় দাগ পড়ছে!

'কবে বিয়ে হয়েছিলো রুক্মার ?'

'এই বছর-তিনেক।'

'বিয়ের সময়ে কান্নাকাটি করেছিলো, না-কি হাসিখুশি ছিলো ?'

'হুজুর ···বিয়ের সময়ে মেয়েরা তো কাঁদেই। মায়ের কাছ ছেড়ে যাবার সময়ে সব মেয়েরই কষ্ট হয়। কিন্তু রুক্মার মা-ও তো বেঁচে নেই, হুজুর! সেই তো বাপের বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনা করতো। তাই টান তো থাকবেই।'

'বিয়ের পর ওরা শহরে গেলো, না-কি গাঁয়েই রয়ে গেলো ?'

'বিয়ের পর কে আর নিজের গাঁ ছাড়ে, হুজুর ? প্রথমে অবশ্য শহরেই গিয়েছিলো। কিন্তু একদিনের জন্যেও মন বসাতে পারেনি, হুজুর।'

'তো গাঁয়ে ফিরে এলো ?'

'আর কি ? বাপের অসুখের সময়ে সেই যে এলো, আর গেলো না। বিন্দাকে খোলাখুলি বলে দিয়েছিলো ···আমি শহরে আর যাব না। আসবার হলে বিন্দা আসুক, নয়ত শহরেই থাকুক। ও এখানে থেকে বাপের জমিজমা দেখবে। তারপর, বাপ মারা যেতেই বিন্দাও গাঁয়ে এসে থেকে গেলো।'

মনের ভেতরের চিন্তায় শিলমোহরের ছাপ পড়লো।

'তাহলে, বিসুর সঙ্গে বিন্দার আলাপ-পরিচয় কোথায় হয়েছিলো ? ও সময়ে নিশ্চয়ই সে জেলে ছিলো ?'

'যখন জেল থেকে বেরোয়, তার পরেই হুজুর! বিসু ছাড়া পাওয়ায় রুক্মাও খুব খুশি হয়েছিলো।' রুক্মার সেই খুশির ছায়া হীরার চোখে-মুখেও একটু-আধটু দেখা গেলো।

'তারপর ?'

'তারপর আর কি, হুজুর ? আমার বিসু জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর চুপচাপ গুম মেরে থাকতো। তখন রুক্মাই বিন্দাকে নিয়ে এ বাড়ি আসতো ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে। ওই-ই তো বিসুকে সারিয়ে তুললো।'

'হুঁ।' লেখা শেষ করে সাকসেনা কলমটা টেবিলের ওপর ঠুকতে-ঠুকতে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তাহলে, বিসু আর বিন্দার মিতালি খুব বেশি দিনের নয় ···যেমনটি ছেলেবেলা থেকে হয় ?'

'না। সেটা ছিলো রুক্মার সঙ্গে। বিন্দার সঙ্গে তো এই ছ-সাত মাসের আলাপ। কিন্তু হুজুর, আপনি যদি দেখতেন তো বুঝতেন দু'জনে ছেলেবেলায় নয়, হয়ত গত জন্মের বন্ধু ছিলো। নিশ্চয়ই গত জন্মে দু'জনের মধ্যে মিতালি ছিলো ...তা না হলে এতটা ভালোবাসা ...'

'আচ্ছা, তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতো কখনো ?'

'দারুণ হতো, হুজুর ! রীতিমতো লড়াই !'

হঠাৎ হীরার বলিরেখায়-ভরা মুখে বাৎসল্যের ভাব জেগে উঠলো। মনে হলো, এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে দু'জন লড়াই করছে।

'লড়াই হতো কেন ?' প্রশ্নটা করেই সাকসেনা তীক্ষ্ণ নজরে চাইলেন। এমন-ভাবে নড়েচড়ে বসলেন যেন পরিস্থিতির গভীরে যেতে চাইছেন।

'কি জানি কি নিয়ে ? এমন বকবক করতো যে কি বলব ? বিন্দাও লেখা-পড়া জানতো, হুজুর। তার ওপর আবার শহরের বাসিন্দা ...ওর কথা কি আমার মাথায় ঢোকে ? হুজুর, কথা বলতে-বলতে সেই যে কথা কাটাকাটি শুরু হলো, তো হলোই ...'

'আচ্ছা, রুকমা তার স্বামীকে পেয়ে খুশি হয়েছিলো তো ?'

'ভীষণ খুশি, হুজুর ! দেড় বছরের একটা মেয়েও আছে।'

'হুঁ !' মিনিট-দু'য়েক চুপ করে কি-যেন ভাবলেন সাকসেনা। তারপর লিখতে শুরু করলেন, আর ওদিকে হীরাকে মনে হলো পুরনো দিনের স্মৃতির মাঝে ডুব মেরেছে।

প্রায় মিনিট-পাঁচেক ধরে লেখার পর, সাকসেনা অন্য দিক দিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, 'আচ্ছা, এবারে বলো তো, গাঁয়ে কারো সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিলো কি-না ?'

হীরা চুপ।

'কারো সঙ্গে ঝগড়া বা শত্রুতা ? ভয় পেয়ো না ...বলো।'

প্রশ্ন শুনেই দারোগাসাহেব চেয়ারে বসে-বসেই শরীরটাকে একটু এগিয়ে দিলেন। এবার বুড়ো নিশ্চয়ই একটা-কিছু নাম ফাঁস করে দেবে। ভয় তো আর কাউকে করার নেই, এমনই অবস্থা !

'কি বলি, হুজুর ! শত্রুতা তো নয়, কিন্তু ...' তোতলাতে লাগলো হীরা। কিন্তু সাকসেনার অভয়-মুদ্রায় একটু সাহস পেয়ে বলেই ফেললো, 'জোরাভর সিং আর কর্তারা ওর ওপর একদম তুষ্ট ছিলো না।'

'এই কর্তারা কারা ?'

'এই হুজুর, ওনারা ...যারা বড়-বড় ক্ষেতের মালিক। পঞ্চায়েত প্রধানও তুষ্ট ছিলো না।'

'কেন, তুষ্ট না থাকার কারণ ?'

'কি আর বলি, হুজুর ! আমার বিসু বজ্জ ছেলেমানুষ ছিলো। ক্ষেতে যেসব মজুর কাজ করতো, ও ওদের গিয়ে বলতো, এত কম মজুরিতে কাজ করো না। মজুরি বাড়ানোর জন্যে লড়াই কর। বেগার খেটো না ---ধার নিতে এতগুলো

টাকা সুদ দিয়ো না। এসবই, হুজুর, ওনাদের ভালো লাগতো না।' একটু থেমে আবার শুরু করলো, 'আর ঠিকই তো, হুজুর। মজুররা বিগড়ে গেলে ক্ষেত-খামারে যে লোকসান হয়, কে তা সইবে? আর ক্ষেতমজুর ছাড়া, চাষের কাজ হয় না-কি?'

দারোগাবাবু উত্তেজনায় কেঁপে-কেঁপে উঠছেন। বিসু যে কিভাবে মজুরদের ঝুটঝামেলা বাধাবার জন্যে উস্কে বেড়াতো আর তার ফলে জমির মালিকদের যে কত লোকসান সইতে হতো, সেসব জানাবার জন্যে তাঁর ভেতরটা চুলবুল করছে। তোমার নিজের না আছে জমিজমা, তুমি নিজে না কর মজদুরি …তাহলে, মাসিক-মজুরের মামলায় তোমার নাক গলানোর দরকারটাই-বা কি? মনে-মনে বিড়বিড় করলেও তাঁর সেসব কথা মুখে আনা সাহসে কুলালো না।

'হুঁ। এসব ব্যাপার নিয়ে কখনো কি এদের সঙ্গে মারপিট হয়েছিলো? কেউ কি ভয়-টয় দেখিয়েছিলো ওকে?'

'না, হুজুর …কখনও কোনোরকম মারপিট হয়নি। আমি তো বিসুকে খুব করে বোঝাতাম, কিন্তু আমার কোনো কথা শুনলে তো? জোরাভরও বোঝাতেন …ধমক-ধামক দিয়ে বলতেন, দেখ, বিসু …আমার মজুর বিগড়োলে তোকে হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। বিসুও খুব তক্ক করতো …খুব কথা কাটাকাটি হতো জোরাভরের সঙ্গে …কিন্তু, হুজুর, মারপিট তো কখনও হয়নি! আপনাকে সত্যি বলছি, বিসুর গায়ে কেউ কখনও হাত দেয়নি, হুজুর …কোনো-দিন না …'

শেষের কথাগুলো শুনেই উত্তেজনায়-ভরা দারোগাবাবুর টানটান শরীরটা ঢিলে হয়ে গেলো। ওকে সমর্থন করে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, স্যার …কখনও কোনো মারপিট হয়নি।'

'হুঁ!' সাকসেনা দারোগাবাবুর সমর্থন পেতেই হীরার শেষ কথাগুলোর তলায় দাগ দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, বলো তো, যেদিন ওর লাস পাওয়া গেলো, ঠিক তার আগের দিন কারো সঙ্গে ওর কোনো ঝগড়া হয়েছিলো বা তেমন কিছু শুনেছিলে? …ঘরে …বাইরে অথবা জোরাভরের সঙ্গে?'

'না হুজুর, কারো সঙ্গে নয়, ও তো ঝগড়াঝাঁটি ছেড়েই দিয়েছিলো। সেই যবে হরিজন-বস্তিতে আগুন লেগেছিলো হুজুর, সেদিন থেকেই ও কারো সঙ্গে কোনো ঝগড়া করতো না। শুধু ভেতরে-ভেতরে গুমরে মরতো। কাঁদতো, হুজুর …বড্ড কাঁদতো। কখনো-কখনো সারারাত ছটফট করতো হুজুর, আর কি বলব, হুজুর, ভেতরে-ভেতরে বড্ড ফুঁসতো। এত বড় কাণ্ড ঘটে গেলো, অথচ পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করলো না?' আবার একটু থেমে বললো, 'ওর মনটা ভারি নরম ছিলো, হুজুর।'

'হুঁ, আচ্ছা ঐদিন ও কি-কি করেছিলো ? কোথায়-কোথায় গিয়েছিলো ? আর কার-কার সঙ্গেই-বা ওর দেখা হয়েছিলো ?'

'দুপুর অব্দি তো বিন্দার ওখানে ছিলো হুজুর, সেখান থেকে মাঠে যায় তারপর বিন্দা শহরে চলে যায়। ও বাড়ি ফিরে আসে। তারপর সন্ধ্যের সময়ে বেড়িয়ে রাতে ফিরে এসেছিলো। কি-জানি কোথায় গিয়েছিলো হুজুর ? আমি ওকে কখনও কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না।'

'রাতে যখন ফেরে তখন ওর শরীর ঠিক ছিলো তো ?'

'ঠিকই তো ছিলো, হুজুর ?'

'রাতে খেয়েছিলো ?'

'রাতের বেলা ও খেতো না, হুজুর। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই ওর পেটটা একদম ভালো যেতো না ...। দু'-বার খাওয়া ওর হজম হতো না।'

'তুমি ওকে শুতে দেখেছিলে ?'

'হ্যাঁ, হুজুর। বাইরে খোলা উঠোনে শুয়েছিলো।'

'রাতে ওকে বাইরে যেতে বা বাড়িতে কাউকে আসতে দেখেছিলে ?'

'না হুজুর !'

'কোনো ধরনের আওয়াজ ...কথাবার্তা বা চেঁচামেচি শুনেছিলে কি ? মানে এমন কিছু যাতে মনে হয় বিশুকে কেউ তুলে নিয়ে চলে গেছে বা ...?'

'না হুজুর, কিছু দেখিও নি আর শুনিও নি। আমার সামনে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লো আর সকালবেলা যোগেশর সাহু আমাকে ঘুম থেকে তুলে বললো, সাঁকোর ধারে ওর লাশ পাওয়া গেছে ! কখন গেলো ...কিভাবে গেলো... কিছু জানি না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ...।' ভারি হয়ে এলো হীরার গলা। সে আর কিছু বলতে পারলো না।

সাকসেনা একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি মনে হয়, ...বিশু কিভাবে মরেছে ?' বলেই হীরার মুখের পানে চাইলেন সাকসেনা। দারোগাবাবুও গলা বাড়িয়ে একটু এগিয়ে বসলেন।

কাঁপা গলায় জবাব দিলো হীরা, 'আমি তার কি জানি হুজুর ...কিন্তু এটুকু জানি আমার বিশু সাধারণভাবে মরেনি। নিশ্চয়ই আমার বিশুকে কেউ খুন করিয়েছে।'

দারোগাবাবু মুখে কিছু বলতে না পেরে উত্তেজনায় মুখ বিকৃত করলেন।

'তোমার কাউকে সন্দেহ হয় ?' এক সিধেসাধা ম্যারপ্যাচহীন প্রশ্ন করলেন সাকসেনা। দারোগাবাবুর গলা আর একটু এগিয়ে এলো।

'বলো, ভয় পেয়ো না, কাউকে যদি সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে তার নামটা বলো।'

'কি বলি হুজুর …কিন্তু সারা গাঁয়ের লোক …' থেমে গেলো হীরা !

'বলো, বলো …বলে ফেলো…।' সাহস যোগালেন সাকসেনা।

'সারা গাঁয়ের লোক জোরাবর সিং-এর নাম করছে, হুজুর।'

না, আর চুপ করে থাকা যায় না, পেটের মধ্যে যে কথাগুলো এতক্ষণ চুলবুল করছিলো, সেগুলো বলতে গিয়েই সাকসেনার চোখে চোখ পড়ে গেলো দারোগাবাবুর। তাই একটু সহজ স্বরে ফোঁক দেবার ভাষায় বললেন, 'নিজের কথা বলো বাপু, নিজের কথা। গাঁয়ের লোকদের কথা তারাই বলুক। তোমাকে …।'

হাতটা একটু তুলে দারোগাবাবুকে থামিয়ে দিলেন সাকসেনা। আর দারোগাবাবুও কথাগুলো টকাস্ করে গিলে ফেলে মনে-মনে গালাগালি দিয়ে সাকসেনার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন।

'তোমারও কি জোরাবরকে সন্দেহ হয় ?'

'আমি আর কি সন্দেহ করব হুজুর ? চোখেই দেখিনি, তো কার নাম করব ? আর এখন নাম করেই বা হবে কি হুজুর ? আমার বিশু তো চলে গেলো… কোলে-পিঠে মানুষ-করা জোয়ান ছেলেটা …আমার বাপধন …।' হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ফুলে-ফুলে কেঁদে উঠলো হীরা। গনেশী তার পিঠে হাত রাখলো আর সাকসেনার ইশারায় কনস্টেবল আবার এক গ্লাস জল এনে দিলো।

সাকসেনা লিখতে লাগলেন আর দারোগাবাবু মনে-মনে ফুঁসতে লাগলেন। এজাহার নেওয়ার নামে বুড়োকে দিয়ে ঝাড়া চার ঘণ্টা ধরে যেন পুরাণ পাঠ করানো হচ্ছে। আর, সে নিজে যদি একটা কথা কয়, তবে ইশারায় এমন মোক্ষম লেঙ্গি মেরে তাকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে যে কি বলব ! তার নিজেরই জায়গায় এই শালা এস. পি. তাকে গাধা বানিয়ে ছেড়ে দিলো ! এত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এজাহার নিলে, লোক উল্টো-পাল্টা সব বলবে। মনে হচ্ছে গাঁয়ের লোকদের পাল্লায় এর আগে পড়েনি। জানে না তো, একটু লাই পেলে এরা শিখে মাথায় গিয়ে চড়ে ? বুটের ডগাই হচ্ছে এদের আসল জায়গা। এখনো তো বিন্দা আসেনি, সে এলে না-জানি আরো কি-কি খেল্ দেখাবে !

ফাইল থেকে মাথা তুলে সাকসেনা বললেন, 'আচ্ছা, তুমি বাপু এখন যাও।' তারপর যেন একটু সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'দেখো, আমার দিক থেকে আমি সমস্ত চেষ্টা করব… খুব ভালোভাবেই তদন্ত করব …শুধু একটু ধৈর্য ধরো। বিশু কিভাবে মারা গিয়েছে, এটা আমি তদন্ত করে ঠিক বার করব।'

সাকসেনার এই আশ্বাসে দারোগাবাবুর মনে হলো কে-যেন তাঁর গলায় ফাঁস জড়িয়ে দিয়েছে।

উঠতে-উঠতে হীরা ভাঙা-ভাঙা স্বরে বললো, 'হুজুরের অনেক দয়া !' তারপর

একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে বললো, 'এখন জেনে ফেলে হবেই-বা কি? আমার বিশু তো আর ফিরে আসবে না! আর সে আসবে না ...ও তো চিরকালের মতো চলে গেছে ...।' আবার হাতায় চোখের জল পুঁছতে-পুঁছতে পলেশীর হাতে ভর দিয়ে হীরা ধীরে-ধীরে বাইরে চলে গেলো।

হীরা চলে যেতেই সাকসেনা চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে চোখ বুজলেন। দেখে ক্লান্ত মনে হলো। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন দারোগাবাবু। একটু বাদে চটকা ভেঙে যেতেই, হাতটা তুলে ঘড়ি দেখলেন সাকসেনা। তারপর কিছু একটা ভাবতে-ভাবতে বললেন, 'বিন্দার এজাহার আগামীকালের জন্যে মুলতবি রাখা যাক। আজ তো এলোও না, আর ...।'

'ও কালও আসবে না, স্যার! যদি বলেন তো আজ আবার লোক পাঠিয়ে দিই? কিন্তু সে আসবে না। ডেকে পাঠালেও যদি না আসে, তবে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ও ব্যাটার কোনো কিছুতে ভয়ডর নেই। আমি আগেই বলেছি, খুব বিপজ্জনক।'

'ঠিক আছে। কাল ওসব দেখা যাবে।' বিন্দার বেপরোয়া ভাবের কথা শুনে একটুকু বিচলিত হলেন না সাকসেনা। ওঁর সঙ্গে যে কনস্টেবল এসেছে তাকে ফাইলপত্তর তুলে ফেলতে হুকুম দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'এ কি স্যার! দুপুরে খাবেন না?'

'না, এখানে খাব না।'

'এ কি করে হয় স্যার? আপনার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করে ফেলেছি স্যার! এমনিতেই শহর পৌঁছাতে বেলা হয়ে যাবে। আর গরমও তো পড়েছে স্যার ...শরীর-টরীর ...'

'না-না, এমন কি-আর দেরি হবে —মিনিট চল্লিশের মধ্যেই পৌঁছে যাব। খাওয়া-দাওয়ার পর বেরোতে তো আরো কষ্ট হবে।'

'তাহলে একটু বিশ্রাম করে নিন স্যার। খাওয়ার আয়োজন পঞ্চায়েত অফিসেই হয়েছে। ওখানে প্রধানের বাড়িতে আপনার শোওয়ার ব্যবস্থাও ঠিক আছে। প্রধান খুব খুশি হবেন, স্যার!'

সাকসেনা একটু চুপ করে কি-যেন ভাবতে লাগলেন। দারোগাবাবু খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন, 'চলুন স্যার। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব। দু-আড়াই মাইল তো রাস্তা। স্যার, আপনি যদি দয়া করে একটু পদধূলি দেন তাহলে আমরা খুব খুশি হব। গ্রামের লোকও খুশি হবে। এজাহার নেওয়ার জন্যে আপনি যে স্বয়ং এসেছেন, তাতেই গাঁয়ে একটা খুশির ঢেউ পড়ে গেছে। আপনি নিজের চোখে সেসব যদি দেখেন ...'

আগ্রহের আতিশয্যে দারোগাবাবু ঐ এক কথাই বলে যেতে লাগলেন।

'না ভাই, আজ তো হয়ে উঠবে না। কিছু জরুরী কাজও আছে।' তারপর সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'এখন দু-তিন দিন তো রোজই আসতে হবে। অন্তত একদিন খাওয়া যাবে।'

ফাইলপত্তরগুলো গোছানো হয়ে গেলে বাইরের বারান্দায় পা বাড়ালেন সাকসেনা। ওখান থেকেই তাঁর চোখে পড়লো দূরে গাছের তলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকজন গনেশী আর হীরার কাছ ঘেঁসে বসে রয়েছে। সাকসেনার মুখে হালকা হাসির ছোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো। ধীরেসুস্থে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ওদিকে দারোগাবাবু সাকসেনার সঙ্গে সঙ্গে লেফট-রাইট করতে-করতে চলেছেন। জীপে উঠে বসে সাকসেনা জানালেন, 'দেখুন, বিন্দার কাছে লোক পাঠাতে হবে না। কাল আমি নিজে এসে লোক পাঠাবো।'

দারোগাবাবু সাকসেনার আদেশ হজম করার আগেই পাল্টা আরেকটা আদেশ তাঁর কানে এলো—অফিসার-সুলভ মেজাজে, চড়া গলায়, 'বিন্দার এজাহার নেবার সময়ে আমি আর সে ছাড়া আর কেউ ঘরে থাকবে না!' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জীপ স্টার্ট হয়ে গেলো।

একটা খিস্তি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলো। কোনোরকমে নিজেকে সামলে, দারোগাবাবু যন্ত্রের মতো জোরদার এক স্যালুট ঠুকলেন, আর জীপ রাস্তা দিয়ে মিলিয়ে যাওয়া অব্দি ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

একরাশ ধুলো উড়িয়ে জীপ থানার চৌহদ্দি পার হয়ে যেতেই, পুরো শরীরটাকে একদম ঢিলে করে দিয়ে দারোগাবাবু বগলে গুঁজে-রাখা বেটনটাকে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে শূন্যে দু-তিনবার বাঁই-বাঁই করে ঘোরালেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনে পড়ে-থাকা একটা ইটের টুকরোয় জোরসে লাথি কষালেন, 'বিন্দার এজাহার আমি একলা নেব …শুয়োরের বাচ্চা!'

কাল সরোহা থেকে ফেরার পর থেকেই সাকসেনার মধ্যে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। ডি. আই. জি. যখন তাঁকে নিজে ডেকে এই কাজের ভার দিয়েছিলেন, তখন তিনি একটু অবাকই হয়েছিলেন। সাধারণত কোনো গাঁয়ে গিয়ে এজাহার নেওয়ার মধ্যে আহামরি কোনো ব্যাপার নেই। আর এস. পি.-রা এ রকম তুচ্ছ কাজের জন্যে গ্রামে যান না। দারোগারাই সব সামলে নেয়। কিন্তু সরোহা এখন আর সাধারণ কোনো গ্রাম নয়। আর তাই এ কাজটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।

'শুনেছি আতঙ্ক-সৃষ্টিকারী পুলিশি মানসিকতা তোমার নেই। খুব ভালো। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, আর এ কারণেই তোমার ওপর এ কাজের ভার তুলে দিলাম। তুমি নতুন করে গাঁয়ের লোকদের এজাহার নাও। তাদের সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলো, যাতে তাদের মনে বল আসে, ভরসা জাগে ...মনের কথা নিঃসংকোচে তারা বলতে পারে। ওদের আস্থা আমাদের অর্জন করতেই হবে।'

পুলকিত, কৃতজ্ঞতায় অভিভূত সাকসেনা 'ইয়েস স্যার' বলে ফেলেছিলেন।

'কোনো লোকের সঙ্গে কোনোরকম কঠোর ব্যবহার যেন না করা হয়।' এই নির্দেশ দিয়ে দা-সাহেব তাঁর কথা শেষ করতেই সাকসেনার মনে সাহস ও মনোবলের সঞ্চার হলো। যখন ফিরে এলেন, তখন মনে একটা উল্লাসের অনুভূতি। দা-সাহেবের একটা কথা থেকে-থেকে মনে অনুরণন তুলছে। বেচারি সাকসেনা! আজ অব্দি ওঁর অ-পুলিশি মনোভাবের জন্যে ওঁকে শুধু লোকসানের বোঝাই বয়ে বেড়াতে হয়েছে। যাক্, আজ গুণের কদর করার মতো অন্তত একজনকে পাওয়া গেলো। আর যখন পাওয়া গেছে, তখন যোগ্যতা প্রমাণ করে তবে ছাড়বেন!

আজকালকার এই ইঁদুর-দৌড়ে এত পেছনে পড়ে আছেন সাকসেনা যে নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কোনো আশা পোষণ করাও ছেড়ে দিয়েছেন। এই তো ক'দিন আগে, সরকারি নীতি-পদ্ধতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে যেভাবে আই. জি.-কে বদলি করা হলো, তাতে পুলিশ বিভাগে বেশ একটা হৈচৈ পড়ে গেছে। এখন সকলের চাকরিই অনিশ্চয়তার এক সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে। তবুও সুযোগ পেলে সিঁড়ির এক ধাপ ওপরে ওঠবার লড়াইয়ে কেউ পিছপা নয়। এই এক সাকসেনাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে রেখেছেন —এস. পি. আছো, আর রিটায়ার নেওয়ার সময়েও ঐ এস. পি.-ই থাকবে। কি আর করা যাবে? এ তাঁর অক্ষমতা, অথবা বলা উচিত, সবাইকে খুশি করার মতো মানসিক ক্ষমতা তাঁর নেই। আর এজন্যেই দা-সাহেবের কথায় সাকসেনা খুশিতে ডগমগ না হলেও, তাঁর মনের কোণে একটা আশার আলো দেখা দিলো।

ফিরে এসে ডি. আই. জি.-কে তিনি সমস্ত কথাই বললেন, কিন্তু ডি. আই. জি.-র তাতে কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না। তিনি শুধু বললেন, 'আমি এই কেসের কাগজপত্র সব খুঁটিয়ে পড়েছি আর রিপোর্টও প্রায় তৈরি —ইট্‌স্ আ ক্লিয়ার কেস অব সুইসাইড। আপনি এই রিপোর্টটা পড়ে দেখুন। যদি ছোট খাটো কোনো রদবদল প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে করে ফেলুন। অবশ্য আমার মনে হয় তারও কোনো দরকার নেই। কিন্তু এজাহার সকলেরই নিন এবং পুরো এজাহারই নিন। গাঁয়ের লোকদের মনে যেন পুরো বিশ্বাস জন্মায় যে তাদের সব কথাই শোনা হয়েছে।' কথাগুলো শুনেই সাকসেনার সব উৎসাহ নিভে গেলো!

রিপোর্ট যদি তৈরিই হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাঁর ওখানে যাওয়ারই-বা আর দরকার কি? শুধু ব্লটিং পেপারের মতো সাক্ষীদের উপরে যাওয়া কথাগুলো শুষে নিয়ে আসতে হবে? আর তাও এমনভাবে যাতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব —"ইট্‌স্ আ ক্লিয়ার কেস অব স্যুইসাইড!"

সাকসেনার নিষ্প্রভ মুখ ডি. আই. জি.-র চোখ এড়ালো না। নিজের নির্দেশ একটু সংশোধন করে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য যদি কোনো নতুন তথ্য জানতে পারা যায় ...সামথিং ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, দেন য়ু উইল কনসিডার!'

এই আদেশ এবং এই সংশোধনী —এ দু'য়ের অর্থই সাকসেনার খুব পরিচিত। ঠিক আছে। তিনি এবার তাই করে আসবেন। কল্পনা-জল্পনার আবর্তে পড়ে তিনি সারাজীবনই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর লাভটা কি হয়েছে? শুধু অপরের কাছ থেকে ঠোকর খেয়েছেন। এবার তিনি দা-সাহেব, ডি. আই. জি.-র নির্দেশ মতোই কাজ করবেন। সন্ধ্যেবেলা একা-একা বসে পেগ দু'য়েক অ্যালকোহল চড়াতেই মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো আর সঙ্গেসঙ্গেই তিনি মন থেকে সমস্ত ক্লান্তি-অবসাদ দূরে সরিয়ে ফেললেন। পুলিশের লোকের কাছে একটা কথাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইচ্ছেমতো মানে করা তো নিতান্তই ছেলেখেলা। অথচ সাদা মন নিয়েই তিনি কাল সরোহায় গিয়েছিলেন। কিন্তু হীরার এজাহার নিয়ে তিনি যখন ফিরে এলেন, তাঁর মনের গভীরে এক অদ্ভুত মমত্ববোধ জেগে উঠলো! মহেশের সেই কথাটি —"শুধু এইটুকু বিশ্বাস করুন স্যার, আমাদের সবার বেঁচে থাকার ওপর একটা প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়ে ও মরে গেলো।" মহেশের এই একটি কথাই এখন তাঁর সামনে অসংখ্য প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরেছে। "আমার বিশুর গায়ের চামড়া বড় মোলায়েম ...বড় নরম ছিলো হুজুর," হীরার এই কথাগুলোও, দু'দিন আগে তাঁর নিজের দেহে লাগানো পলস্তরাকে ঝেড়ে ফেলে দিলো। না, বিশু আত্মহত্যা করেনি। আত্মহত্যা ও কখনই করতে পারতো না, তাই বোধহয় ওকে খুন করতে হলো। যাই হোক, তিনি এ ঘটনার শেষ না দেখে ছাড়বেন না; তাতে যা হবার হবে। কিন্তু সাকসেনা সকাল-সকাল সরোহা যাওয়ার আগেই ডি. আই. জি.-র ফোন পেলেন —'আই মাস্ট কনগ্র্যাচুলেট য়ু সাকসেনা। গতকাল আপনার কাজের, আপনার ব্যবহারের রিঅ্যাক্‌শন গ্রামে খুব ভালো হয়েছে। গ্রামের মানুষজন দারুন খুশি।'

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'দা-সাহেবও খুশি হয়েছেন। গো অ্যাহেড।'

'থ্যাঙ্ক য়ু স্যার!' সাকসেনা রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ আগের সঙ্কল্পে একটা চিড় দেখা দিলো। তাহলে তাঁর কাজের এবং গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়ার খবর দা-সাহেবের কাছে পৌঁছে গেছে? দা-সাহেবের এই বিস্তাসটি

যে অত্যন্ত নিপুণ তা সাকসেনা জানেন। প্রদেশের কোথায় কখন কি ঘটছে তার বিশদ সংবাদ দা-সাহেব রাখেন। মনে হচ্ছে তিনি খুশিই হয়েছেন আর যদি তাঁর এই মনোভাব অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে তো সাকসেনার ব্যক্তিগত জীবনেও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই হীরার করুণ মুখ… মহেশের অশ্রুসজল দু'খানি চোখ তাঁর সামনে ভেসে উঠলো। 'ও গড' বলে তিনি সমস্ত দুশ্চিন্তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং সরোহা যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সারাটা পথ তিনি বিন্দার কথা ভাবতে-ভাবতে চললেন। আজও যদি ও না আসে তাহলে? কড়াকড়ি করা তো চলবে না, অথচ ওকে হাজির তো করতেই হবে। দারোগাবাবুর মতে, বিন্দা একজন বিপজ্জনক লোক আর হীরার ধারণা, সে বিসুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গতকাল বিন্দাকে আবার না ডেকে পাঠাবার জন্যে দারোগাবাবুকে যে তিনি নিষেধ করেছিলেন, এখন মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই করেছেন।

আজ তিনিই ওকে ডেকে আনতে লোক পাঠাবেন।

কিন্তু এ সমস্ত কিছুই করার প্রয়োজন হলো না। থানার কম্পাউণ্ডের ভেতর জীপ ঢুকতেই দারোগাবাবু এক বিরাট স্যালুট ঠুকে ঠোঁটের ওপর আড়াই ইঞ্চি হাসি ছড়িয়ে জানালেন, 'বিন্দা এসে গেছে স্যার। কাল আমি নিজেই তার কাছে গিয়ে এমন ধমক দিয়ে এসেছিলাম যে, আজ ব্যাটা সুড়সুড় করে এসে হাজির হয়েছে। হুজুর আপনি একটু কড়া হোন। এমনিতেই আমার ধমকানিতে অনেকটা সিধে হয়ে গেছে। কিন্তু ওর ওপর ভরসা করা মুশকিল …।' তারপর একটু সঙ্কোচমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, 'ভাবছিলাম, ওর এজাহার নেবার সময়ে আমার থাকাটা প্রয়োজন স্যার …একটু কন্ট্রোলে থাকবে।'

সাকসেনা কোনো উত্তর দিলেন না, শুধু ধারালো দৃষ্টি দিয়ে একবার দারোগাবাবুকে দেখলেন। তারপর দূরে বসে-থাকা জটলার দিকে চোখ ফেরালেন। গতকালের মতো আজও অনেক লোক এসেছে এবং তারা যেন তাঁকেই দেখছে। পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করলেন সাকসেনা। না, তেমন কিছু নয়। আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি। চেয়ারে বসে আজ যাদের এজাহার নেবার কথা তাদের নামগুলোর ওপর হালকা নজর বুলালেন এবং ইশারায় জানালেন, 'এবার কাজ শুরু হোক।' বিন্দার নাম হাঁক পাড়তে-পাড়তে চৌকিদার দৌড়ে বাইরে চলে গেলো। সাকসেনা বললেন, 'আপনারা বাইরে বসুন। বিন্দার এজাহার আমি একাই নেব।' কনস্টেবল দু'জন নিমেষে বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরি, কিন্তু দারোগাবাবু সাহস করে আবার বললেন, 'স্যার, দেখুন… ও বড় ঠ্যাটা …।'

ঠ্যাটা লোককে কি করে সায়েস্তা করতে হয় সে বিদ্যা সাকসেনার জানা আছে।

বাইরে যান আপনি।' কণ্ঠস্বরে কঠোরতা না থাকলেও কথাটা শুনেই দারোগাবাবুর ভেতরটা জ্বলে উঠলো। এস. পি. তাকে ভেবেছে-টা কি?... অন্তত সে তো এই গ্রামেরই দারোগা, আর তাকে এমনভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে যেন সে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে-থাকা কোনো লোচ্চা-লোফার! ঘর থেকে বেরোবার সময়ে দারোগাবাবু সৌজন্যমূলক হাসিটুকু পর্যন্ত ফোটাতে পারলেন না, রাগে তাঁর গোঁফের বাঁ কোণটুকু শুধু কাঁপছিলো।

চৌকিদারের সঙ্গে বিন্দা এলো, সঙ্গে বাইশ-চব্বিশ বছরের এক মহিলা। নমস্কার-টমস্কারের কোনো বালাই নেই—পাথরের মতো শক্ত মুখ নিয়ে দরজার কাছে বিন্দা দাঁড়িয়ে। সাকসেনা অপলক দৃষ্টিতে তাকে দেখছিলেন। শ্যামবর্ণ। তীক্ষ্ণ নাক-চোখ এবং সুগঠিত দেহ। মুখমণ্ডলে ভয় বা ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। আছে শুধু একরাশ ঔদাসীন্য। সাকসেনার ওপর চোখ পড়তেই বিন্দা ফট করে একদলা থুতু ফেলে বসলো। তার কাণ্ড দেখে চৌকিদার ধমকে উঠলো, 'এ্যাই। সাহেবের সামনে কি করছিস?'

'কেন, থুতু ফেলাও মানা না-কি?'

চৌকিদার কিছু বলার আগেই সাকসেনা বললেন, 'ভেতরে এসো।' তারপর হাতের বেটন দিয়ে চৌকিদারকে বাইরে যাবার ইশারা করলেন।

'এ-ও আসবে! এক মিনিটের জন্যেও আমায় একলা ছাড়ছে না!' তারপর গজ্‌গজ করতে-করতে বললো, 'যেন কেউ আমায় জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।'

'তোমার স্ত্রী?'

এবার মহিলাটি ঘাড় নাড়লো। তার করুণ মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো, সে যেন অত্যন্ত কাতরভাবে কিছু মিনতি জানাচ্ছে। একটু সরে গিয়ে সে বিন্দার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

'ঠিক আছে। ওকেও আসতে দাও।'

'তোমার নামই বিন্দা?'

'বিন্দেশ্বরী প্রসাদ।' প্রতিটি অক্ষরের ওপর জোর দিয়ে প্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে জবাব দিলো ও। কেন জানি না বিন্দার এই উচ্চারণ-ভঙ্গি সাকসেনার কাছে যেন একটা চ্যালেঞ্জের মতো মনে হলো!

'কাল তোমার এজাহার দেবার কথা ছিলো অথচ তুমি এলে না। কেন?'

বিন্দা কিছু বলার আগেই রুক্মা বললো, 'ওর শরীরটা ভালো ছিলো না। জ্বর বেড়ে গিয়েছিলো, তাই কেমন করে আসবে?'

'মিথ্যা কথা বলবি না। ভরাই না-কি কাউকে?' বিন্দা ধমকে উঠলো, তারপর বললো, 'হ্যাঁ, আসিনি। এজাহার দিয়ে হবে-টা কি? এসব নাটকবাজি

করে লাভটাই-বা কি হচ্ছে? ফল তো তাই হবে যা দা-সাহেব বলে গেছেন।'

'তাহলে আজই বা এলে কেন?' সাকসেনার কণ্ঠে যেন ব্যঙ্গের হালকা ছোঁয়া। কথাটা কানে যেতেই বিন্দা দপ্ করে জ্বলে উঠলো, 'আজও আসতাম না যদি না কাকা আমাকে দিব্যি খাওয়াতেন।'

'কাকা কে?'

'হীরা কাকা। চেনেন না? উনি তো আজকাল আপনাদের বেয়াই হয়ে উঠেছেন। যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখি ধুতির কোঁচা তুলে সকলে হীরা কাকার কাছে ছুটছে।' বিন্দার কণ্ঠে এমন এক ঘৃণার মনোভাব যা শোনামাত্র সামনে বসে-থাকা মানুষের গায়ে জ্বালা ধরবে, কিন্তু সাকসেনার ওপর তার কোনো প্রতিক্রিয়াই পড়লো না। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে বললেন, 'সরকারি আদেশ পাবার পরও না আসাটা যে অপরাধ সে কথা তুমি জানো?'

'অপরাধ?' বিন্দার চোখে যেন আগুনের হল্কা। 'কাকে অপরাধ বলে, সে জ্ঞান কি আজও আপনাদের আছে? আপনাদের চোখে গুরুতর অপরাধও তো অপরাধ বলে মনে হয় না। জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা, মানুষ খুন করা তো আপনাদের চোখে অপরাধই নয়।' বিন্দার চোখের শিরাগুলো লাল হয়ে উঠলো, দপ্ দপ্ করতে লাগলো রগের শিরাগুলো। বিন্দার উত্তেজনাকে একটু সংযত করার জন্যে রুক্মা বিন্দার বাহু-দু'টো আঁকড়ে ধরলো, গভীর আতঙ্কে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। সাকসেনা কিন্তু নির্বিকার।

'আছে বলেই তো এখানে বসে তদন্ত করছি।'

'তদন্ত কেন বলছেন। বলুন আমাদের সকলকে বোকা বানাচ্ছেন।' কথাটা বলার সঙ্গেসঙ্গেই বিন্দার মুখের আলো আর গলার স্বর যেন নিস্তেজ হয়ে এলো। মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো, 'গ্রামবাসীদের সঙ্গে আপনি কেন মিছিমিছি তামাসা করছেন? দা-সাহেব থেকে শুরু করে আপনি পর্যন্ত সকলেই রাজনীতির দাবাখেলায় বিসুর মৃত্যুকে ঘুঁটি করে বেশ খেলা খেলে যাচ্ছেন। তাই তো এত তোড়জোড়ের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে, আদর করে ডেকে-ডেকে এজাহার নেওয়া হচ্ছে। ফল তো হবে অষ্টরম্ভা।' তারপর কণ্ঠস্বর হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়ে বলে উঠলো, 'আপনাদের সকলের কি হয়েছে ...কারো কি ধর্ম-অধর্ম বোধটুকুও আর নেই? ধিক্! ধিক্ সকলকে!'

'বিন্দা!' দৃঢ়তা আর কঠোরতায় মেশানো হাকিমি মেজাজ ঝরে পড়লো সাকসেনার গলা থেকে, 'মনে রেখো, এটা থানা। পাগলা গারদ নয়।'

'দু'টোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আপনারা রেখেছেন না-কি? থানায় যা ঘটে তার মাথামুণ্ডু আপনারা কিছু বোঝেন না-কি?' বিন্দার সারা শরীর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

ওদিকে সাকসেনার মুখ এবং কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠলো। কড়া গলায় তিনি ধমকে উঠলেন, 'বাজে বকা বন্ধ করে একটু সময়ে চলার চেষ্টা কর।'

সাকসেনার প্রচণ্ড ধমক শুনে রুক্মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, 'চুপ কর, চুপ কর।'

রুক্মাকে এক ঝটকা মেরে পাশে সরিয়ে দিয়ে বিন্দা তার ওপরই ঝাল ঝাড়লো, 'চোখের জল ফেলিস না হারামজাদি। তোর চোখের জল দেখে আমার বুকের আগুন যদি নিভে যায়, তাহলে আমিও আর সকলের মতো হিজড়ে হয়ে যাব। আমাকে এখন এদের সকলের সঙ্গে ফয়সালা করতে হবে ···এক-এক করে ফয়সালা করতে হবে।'

ভেতরে গোলমাল শুনে দারোগাবাবু আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। শেষে চট্‌পট ভেতরে ঢুকে পড়লেন। জলন্ত চোখে তিনি বিন্দার পানে চাইলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে জানালেন, 'স্যার। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম···।'

'না তেমন কিছু হয়নি। যান, আপনি বাইরে গিয়ে বসুন!'

দারোগাবাবুর ভেতরটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। বিন্দার চিৎকার শুনে তাঁর মনে আনন্দের যে জোয়ার এসেছিলো, সাকসেনার কথা শুনে তাতে ভাটা পড়লো। মনে-মনে বললেন, 'শালা। লোকটা আসলে একটা হিজড়ে! বসে-বসে শুধু ছেচাড়িগুলোর গালাগাল হজম করছে! আমার সামনে এই সমস্ত ফালতু কথা বললে, আমি হারামজাদার পা-দু'টো ধরে চিরে ফেলতাম!

রুক্মা নিজের ঠোঁট দু'টো কষে টিপে রয়েছে এবং সাকসেনা স্থিরদৃষ্টিতে বিন্দার মুখের পানে চেয়ে দেখছেন ···বিন্দার রগের শিরাগুলো তখনো উত্তেজনায় দপদপ করে কাঁপছে। মিনিট দু'য়েক এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য সারা ঘরটাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

'বিন্দা, আমি তোমার সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্রভাবে কথা বলছি এবং আশা করি তুমিও সেইভাবে কথা বলবে।' সাকসেনার হাকিমি কণ্ঠে এমন কিছু ছিলো যার ফলে বিন্দা চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকালেও মুখে কিছু বললো না!

'বিসু তো তোমার বন্ধু ছিলো, প্রাণের বন্ধু?'

'না। দুশমন ছিলো!'

'দুশমন?'

'তা নয়ত কি, যে মাঝপথেই দাগা দিয়ে চলে যায়, আপনি তাকে বন্ধু বলবেন?' বলতে-বলতে তার মুখের সমস্ত ক্রোধ আর উত্তেজনা নিমেষে ধুয়েমুছে গেলো, সারা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লো একরাশ বিষণ্ণতা।

'ও !' সাকসেনার মুখে একটা হালকা স্মিতহাসি ফুটে উঠলো।

'বিসুর মৃত্যুর সঠিক কারণ যাতে জানতে পারা যায় তুমি কি তাই চাও ?'

'আমি চাইলেই বা কি হবে সাহেব ? জোরাওয়রের কেনা গোলাম এই দারোগা রিপোর্ট দাখিল করে দিয়েছে। খোলা মাঠে সভার মাঝখানে দা-সাহেবও ঘোষণা করে গেলেন "বিসু আত্মহত্যা করেছে।" "মশাল" পত্রিকাও সে খবর ছেপেছে। ব্যস্, আপনাদের দিক থেকে সব ব্যাপারটাই চুকেবুকে গেছে! আমি বিশ্বাস করি না ...যতদিন আমার এ দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন আমি বিশ্বাস করব না যে বিসু...।' কথা শেষ করতে পারলো না বিন্দা এবং ঘনঘন ঘাড় নাড়ানোর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হলো তার দৃঢ় অবিশ্বাস।

'কারণ ?'

'কারণ ?' স্থিরদৃষ্টিতে সাকসেনার মুখের দিকে চেয়ে বিন্দা জবাব দিলো, 'যে মানুষ জীবনকে এত ভালোবাসতো ...শুধু নিজের জীবনকেই নয়, সবার জীবনই ছিলো তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ...সে করবে আত্মহত্যা ? না সাহেব, এ অসম্ভব! বিসুকে খুন করা হয়েছে!'

'কিন্তু কে খুন করলো ? কেন ?'

বিন্দার চোখ থেকে আবার যেন আগুনের হল্কা ঝরে পড়লো। রগের শিরাগুলো ফুলে উঠলো, ওকে খুন করা হলো, কারণ ও ছিলো একজন জীবন্ত মানুষ! জীবন্ত কথাটার অর্থ নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন ? আসলে আজকাল মানুষ এ কথাটার মানেই ভুলে গেছে, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।'

একটু থামলো বিন্দা। সাকসেনা একদৃষ্টিতে তার মুখ, তার উত্তেজনা লক্ষ্য করছিলেন। বিন্দা কিন্তু একইভাবে বলে চলেছে, 'যারা এখনো বেঁচে আছে তারাও আর এ দেশে বেঁচে থাকতে পারবে না। সবাইকে শেষ করে দেবে। কুকুরের মতো মৃত্যু! বিসুকে যেমন মেরে ফেলা হলো! ভাবতে-ভাবতে আমার মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার মতো হয়েছে।' বলেই বিন্দা বাস্তবিকই দু'হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরলো।

রুক্মা বিন্দার পিঠে হাত বুলাতে-বুলাতে মিনতি-ভরা চোখে সাকসেনার পানে চাইলো। ওদিকে সাকসেনার মেজাজ ক্রমশঃই বিগড়ে যাচ্ছিলো, কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'দেখো বিন্দা, এ সমস্ত কথা বলতে বা শুনতে বেশ ভালোই লাগে। এসব কথা শুনিয়ে শ্রোতাদের উত্তেজিতও করা যায়, কিন্তু আমি তো পুলিশের লোক। আমার কাছে এ কথাবার্তার কোনো মূল্যই নেই... আইনের চোখে এ সমস্তই অর্থহীন উচ্ছ্বাসমাত্র, বুঝলে ? আমি চাই অকাট্য প্রমাণ। প্রমাণ ছাড়া আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। বিনা প্রমাণে কোনো

নির্দোষীকে যদি গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে ?' সাকসেনার কণ্ঠে শেষ পর্যন্ত একরাশ ক্ষোভ প্রকাশিত হয়ে পড়লো।

'আপনি বলতে চান তাহলে নির্দোষ ব্যক্তিকে ধরা হয় না ? পাঁচ বছর আগে কোন অপরাধে বিসুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো ?' সাকসেনার চোখে চোখ রেখে বিন্দা প্রশ্ন ছুঁড়লো।

'তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিলো।' দায়সারা গোছের একটা উত্তর সাকসেনা দিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই উপলব্ধি করলেন যে তাঁর কণ্ঠস্বরে আগের সেই দৃঢ়তা আর নেই।

'কারণ তো সব ঘটনার পেছনেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব, সাহেব! নিরপরাধকে গ্রেপ্তার করা আর অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার পেছনেও কারণ দেখানো যেতে পারে। এই তো আপনাদের ন্যায়বিচার। এই জন্যেই তো বলছি এ সমস্ত...।

'অনেক বলেছো, আর নয়, বরং এবার আমায় একটু সাহায্য কর।' শুধু এটুকু বলেই, সাকসেনা বাস্তবিক বিন্দাকে থামালেন।

প্রায় মিনিট-দুই চুপচাপ থাকার পর, কণ্ঠস্বরকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলে সাকসেনা বিন্দার চোখের ওপর স্থিরদৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করলেন, 'যে রাতে বিসু মারা যায়, সেদিন দুপুরে ও কি তোমার বাড়ি গিয়েছিলো ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ও কোথায় গিয়েছিলো তুমি জানো ?'

'হ্যাঁ। ও বাড়ি চলে গেলো আর আমি শহরে গেলাম।'

'তুমি শহরে গিয়েছিলে কেন ?'

'বীজ আর সার কেনার দরকার ছিলো। বাজারে কিছু টাকা পাওনা ছিলো। তা আদায় করাও উদ্দেশ্য ছিলো।'

'বিসু কি সেদিন তোমার বাড়িতেই খেয়েছিলো ?'

'হ্যাঁ। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া ও সাধারণত আমাদের ওখানেই করতো। আর প্রতিদানে আমার জমিতে দু-এক ঘণ্টা কাজ করে দিতো। আমি অনেকবার বারণ করেছি, কিন্তু কোনোদিন শোনেনি।'

'হুঁ। তুমিও ওর সঙ্গে খেয়েছিলে, না ও একলা খেয়েছিলো ?'

'আমি ওর সঙ্গে না বসলে, ওর গলা দিয়ে খাবারই নামতো না, সাহেব!'

'আচ্ছা, তোমাদের বন্ধুত্ব তো খুব বেশি দিনের নয়। হীরা বলছিলো মাস আটেক আগে বিসু জেল থেকে ছাড়া পায় এবং তারপর তোমাদের পরিচয় হয়... এতটা ঘনিষ্ঠতা ...?' সাকসেনার চোখে এক বিশেষ ধরনের তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠলো।

কিন্তু বিন্দার সেদিকে নজর নেই, সে বললো, 'মাসের হিসেবে কি যায়-আসে, সাহেব, আসল কথা হলো, মনের মিল। কোনো স্পষ্টবক্তা মানুষের দেখা পেলে

আমি একদিনেই তার গোলাম হয়ে যাব। আজকাল আর সে-ধরনের খাঁটি লোকই বা কোথায় মিলছে, বলুন ?' তারপর পাশে-দাঁড়ানো রুক্মার দিকে চেয়ে বললো, 'আমার বৌকে দেখছেন তো সাহেব—ভীষণ মুখরা আর বদমেজাজি! এ রকম বৌকে কোনো মানুষই বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু আমি করি। শুধু সহ্যই করি তাই নয় সাহেব, শ্রদ্ধাও করি। ওর মনটা আর বাইরেটা, দু'টোই সোনার মতো নির্মল। ও হলো বিসুর প্রকৃত শিষ্যা। কিন্তু বিসুর মৃত্যুর পর থেকে কেমন যেন গুটিয়ে গেছে!'

এসব কথাবার্তা শোনার অভিরুচি সাকসেনার নেই। সুতরাং প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'সেদিন ও যখন তোমার বাড়ি যায়, কি বলেছিলো ও ? ওকে কি বিমর্ষ বা চিন্তিত দেখাচ্ছিলো ? কারো সঙ্গে কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া হয়েছিলো ?'

'আমার সঙ্গেই ঝগড়া হয়েছিলো।'

'তোমার সঙ্গে ? কি ব্যাপারে ?' সাকসেনার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো।

'দিল্লী যাওয়া নিয়ে। যেদিন থেকে ও আগুন লাগানোর ঘটনার প্রমাণ যোগাড় করছিলো, সেদিন থেকেই ও পাগলের মতো আমার পেছনে লেগেছিলো, আমায় দিল্লী নিয়ে যাবে। আমি ওকে বার-বার বলেছি—এ আর কিছু হবার নয়...। যখন সরকার নিজেই সব কিছু ধামাচাপা দিতে চাইছে, তখন তোমার আমার ছোটাছুটি করে লাভটা কি ? যেমন এখানকার সরকার, তেমনি দিল্লীর সরকার। সাহেব, আমি এদের সকলকেই হাড়ে-হাড়ে চিনি। ঐ এক ছিলো শরাবী সরকার[১] আর এই এক পিশাবী সরকার[২]। সব শালাই সমান...।'

'বিন্দা!' সাকসেনা বিন্দাকে থামিয়ে দিলেন। আসল কথায় ফিরে এসে বিন্দা বললো, 'বলেছি তো সাহেব ওর একটাই জিদ চেপেছিলো—"যতক্ষণ না আসল অপরাধীকে ধরিয়ে দিচ্ছি, ততক্ষণ আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারব না, বিন্দা।" কিন্তু তাকে ওরা এমন ঘুম পাড়ালো সাহেব যে ও চাইলেও আর সে ঘুম ভাঙবে না।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো বিন্দা, তারপর বললো, 'সে তো চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লো, সাহেব। কিন্তু নিজের সমস্ত দুশ্চিন্তা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে চলে গেলো। যতদিন না ওর শেষ ইচ্ছা—আসল অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে পারছি, ততদিন আমিও শান্তিতে ঘুমোতে পারবো না...।' এই প্রথম বিন্দার গলা কান্নায় ভিজে উঠলো।

'ও কি-কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলো ? যদি সে রকম জোরালো কোনো প্রমাণ হাতে থাকে তাহলে পুলিশের হাতে তুলে দাও। তারা নতুন করে সমস্ত ঘটনার...।'

১। শরাবী সরকার: ক্ষমতার নেশায় চুর যে সরকার।

২। পিশাবী সরকার: চোখ রাঙালেই যে সরকার কাপড়ে-চোপড়ে পেচ্ছাব করে ফেলে।

'এখানকার পুলিশ কিছু করবে না …কখনই কিছু করবে না। যদি করবার হতো, তাহলে আগেই করতো।'

'কি আবোল-তাবোল বকছ? বিনা প্রমাণে পুলিশের করার কি আছে?'

'কেন, আইন আর পুলিশের হাত তো অনেকদূর প্রসারিত! সে কি শুধু গরিবদের ধরার জন্যে?'

'আইনের চোখে আমির-গরিব বলে কিছু নেই।' সাকসেনা ধমক দিলেন।

'মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে।' বিন্দা খুব জোরে চিৎকার করে উঠলো। চোখের শিরাগুলো উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠলো। 'বুকের ওপর হাত রেখে নিজেকে প্রশ্ন করুন তো, আপনার কথায় কতটা সত্যতা রয়েছে!'

বিন্দার প্রশ্ন শুনে সাকসেনা কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করলেন, তবে তা মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু এ অস্বস্তিকে প্রকাশ হতে দিলেন না। পুরো হাকিমি মেজাজে বললেন, 'বিসুর কেস সম্বন্ধে তুমি কি কোনো প্রমাণ বা সঙ্কেত দিতে পারো, যা আমার কাজে লাগবে?'

বিন্দা অপলক দৃষ্টিতে সাকসেনার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, যেন ও বুঝতে চাইছে সাকসেনা যা বললেন, তা নিছক কথার কথা, না প্রকৃতই তার কোনো অর্থ আছে। তারপর ও ধীরে-ধীরে বললো, 'সেদিন সন্ধ্যে আটটা নাগাদ বিসু পুত্তনের দোকানে বসে চা খেয়েছিলো। ওর সঙ্গে দু'জন অচেনা লোকও ছিলো। পুত্তন বলেছে, সে তাদের এ গ্রামে আগে কখনও দেখেনি! সে দু'জন কারা? কোথা থেকে এসেছিলো …কেন এসেছিলো? এ ব্যাপারে দারোগা পুত্তনের এজাহার পর্যন্ত নিলো না, আর আপনি বলছেন সত্য ঘটনার …!'

'চুপ কর …চুপ কর…।' রুকমা হঠাৎ বিন্দার বাহু দু'টো ঝাঁকিয়ে কেঁদে উঠলো, 'না সাহেব, ও কিছু জানে না, ও সেদিন এখানে ছিলোই না। সাহেব আপনি ওকে এবার ছেড়ে দিন। কেউ যদি ওর সর্বনাশ করে দেয়, তাহলে আমি কোথায়… ?'

'চুপ কর্‌। আর চোখের জল ফেলতে হবে না।' রুকমার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে-করতে বিন্দা ধমক মারলো।

'না, আমি চুপ করবো না …কোনো কথাই বলতে দেবো না …একটা কথাও না …সাহেব, আপনি আমাকে দয়া করুন।'

দারোগা সাহসে ভর করে ঘরে ঢুকে পড়লো।

'স্যার!'

'জল। আমার জন্যে আর ওদের দু'জনের জন্যেও।'

রুকমা জলও খেলো না। হাতজোড় করে কেবল অনুনয়-বিনয় জানাতে লাগলো,

'সাহেব, আর ওকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। এবার ওকে যেতে দিন। আমরা কিছু জানি না।'

'জানেন সাহেব, রুক্মার কাছে বিন্দু ছিলো সাক্ষাৎ ভগবান। ও যখন মারা গেলো, রুক্মা এমন কান্না জুড়ে দিলো, যেন সে আর বাঁচবেই না! আর সেই রুক্মা এখন কি-না বিন্দুর মৃত্যু সম্পর্কে কোনো কথাই আমায় বলতে দেবে না।'

রুক্মার চোখের জলে বিন্দার সমস্ত রাগ আর উত্তেজনা যেন কোথায় ভেসে গেলো। ব্যাকুল কণ্ঠে বিন্দা বললো, 'এমন আতঙ্ক আপনি কোথাও দেখেননি, সাহেব। জোরাভর আর পঞ্চায়েতের কাছে গাঁয়ের মানুষের শুধু জমিজমা, গাই-বলদ, ভিটেমাটিই বাঁধা রয়েছে, তাই নয়। কথা বলার অধিকারও বন্ধক রয়েছে। কেউ টুঁ শব্দটিও করতে পারে না!' বিন্দার গলায় আবার রাগের ছোঁয়া লাগলো, রগের শিরাগুলো থেকে-থেকে কাঁপতে লাগলো, তারপর হঠাৎ ফেটে পড়লো, 'ইচ্ছা করছে, কোদাল দিয়ে জোরাভরকে দু'ফাঁক করে ফেলি। এর জন্যে যদি আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়, তো তুচ্ছ, পরোয়া নেই!'

'এমন কথা বলো না ...ভগবানের দিব্যি আর বলো না। সাহেব, একে যেতে দিন।' বাস্তবিকই রুক্মা এরপর বিন্দার হাত ধরে তাকে টানতে-টানতে দরজার দিকে নিয়ে যেতে শুরু করলো।

দারোগাবাবুর বড় আশা ছিলো, অন্তত এই অসভ্যতার পর সাকসেনা নিশ্চয়ই রাগে ফেটে পড়বেন অথবা তাকে কিছু কেরামতি দেখাবার সুযোগ দেবেন। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। তিনি বিন্দাকে শুধু বললেন, 'ঠিক আছে, আজ তুমি যেতে পারো। কাল কিন্তু তোমায় আবার আসতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি একাই আসবে।'

'তা নয়ত কি? এটা থানা। বেড়াবার জায়গা তো নয় যে কেউ ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আসবে, কেউ বৌকে সঙ্গে নিয়ে আসবে,' দারোগাবাবু ধমকে উঠলেন। তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে সাকসেনার সামনে জল এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'স্যার, চা কি এখুনি আনবো, না আরো একটা জলাহার নেওয়ার পর?'

'পরের জলাহার একটু দেরি করেই নেব। আপনি বাইরে বসুন, দরকার পড়লে ডাকবো।'

দারোগাবাবু চলে যেতেই সাকসেনা তাঁর শরীরটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিলেন। মনে হলো প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনায় তিনি ভুগছেন। যাদের জলাহার দেওয়ার কথা, সেই তালিকায় কোথাও পুত্তনের নাম নেই। তিনি তালিকায় প্রথমে পুত্তনের নামটা লিখলেন, এবং প্রয়োজনীয় কিছু কথা নোট করলেন। তারপর আবার

চেয়ারের গায়ে নিজের শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে, চোখ বুজলেন। বিন্দা এবং রুক্মা চলে গেছে, কিন্তু তবু যেন তাদের কণ্ঠস্বর, তাদের মুখচ্ছবি, তাদের অভিব্যক্তি, তিনি তাঁর চারপাশে অনুভব করছেন।

আরো তিনটে এজাহার নেওয়া হলো, কিন্তু শুধু কাগজ ভর্তিই সার। তৈরি করা প্রশ্ন আর উত্তর থেকে যা পাওয়া গেলো, তাতে এই মামলা এগুবেও না, পেছোবেও না। শুধু এই মামলার ফাইলের ওজন কিছুটা বাড়বে। সাকসেনার মনটা যেন অন্য কোথাও পড়ে রয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও তিনি কাজে মন বসাতে পারছেন না।

শেষে সেদিনের মতো কাজে ইতি টানলেন সাকসেনা। দারোগাবাবুকে বললেন, 'কাল চায়ের দোকানদার পুত্তনকে এজাহার দেবার জন্যে ডেকে পাঠাবেন।'

'পুত্তনকে ?' পুত্তনকে ডাকার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে তা যেন দারোগাবাবুর মাথায় ঢুকলো না। 'ও তো একটা চায়ের দোকান চালায়, স্যার !'

'আমিও তো সে কথাই বললাম। চায়ের দোকানদার পুত্তন। খুব জরুরী।' বলেই সাকসেনা চোখের পলকে উঠে দাঁড়ালেন।

'ঠিক আছে স্যার।' দারোগাবাবু সাকসেনার পেছন-পেছন জীপ পর্যন্ত গেলেন। আজ যখন সাকসেনা চা-ই খেলেন না, তখন তাঁকে দুপুরের খাওয়ার কথা বলার সাহস তাঁর হলো না। এই বিন্দা হতভাগাই সাহেবের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

আজ আর স্টিয়ারিঙের সামনে বসলেন না সাকসেনা, ড্রাইভারের পাশের আসনে বসলেন। গাড়ি স্টার্ট করে থানা কম্পাউণ্ডের বাইরে পৌছালো, ততক্ষণে সাকসেনা গাড়ির সিটে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছেন।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের এই জীপ-ভ্রমণ তাঁর অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে কাটলো। কিন্তু কেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না। বিন্দার ভাবালুতায়-ভরা কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করার মতো বয়স এবং মানসিকতা তিনি তো অনেক দিন আগেই ফেলে এসেছেন। তাছাড়া পুলিশের লোকের কাছে এ ধরনের কথাবার্তা শুধু অর্থহীন উচ্ছ্বাস ছাড়া অন্য কোনো অর্থ বহন করে না। বহুবার, বহুলোকের মুখ থেকে এ জাতীয় প্রলাপ শুনেছেন। কিন্তু কথাবার্তায় না হলেও বিন্দার চেহারায় নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিলো, যা সাকসেনাকে উতলা করেছে। তাঁর চোখের ওপর বিন্দার মুখটা আবার ভেসে উঠলো। এবং হঠাৎই বহু বছরের পরিচিত দিনেশ যেন তাঁর চোখের আঙিনায় এসে দাঁড়ালো। আসলে দিনেশের সঙ্গে বিন্দার মুখের একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে। এবং এতক্ষণ বিন্দা নয়, তার কথাবার্তা নয় ...বরং ফেলে-আসা অতীতের বিভিন্ন ঘটনার তলায় চাপা-পড়ে-থাকা দিনেশই তাঁকে আজ বিচলিত করে তুলেছে।

বিহারিদের সেই আগুন-ঝরানো দিনগুলো সাকসেনার চোখের পর্দায় ভেসে উঠলো। কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা, কী আত্মবিশ্বাসই না ছিলো সেই দিনগুলোতে! হরতাল, শোভাযাত্রা আর স্লোগানের মাঝেই কেটে যেত দিনগুলো আর রাতের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থাতেও হাত দু'টো কেঁপে-কেঁপে উঠতো, হাতের মুঠো দু'টো লাফিয়ে উঠতো শূন্যে। একবার দিনেশ আর তিনি সেক্রেটারিয়েটের ওপরে তেরঙা পতাকা ওড়াবার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তেতলায় পৌঁছেও গিয়েছিলেন। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে পালালেন …দিনেশ যে পেছনে পড়ে রইলো সেকথা ভাবার অবকাশও তাঁর ছিলো না। পুলিশের ভয়ে না প্রাণের মোহে, যে কারণেই হোক, সে কথা চিন্তা করার মতো অবস্থা তাঁর ছিলো না। অথচ তাঁরা এক সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, একই সঙ্গে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর দিনেশের সঙ্গে থাকা উচিত ছিলো। দিনেশ ধরা পড়ে এমন মার খেলো যে তার পাঁজরের সব ক'টা হাড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিলো। এক সপ্তাহ হাসপাতালে কাটাবার পর একদিন ও মারা গেলো। দেওয়ালে মাথা ঠুকে-ঠুকে সাকসেনা কত কেঁদেছিলেন …নিজেকে ক'ত না অভিশাপ দিয়েছিলেন …কতশত ধিক্কার আর লাঞ্ছনায় নিজের নাম ডুবিয়েছিলেন তিনি। কতদিন পর্যন্ত এক গভীর অপরাধবোধ তাঁর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছিলো, তখন তাঁর মনে হতো— দম বন্ধ হয়ে আসছে, তিনি আর বাঁচবেন না! কিন্তু সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত— ভয় এবং লোভের পরিধি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। যখনই হৃদয়ের সমস্ত উল্লাস এবং উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন, ঠিক তখনই, কখনো কোনো আতঙ্ক অথবা কখনো কোনো মোহের বশবর্তী হয়ে কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে পালিয়েছেন —আরো বহুদিন পর্যন্ত অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হবার জন্যে।

জীপ শহরে ঢুকতেই সাকসেনা ড্রাইভারকে বললেন, 'সোজা বাড়ি চলো।' ড্রাইভার গাড়ি ঘোরালো।

অসময়ে গাড়ি আসতে দেখে, শ্রীমতী সাকসেনার প্রাণ অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠলো। কোনো বিপদ হয়নি তো? গ্রামের লোকদের ওপর আজকাল ভরসা রাখাই মুশকিল। এর আগেও এ ধরনের ঘটনার কথা তো তিনি বেশ ক'বারই শুনেছেন। তাই তিনি দ্রুতগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং সাকসেনাকে বহাল তবিয়তে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে?'

'সরোহা থেকে এখানেই আসছি। অফিসে আর যাইনি।'

শুধু একটু শরবৎ খেলেন সাকসেনা। তারপর তাঁর ঠাণ্ডা, অন্ধকার শোবার ঘরে ঢুকে, স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ কোনো কথা না বলেই চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

গত দু'দিন ধরে এজাহার নেওয়ার পর তাঁর আর কোনো দ্বিধা নেই যে, এ ঘটনা আত্মহত্যা নয়, খুন। এ স্লিয়ার কেস অফ্ মার্ডার। কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব

তাঁর ভেতরে জমা হয়েছিলো। তাঁকে কি ডি. আই. জি.-র আদেশ অনুসারে চলতে হবে, না তিনি নিজেই রিপোর্ট তৈরি করবেন? বিন্দার যে কথাগুলোকে নিছক ভাবপ্রবণতায়-ভরা উচ্ছ্বাস বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেই কথাগুলোই এখন তাঁর মাথায় যেন হাতুড়ির আঘাত হেনে চলেছে।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি নিজেকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন। তিনি স্থির করলেন, বরং বলা উচিত তিনি সংকল্পে দৃঢ় হলেন যে, পরিণতি যাই হোক, যেমনই হোক, তিনি এই মামলার শেষ পর্যন্ত যাবেন এবং সমস্ত ঘটনা তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করে তবে ছাড়বেন। শুধু তাই নয়, বিন্দার কাছে যা প্রমাণ রয়েছে, তাতে যদি সামান্যতম আশার আলো থাকে, তাহলে পুলিশের ফাইলের ভেতর চাপা-পড়ে-থাকা এই মামলা তিনি খুঁড়ে বার করবেন।

সন্ধ্যেবেলা তিনি ফোনে ডি. আই. জি.-কে জানালেন, গরমে তাঁর প্রচণ্ড মাথাব্যথা হওয়ায়, তিনি সরোহা থেকে সোজা বাড়ি চলে এসেছেন। তিনি এ কথাও জানালেন যে, এই মামলার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই বদলাতে হবে। মামলা সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিয়েছে।

'আচ্ছা?' বিস্মিত অথচ হিমশীতল কণ্ঠে ডি. আই. জি. প্রশ্ন করলেন এবং তারপরই আদেশ দিলেন, 'কাল যাওয়ার আগে অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আর এজাহারের ফাইলটা আজ রাতেই কারো হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিন ...আই ওয়ান্ট টু গো থ্রু ইট।'

ডি. আই. জি.-র হিমশীতল কণ্ঠস্বর শোনার পরও কিছুক্ষণ আগের দৃঢ় সংকল্প সামান্যতম শিথিল হলো না সাকসেনার। না, এবার তিনি দিনেশকে একলা ছেড়ে যাবেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তার সঙ্গেই থাকবেন।

অষ্টম অধ্যায়

আজ রবিবার। কিন্তু দা-সাহেবের দিনানুদৈনিক কাজকর্মে কোনো পরিবর্তন নেই। রোজকার মতো আজও আকাশ ফর্সা হবার আগেই শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর পায়চারি শুরু করে দিয়েছেন। এই সময়েই পাণ্ডেজী ওঁর কাছে আসেন এবং কিছুদিন ধরে এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের গতি-বিধির খবরাখবর পাণ্ডেজী নিয়ে আসেন আর তার ভিত্তিতে পরের দিনের কার্যক্রম তৈরি হয়। নিজের সজাগ দৃষ্টি আর কুশলী স্বভাবের জন্যে দা-সাহেবের দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠেছেন পাণ্ডেজী। নিষ্ঠা আর উদ্যম মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা যেন লোকে পাণ্ডেজীকে দেখে শেখে। সবার সামনে এখন উদাহরণ হিসেবে দা-সাহেব পাণ্ডেজীর নাম তুলে ধরেন। বলার মতো কোনো পদমর্যাদা অবশ্য তাঁর নেই, কিন্তু যাঁরা বড়-বড় পদে বসে আছেন তাঁরাও পাণ্ডেজীর একটু কৃপাদৃষ্টির জন্যে তাঁর সামনে-পেছনে ঘুর-ঘুর করে বেড়ান। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর আচরণে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার অথবা কথাবার্তায় দম্ভের কণামাত্র প্রকাশ নেই। আর সে কারণেই তিনি এত জনপ্রিয়!

ইদানীং দা-সাহেবের কাছে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় সকালের এই আধ ঘন্টা। এই সময়েই তিনি পাণ্ডেজীর সঙ্গে বিচার-বিবেচনা, শলা-পরামর্শ করে থাকেন। বেশ ভেবেচিন্তে এ সময়টা বার করেছেন দা-সাহেব! সকালে মন-মেজাজ একদম তরতাজা থাকে, আর জটিল, খটোমটো অনেক ব্যাপারও এ সময়ে অত্যন্ত সহজে মাথায় ঢোকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাণ্ডেজীকে বলা আছে, তাঁর যদি তিন-চারটে বিষয়ে কিছু বলার থাকে, তবে সবসময় হালকা বিষয় দিয়েই যেন তিনি শুরু করেন। গুরুগম্ভীর বিষয় একবার মগজে ঢুকলে, মামুলি ব্যাপারগুলোও পরে আর সহজে ঢুকতে চায় না। আর আজকাল তো গোটা-দশেক রাজনৈতিক মোর্চা একা সামলাতে হয়। তিনি কোনোদিন ভাবেনও নি যে নির্বাচনের মামুলি লড়াই লড়তে গিয়ে এতগুলো ফ্রন্টের সঙ্গে লড়তে হবে। এমনিতে পরিস্থিতি এত জটিল হতো না। কিন্তু বিশুর মৃত্যুকে খেলার ঘুঁটি বানিয়ে দেওয়াতেই, অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ যার দিকেই তাকাও, সেই বিশুর মৃত্যুকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে—সে নিজের দলের লোচন বা রাও-ই হোক অথবা বিরোধী-দলের সুকুলবাবুই হোন! ওঁকে সবারই মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এমনিতে দা-সাহেবকে বড়-একটা উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায় না, তবুও সদা-সর্বদা সজাগ, হুঁশিয়ার হয়ে থাকতেই হয়, আর এই সবসময় মাত্রাতিরিক্ত সাবধানতা মানুষকে শ্রান্ত করে তোলে।

আকাশ বেশ খানিকটা ফর্সা হবার পরেও যখন পাণ্ডেজী এলেন না, তখন দা-সাহেব ভেতরে চলে গেলেন। নিশ্চয় কোথাও আটকে গেছেন কিংবা হয়ত সরোহা থেকে রাতে ফিরতেই পারেননি। অনর্থক অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করে কি লাভ? তিনি নাইতে চলে গেলেন। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই দেখেন, পাণ্ডেজী তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন। স্নেহের স্বর ঝরে পড়লো তাঁর গলায়, 'চায়ের কথা বলেছ, না বলতে হবে?'

পাণ্ডেজী জবাব দেবার আগেই, চাকর ট্রেতে চা আর এক গ্লাস দুধ নিয়ে ঢুকলো। দা-সাহেব হেসে বললেন, 'বাঃ, ছোটখাটো কাজেও পাণ্ডে বেশ চোস্ত, হুশিয়ার। কোনো ব্যাপারে গাফিলতি নেই।' আজকাল পাণ্ডেজীকে প্রশংসা করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেন না দা-সাহেব।

লুঙ্গির মতো-করে পরা ধুতিটাকে ঠিক করে কাছা দিয়ে পরে ফরাসে বসে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বলো।'

দা-সাহেবের দিকে দুধের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলেন পাণ্ডেজী। তারপর নিজের কাপে চা ঢালতে-ঢালতে বললেন, 'আগামী সপ্তাহে সুকুলজীর মিছিল বেশ জোরদার হবে বলেই মনে হচ্ছে। তা-ধরুন পঁচাত্তর থেকে আশি হাজার লোক হবে।'

'হুঁ!' কিছু-একটা ভাবতে লাগলেন দা-সাহেব।

'আপনি অনুমতি করলে দু'দিন আগে থেকেই বাস আর ট্রাক ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিই।'

'না!' ঘাড় নাড়লেন দা-সাহেব। বললেন, 'এটা উচিত হবে না। শুধু একটা মিছিলের জন্যে এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করা, শুধু অনৈতিক নয়, বেআইনীও বটে।' একটু থেমে বললেন, 'পুলিশের পুরো ব্যবস্থা থাকা চাই আর তাদের ওপর কড়া নির্দেশ থাকবে যাতে কোনোরকম অশোভনীয় কিছু না ঘটে। প্রজাতন্ত্রে জনতার মিছিল আটকানো যায় না।' এসব ব্যাপারে দা-সাহেবের মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

'ভেবে দেখুন। নির্বাচনের মুখে এতবড় একটা মিছিলের অর্থ কি হতে পারে?' বাতাসের দিক পরিবর্তনের ব্যাপারটা ভেবে দেখলে এই মিছিল প্রভাব বিস্তার তো করতেই পারে।'

'সুকুলবাবুর অনুমান…।'

'সুকুলবাবুর নয়, এটা আমার অনুমান এবং আমি কম করেই ধরেছি। দেখবেন, লাখ-খানেক লোক এসে জুটবে সেদিন!'

'আচ্ছা?'

'দু'বেলা খাওয়া এবং মাথাপিছু নগদ পাঁচ টাকা দেওয়া হবে। ছোটদের জন্যেও নগদ দু'টাকা। ওদের আর লোকসান কি? বিনা খাটনিতে দিব্যি মৌজ করা যাবে। বাচ্চাদের পয়সা আর খাবার তো ফালতু!'

'রাজনীতির স্তর আর মানুষের ভোটের মূল্যকে যদি পাঁচ টাকায় নামিয়ে আনা হয়, তাহলে বুঝতে হবে পরিস্থিতি সত্যিসত্যিই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিই-বা করা যায়?'

'আমি বর্তমান সঙ্কটের কথাই বলছি। এই মিছিলটাকে কোনোভাবে বন্ধ করা সম্ভব বা সঙ্গত হবে কি?'

'তুমি কি চাও আমিও ঐ জায়গায় নেমে যাই? আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া এতে ঘাবড়াবার কি আছে? ভাড়া-করা মানুষের মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন তো সুকুলবাবু গত নির্বাচনেও চালিয়েছিলেন। কি লাভ হয়েছে তাতে? আমরা আমাদের মজবুত কার্যক্রম, নিষ্ঠা আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে চালিয়ে যাব। আমাদের লক্ষ্য কেবল নির্বাচন জেতা নয়, মানুষের অবস্থার উন্নতিই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। কুটির শিল্প যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা লোকদের কাছে পৌঁছে গেছে না? যারা এখনো পায়নি, তাদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর।'

পাণ্ডেজী তো রোজই এই কাজের রিপোর্ট দিয়ে চলেছেন। তাই, তিনি এ প্রশ্নের উত্তর নতুন করে আর দেবার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। দা-সাহেবের কথা শুনে তাঁর নিজের যা করণীয় বলে মনে হলো, সে কথাটাই কেবল জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে মিছিলের ব্যাপারে কোনো বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা চলবে না, তাই তো?'

'হ্যাঁ।' এ সমস্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দা-সাহেব সবসময়ই অনড়। তাই পাণ্ডেজী নতুন এক প্রসঙ্গ শুরু করলেন, 'রাও আর চৌধুরী নিজেদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিপদ চাইছেন—অর্থ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর ওঁদের নজর রয়েছে। আপনি কি দেবেন? যদি রাজি থাকেন তাহলে ওঁরা এখানে আসবেন।'

'কি?' দা-সাহেব যেন তাঁর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই দেখে, পাণ্ডেজী কথাগুলো আবার বললেন।

'মানুষ যখন নিজের সীমা এবং সামর্থ্যের কথা ভুলে গিয়ে কেবলই ওপরে ওঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, তখন ধরে নিতে হবে, সে নিজের কবরের দিকে পা বাড়িয়েছে। ওরা দু'জনেই মহামূর্খ! আর চৌধুরী, ওর যোগ্যতাই-বা কতটুকু? ও যা পেয়েছে, ও তারই যোগ্য নয়।'

'আমি ন'টার সময়ে ওদের আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'রাওকে অবশ্যই কিছু-না-কিছু দিতে হবে! আমি সমস্ত ব্যাপারটা বেশ খুঁটিয়ে দেখেছি। বাপট আর মেহতা এসে গেলেও আমাদের অবস্থা খুব-একটা মজবুত হচ্ছে না, নড়বড়ে ভাবটা কিছুটা থেকেই যাচ্ছে। লোচন তো নিজের গোঁ ছাড়ছেই না, ওর সঙ্গে কোনো কথাই বলা যায় না। তাই রাও আর চৌধুরী যদি চলে আসে, তাহলে লোচনের পায়ের তলায় মাটি

সরে যাবে।' পাণ্ডেজী একেবারে আয়নার মতো পরিষ্কার করে দিলেন গোটা পরিস্থিতিকে।

'হুঁ! কথা বলে দেখছি!'

'এমনিতেই লোচন এবং ওদের দু'জনের মধ্যে একটু মন-কষাকষির মতো চলছে। গতকাল রাওয়ের কথাবার্তায় দেখলাম, আগেকার সেই ঝাঁজ আর নেই, তাই মনে হয় ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন হবে না।'

'বিকিকিনির ওপর টিকে-থাকা সম্পর্ক কখনও কি স্থায়ী হতে পারে? এ সমস্ত ব্যাপারে অন্যায়ভাবে মাথা নোয়ানো আমার আদর্শ নয়। কিছু ভেব না, আমি সব সামলে নেব।' দা-সাহেব আশ্বাস দিলেন।

'আপনি থাকতে অন্য কারো ভাববার দরকারই-বা-কি?'

'এ ভাষা মোসাহেবদের মুখেই শোভা পায়, তোমার মুখে নয়। তাছাড়া মোসাহেবদের যুগও শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন আগে।' দা-সাহেবের বাক্যাঘাতে পাণ্ডেজী অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

এই দু'টো হালকা বিষয় শেষ করে, পাণ্ডেজী এবার একটু গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করলেন, 'সাকসেনার এই এজাহার নেওয়ার ব্যাপারটা তো আমাদের বেশ বেকায়দায় ফেলেছে। সে তো গোটা পরিবেশকেই দূষিত করে তুলেছে। বিসুর মৃত্যুর মতো সহজ-সরল একটা ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সাত-সতেরো ক্যাচাং তুলে রোজই গাঁয়ে যাচ্ছে। অহেতুক উত্তেজনা আর অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে! তার ওপর এই বিন্দা ...একে মা মনসা তায় আবার ধুনোর গন্ধ! গত তিন দিনে চার-চারটে মারদাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে ...আর তার সব ক'টার মূলেই রয়েছে বিন্দা।'

দা-সাহেব খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন।

'শুনলাম, বিন্দা কিসব প্রমাণ-ট্রমান নিয়ে না-কি দিল্লী যাচ্ছে আর সাকসেনাই না-কি সব পথ বাতলে দিচ্ছে। নির্বাচনের মুখে এসব ঘটনা... ! সুকুলবাবুর লোকরা এসব কথা তুলে আমাদের বিরুদ্ধে দারুণ প্রচার করে বেড়াচ্ছে।'

বিন্দা নামটা দা-সাহেবের মনে বেশ দাগ কাটলো এবং তাঁর বক্তৃতার দিন বিন্দার অশালীন আচরণের কথাও তাঁর মনে পড়লো। কিন্তু তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না, কেবল বললেন, 'আমি শুনেছি। সাকসেনার ফাইল আনিয়ে নিয়েছি আর এই মামলার তদন্তের ভার ডি. আই. জি.-কে নিজের হাতে নিতে বলেছি।'

'ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। দারুণ চটে রয়েছে জোরাভর। পঞ্চায়েত প্রধান আর জোরাভরের এজাহার খুব কঠোরভাবে নিয়েছে সাকসেনা এবং ওদের সঙ্গে ব্যবহারটাও খুব-একটা ভালো করেনি। আসলে সাকসেনাকে পাঠাবার সিদ্ধান্তই ভুল হয়েছে।'

'কখনো-কখনো এমন ঘটনাও ঘটে যায়। ডি. আই. জি. বলেছিলেন যে সাকসেনার মানসিকতা ...।'

'এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ...।' পাণ্ডেজী দা-সাহেবকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে, আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা, রহস্য উদ্‌ঘাটনের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'জোরাবর ভোটে দাঁড়াচ্ছে।'

'কি ?' দা-সাহেব বাস্তবিকই চমকে উঠলেন !

সাধারণত পাণ্ডেজী যেসব সংবাদ আহরণ করে নিয়ে আসেন, তার শতকরা আশি ভাগ সংবাদ কোনো-না-কোনো সূত্র থেকে তিনি আগেই পেয়ে যান। কিন্তু এ সংবাদের এতটুকু পূর্বাভাসও তিনি পাননি। কথাটা দা-সাহেবের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

'তা কি করে সম্ভব ? এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমায় একবার বললো না, একবার জিজ্ঞাসা করলো না ? আশ্চর্য ব্যাপার !'

'কাল রাত্তে ওর সঙ্গে দু'ঘণ্টা বক্‌বক করে মাথা ধরে গেছে।' তাঁর কথাটা যে সত্য, তা প্রমাণ করার জন্যেই যেন কথাটা বললেন পাণ্ডেজী। 'আজ সন্ধ্যায় ও আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। রাত্তে এখানেই থাকবে এবং আগামীকাল মনোনয়ন পত্র দাখিল করবে। পরশু হলো মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন।'

সব কথা শুনে দা-সাহেব সত্যিসত্যিই বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্যে।

'আসলে এ সমস্তই কাশীর কেরামতি। অল্প-স্বল্প যা বাকি ছিলো, সাকসেনা সেটুকুও পুরো করে দিলো। কুটির শিল্প যোজনার ওপরও জোরাবরের মারাত্মক রাগ।'

'হুঁ !' দা-সাহেব কাশীর কেরামতির কথা ভাবতে লাগলেন।

'কিন্তু জোরাবরের হাতে রয়েছে শতকরা পঁয়ত্রিশটা ভোট। এই ভোট পেয়ে সে নিশ্চয়ই জিতবে না। হরিজন অথবা অনুন্নত শ্রেণীর একটা ভোটও জোরাবর পাবে না। তাহলে তার ভোটে দাঁড়াবার পেছনে কারণটা কি ? কিছু বুঝতে পারছি না তো।'

বাস্তবিকই দা-সাহেবের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে না। জোরাবরও কি তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে চায় ? এ কেমন ধারা ব্যাপার ? তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দা-সাহেব যা করেছেন, জোরাবরের উচিত তার দাম ঠিক-ঠিকভাবে মিটিয়ে দেওয়া। সে কি এইভাবে ঋণ শোধ করছে ? আজ কাকেই-বা কি বলবেন। নীতির বালাই আজ আর কারো মধ্যে আছে না-কি ?

'জোরাবর ভোটে দাঁড়ালে সবচেয়ে লাভবান হবেন সুকুলবাবু।'

দু'য়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে যোগফল যে চার হয়, এই সহজ অঙ্ক

সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা দা-সাহেবের কাছে নিতান্তই নিরর্থক বলে মনে হলো। তাই তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সঙ্গে জোরাভরের কি কথা হলো?'

'আমি সমস্ত ব্যাপারটাই ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ঐ কাঠের মাথায় সে সমস্ত ঢুকলে তো! ও তো এক নাগাড়ে একটা কথাই আউড়ে চলেছে ...“চাষ-আবাদ তো অনেক করলাম, এবার একটু রাজনীতি করবো”।'

'হুঁ!' একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দা-সাহেব সমস্যার গভীরে ডুব দিলেন। কিছুক্ষণ পর, তিনি যখন দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন, তখন দেখা গেলো তিনি আগের চেয়ে অনেক সজাগ। মুখের ওপর উদ্বেগের যে হালকা মেঘ জমে ছিলো, তা কেটে গেছে। সহজকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কোনো কথা?'

'না।'

'লখনের খবর কি? ওকে একটু সামলে রেখো। বড্ড তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে যায় বেচারা। গত দু'দিন তো আসেই নি।'

'দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। আজকাল ভাষণ-টাষণও বেশ দিচ্ছে। নির্বাচন পর্যন্ত আমি ওকে এই ব্যাপারেই ব্যস্ত রাখছি। কোনো-কোনো জায়গায়, মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠছে।'

'এ তো ভালোই খবর। কিন্তু মানুষের মধ্যে নয়, আমার লক্ষ্য হলো মানুষের হৃদয়ে স্থান তৈরি করে নিতে হবে।'

'তাহলে আজ উঠছি?' ঘড়ি দেখতে-দেখতে পাণ্ডেজী যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন দা-সাহেব। পাণ্ডেজী চলে গেলে যোগাসন করার জন্যে, নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন দা-সাহেব।

ঠিক ন'টার সময়ে দা-সাহেব বাড়ির অফিস-ঘরে রাও এবং চৌধুরীকে অভ্যর্থনা জানালেন, 'এসো-এসো!' তাঁরা আসন গ্রহণ করতেই, কোনোরকম ভণিতার আশ্রয় না নিয়ে সোজা আসল কথাটা পাড়লেন, 'তোমরা পাঁচজন মন্ত্রী পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে। তোমাদের মধ্যে দু'জন ইতিমধ্যেই সে অভিপ্রায় ত্যাগ করেছে এবং লিখিতভাবে আমায় জানিয়েছে!' সামনে একটা পেপার ওয়েটের তলায় কাগজের যে স্লিপখানা ফরফর করে উড়ছিলো, সেদিকে দা-সাহেব দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দা-সাহেবের কণ্ঠস্বর থেকে মুখ্যমন্ত্রী-সুলভ গরিমা এবং কঠিন মনোভাব ঝরে পড়ছিলো। তিনি রাওয়ের মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করলেন, 'এখন তোমাদের কি ইচ্ছা?'

দা-সাহেবের কথা শুনে রাওয়ের মুখে বিশেষ কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো

না। তিনি গতকালই জেনেছেন যে বাপট আর মেহতা নিজেদের অবস্থান বদলে ফেলেছেন। কিন্তু ওদের সঙ্গে রফাটা কি হলো, জানতে না পারায় রাও প্রশ্ন করলেন, 'কি দিলেন ওদের ?'

'লেনদেনের কথা বলতে সম্ভবত তোমরাই এসেছ। তা বলো শুনি !' খুব কম লোকই দা-সাহেবকে রাগ করতে দেখেছেন। কিন্তু যখন দা-সাহেব ক্রুদ্ধ হন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর এবং অভিব্যক্তি সামনের মানুষটির হৃদয় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। কণ্ঠস্বরে কোথাও উত্তেজনা নেই, কিন্তু তাতে এমনই হিমশীতল কাঠিন্য যে সম্পূর্ণ শরীর জমে পাথর হয়ে যায়। রাওয়ের কটা চোখ দু'টোতে আলো যেন নিভে এলো, আর চৌধুরী ফ্যালফ্যাল করে রাওয়ের মুখ দেখতে লাগলেন। শেষে রাও সাহসে ভর দিয়ে বললেন, 'দেখুন দা-সাহেব, গত ক'মাস ধরে যে কাণ্ড-কারখানা ঘটে চলেছে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে তার আংশিক দায়িত্ব তো আমাদের ওপরেও বর্তায়। কিন্তু আমরা তো এ সমস্ত সমর্থন করতে পারি না, বরং বিরোধিতাই করি। অন্তত আমাদেরও তো কিছু ...।'

'আদর্শ রয়েছে।' অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে দা-সাহেব রাওয়ের অসম্পূর্ণ বাক্যকে সম্পূর্ণ করলেন। তারপর একটু শক্ত গলায় বললেন, 'লোচনের এই ভাষাগুলো লোচনের জন্যেই তোলা থাক। তোমার মুখে এগুলো ঠিক মানায় না।'

রাওয়ের ভেতরটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো। লোচনবাবুর অতি-আদর্শ-বাদিতার জন্যে, মনে একটু দুশ্চিন্তা থাকলেও তাঁরা তা সামলে-সুমলে রেখেছিলেন, কিন্তু বাপট আর মেহতা তো স্রেফ ল্যাঙ মেরে সরে পড়েছে। এখন মুখ থুবড়ে না পড়লেও, তাঁদের অবস্থা বেশ নড়বড়ে হয়ে গেছে। তা নইলে, এক সপ্তাহ আগের পরিস্থিতি থাকলে, দা-সাহেবের গলার এই ঝাঁজ স্রেফ গলাতেই থেকে যেতো ; আর দা-সাহেবই রাওয়ের সামনে বসে গাঁইগুঁই করতেন। লোচনবাবুর এই আদর্শ-বাদিতাই তাঁদের সকলকে পথে বসিয়েছে। বাপট আর মেহতা তো সে কারণেই সটকেছে। এবার নিজেদের কথাবার্তায় যদি একটু নমনীয় ভাব না দেখানো হয়, তাহলে কোথাও আর কূল মিলবে না। তবুও, নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে রাও জানালেন, 'এ কথা তো আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সময়ে আমাদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। কিন্তু তখনকার অবস্থা বিবেচনা করে, আমরা তা মেনে নিয়েছিলাম। আজ যখন আপনি মন্ত্রিপরিষদের পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবছেন, তখন তো আমাদের প্রাপ্যটা দিয়ে দেওয়া উচিত।'

'তোমাদের প্রাপ্যটা কি ?' দা-সাহেব অত্যন্ত সহজ-সরল ভঙ্গিতে প্রশ্নটা ছুঁড়লেন।

রাওয়ের কটা চোখ দু'টো আবার চকচক করে উঠলো। দা-সাহেব বাপট আর মেহতাকে কি দরে পটিয়েছেন কে জানে ? নিজের জন্যে কি চাওয়া যায়, সে কথা তিনি হঠাৎ ঠিক করে উঠতে পারলেন না। একটু ভেবে বললেন, 'লোচন-ভাই, চৌধুরী

এবং আমার সমর্থকরা আপনার মন্ত্রিত্বের পক্ষে আজও বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। বাপট আর মেহতা সরে পড়লেও অবস্থার তেমন-কিছু তারতম্য ঘটেনি। আর ওদের পক্ষে ক'জন লোকই-বা আছে ?'

রাওয়ের চোখে একটা ধূর্তামির চাউনি খেলে গেলো।

'নিজের দর বাড়াচ্ছ না-কি ?' দা-সাহেবের প্রশ্নেও পাল্টা চাতুরির আভাস ফুটে উঠলো। এমনিতে স্বভাবের দিক থেকে দা-সাহেব কূটকচালিতে বিশ্বাসী নন। তাঁর সৌম্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের পক্ষে তা মানানসইও নয়। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে কখনো-কখনো তাঁকেও এই মনোভাব অবলম্বন করতে হয়।

'না, আমি পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার করে নিতে চাই।' রাওয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'তার দরকার নেই। যদি তুমি তোমার দাবি স্পষ্ট করে বলো, তো বুঝতে একটু সুবিধা হয়।'

একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন রাও। দা-সাহেবের মনোভাব অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না, অবস্থাও আগের মতো আর মজবুত নেই। তাই, সরাসরি নিজের দাবির কথা তোলবার সাহস করছিলেন না। আসল প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে গিয়ে তাই বললেন, 'সুকুলবাবুর তরফ থেকে বেশ জমকালো একটা মিছিল হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদেরও তো কিছু করা দরকার। তা নইলে, এই মিছিল ···আপনি কিছু ভেবেছেন কি ?'

ব্যঙ্গভরা স্মিত হাসি দা-সাহেবের ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়লো, 'আদর্শের নামাবলীটা এত তাড়াতাড়ি গা থেকে খুলে ফেলছ ?' থামলেন দা-সাহেব, রাওয়ের অপ্রস্তুত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললেন, 'আমার সে রকম অভিপ্রায় হলে, মিছিলের নামে জলের মতো খরচ করার টাকার উৎসটা জানার জন্যে একটা তদন্ত কমিশন বসাতে পারি। কিন্তু আমি তা চাই না, কারণ অতখানি নিচে আমি নামতে পারব না। রাজনীতি আমার চোখে স্বার্থ চরিতার্থ করার নীতি নয়, আর আমি চাই, আমার সহকর্মীরাও যেন এ কথা ভালো করে উপলব্ধি করেন।'

রাওয়ের মুখের আলো যেন নিভে এলো। পায়ের তলায় শক্ত মাটি না থাকলে, দা-সাহেবের কণ্ঠস্বরে এত দৃঢ়তা কিছুতেই থাকতো না। মনে হচ্ছে, অবস্থাটা বেশ সামলে নিয়েছেন দা-সাহেব। তাহলে রাও এখন কি বলবেন ?

'তোমার প্রাপ্য তুমি চাইলে না ?' প্রসঙ্গে ফিরে এলেন দা-সাহেব। কিন্তু রাওয়ের মনে হচ্ছিলো, পায়ের তলায় যেন মাটি নেই। তাই দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের প্রাপ্য আপনি নিশ্চয়ই দেবেন।'

'প্রাপ্য ? হুঁ।' দা-সাহেব কথার খেই ধরে বললেন, 'লোচনের কাছ থেকে তুমি কি আশ্বাস পেয়েছো ?' প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে দা-সাহেবের চোখে এমন এক তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠলো, যা দেখে সহজে কেউ মিথ্যে কথা বলতে পারবে না।

'লোচন-ভাই তো ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে দিয়েছেন। সুদ ও অর্থ দণ্ডর আমাদের জন্যে আলাদা করে তোলা আছে।'

দা-সাহেব হাসলেন এবং কিছুক্ষণ ধরে হাসতেই থাকলেন। সেই হাসিতে উপহাস, আনন্দ বা বাদ ঠিক কি ছিলো, রাও তা বুঝতে পারলেন না।

'আসলে, যার এ্যাকাউন্টে কিছুই নেই, শুধু সেই দয়ালুভাবে এ রকম ব্ল্যাঙ্ক চেক কাটতে পারে!' তারপর গলার স্বর পাল্টে গভীর গলায় অনেকটা বোঝাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখো রাও আর চৌধুরী, রাজনীতির জগতে তোমরা এখনো নিতান্তই শিশু। তাই তোমরা মানুষ চিনতে ভুল কর।' তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, 'অবশ্য বয়সের দিক থেকে লোচনও তোমাদের চেয়ে এমন-কিছু বড় নয়। কিন্তু আদর্শ ও নীতির বাণী আউড়ে কিভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ করা যায়, তা সে বেশ ভালোই জানে। আর এ কারণেই ওর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাবোধ কোনোদিনই জাগেনি।'

নিজের কথার প্রতিক্রিয়া জানবার জন্যে দা-সাহেব তীক্ষ্ণ চাউনি মেলে রাওয়ের মুখের দিকে চাইলেন। কিন্তু সেখানে কোনো বিকার দেখা গেলো না, কেবল একটা লঘু অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠলো। সেটা দূর করার জন্যে দা-সাহেব আবার শুরু করলেন, 'সুকুলবাবুর বিধানসভায় লোচন যখন বিধায়ক ছিলো, তখন রাজনৈতিক বাতাসের গতি দেখে সে ঠিক আঁচ করতে পেরেছিলো যে সুকুলবাবুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। নিমেষে বিধায়কপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং তার মূল্য হিসেবে সে পেলো শিক্ষামন্ত্রীর পদ। এখন আবার সুকুলবাবুর সঙ্গে তার দর-কষাকষি শুরু হয়েছে, আর আমার বিরোধিতায় উঠেপড়ে লেগেছে। যার সমস্ত নীতি আর আদর্শ, বিরোধ আর বিদ্রোহ শুধুমাত্র নিজের দর বাড়াবার কাজে নিয়োজিত হয়, তার প্রতি আমার মনে কোনোরকম সম্মান বা প্রীতির মনোভাব জাগতে পারে না।'

'কোন দুঃখে লোচন-ভাই সুকুলবাবুর সঙ্গে হাত মেলাতে যাবেন? এই দলে থেকেই তিনি যদি একটু বুদ্ধি খরচ করেন, তা হলে তাঁর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়।' লোচনের আদর্শবাদিতাকে কেন্দ্র করে রাওয়ের মনে যতই ক্ষোভ থাকুক না কেন, লোচন-ভাইয়ের বিরুদ্ধে দা-সাহেবের এই অভিযোগ শুনে রাও বাস্তবিকই খুব মর্মাহত হলেন আর তাই তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না।

রাওয়ের কথা শুনে দা-সাহেব আদৌ রাগ করলেন না, বরং হাসলেন। নিছক আমোদের ছোঁয়া-মাখানো হাসি। 'নিজের সঙ্গে রেখে, লোচন তোমাদের অনেক উঁচুতে উড়তে শিখিয়েছে। দেখো ভাই, আমার পক্ষে তোমাদের খুব উঁচুতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে যতদূর নিয়ে যাই, সেখানে দাঁড়াবার মতো অন্তত

পায়ের তলায় মাটির ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দিই। যারা আমার সহযাত্রী, তাদের মুখ থুবড়ে পড়বার আশঙ্কা কখনই থাকে না। এখন ভেবে দেখো।'

নিজের দিক থেকে দা-সাহেব একরকম সন্ধির প্রস্তাবই করলেন। এবার রাওয়ের পালা।

কিন্তু রাও এবং চৌধুরী দু'জনেই চুপ।

'শোনো, আমার মন্ত্রিসভার সর্বপ্রথম ও অনিবার্য শর্ত হলো, অনুশাসন মেনে চলা। লোচনের আচরণে শুধু আমি নই, আপ্পাসাহেবও দুঃখিত ও বিচলিত। ফলে আমায় শেষ পর্যন্ত ওকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তই নিতে হলো। কাল চিঠি চলে যাবে।' একটু থামলেন দা-সাহেব, তারপর আবার শুরু করলেন, 'শিক্ষামন্ত্রীর পদ খালি হচ্ছে। রাও, তুমি এই ভার গ্রহণ কর। এমনিতেই লোচন তেমন সন্তোষজনক কোনো কাজই করেনি। আমার মতে, এই পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তোলার পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে এই মন্ত্রণালয়ের ওপর। তুমি এই চ্যালেঞ্জ নাও।'

ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তোলার ব্যাপারে রাওয়ের বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। তিনি তাঁর বংশধরদের ভবিষ্যৎ নিয়েও আদৌ চিন্তিত নন, তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় —নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তবু এই প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া গোপন রেখে, নিজের কটা চোখ দু'টোকে গোল-গোল করে ঘোরাতে-ঘোরাতে রাও প্রশ্ন করলেন, 'আর চৌধুরীর জন্যে?'

'তিনি যেখানে রয়েছেন, আপাতত সেখানেই থাকুন …যদি সত্যিই কিছু করতে চান, তো ওখানেই অনেক কিছু করবার রয়েছে। এমনিতে নির্বাচনের মুখে তো কোনো রদবদল করছি না।' শেষ কথাগুলো দা-সাহেব এমনভাবে বললেন, যাতে কথাবার্তার পরিসমাপ্তি এবং তাঁদের দু'জনের ওঠবার সংকেত দুই-ই স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

চৌধুরীর মুখ একেবারে অন্ধকার হয়ে গেলো। যখন থেকে এসেছেন, তখন থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। আর দা-সাহেবের এই কথা শুনে তো তাঁর গলা থেকে কোনো শব্দই বেরোলো না। উঠতে-উঠতে রাও সাহসে ভর করে প্রশ্নটা করেই ফেললেন, 'বাপট আর মেহতাকে শেষে আপনি …।'

'এখনো কিছু দিইনি।' নিজের কথাও শেষ করলেন দা-সাহেব এবং রাওয়ের কথার উত্তরও দিলেন। তারপর একটু হালকাভাবে হেসে বললেন, 'এমন কিছু ছেলে রয়েছে, যাদের বোঝালেই বোঝে। কিন্তু এমন কিছু জেদি ছেলেও রয়েছে, যারা মরজি-মাফিক জিনিস না পেলে আর কিছু শুনতেই রাজি নয়।'

রাও একটু চটলেন। ইচ্ছে হলো শুনিয়ে দেন —মরজি-মাফিক জিনিস কোথায় আর পাচ্ছেন। কিন্তু চুপ করেই থাকলেন। বাপট আর মেহতা শুধু মুখের কথায় চুপচাপ থাকবে, রাওয়ের সে কথা বিশ্বাস হচ্ছিলো না। আচ্ছা, এমন

তো হতে পারে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের কোনো আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি এখন নিজে কি করবেন? শুধু বললেন, 'কাল ভেবে উত্তর দেবো।'

'যারা শাসন পরিচালনার কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের তো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মতো সামর্থ্য থাকা উচিত। এটাই হলো তাদের বিশেষত্ব। যাক্, ভেবে দেখো।'

রাও এবং চৌধুরী চলে যাবার পর দা-সাহেব আপ্পাসাহেবকে ফোন করে জানালেন, 'লোচনকে বরখাস্ত করার জন্যে রাজ্যপালকে চিঠি দিচ্ছি। সে আর মন্ত্রিসভায় থাকবে না। পার্টির ব্যাপারে যা করার আপনি করবেন। রাওয়ের সঙ্গে এখুনি কথা হয়ে গেলো ...সব ঠিকঠাক আছে।'

'লোচনের ব্যাপারটা যদি আর একবার ভেবে দেখতেন।' আপ্পাসাহেবের দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

'না আপ্পাসাহেব। যারা অনুশাসন ভেঙে চলে, তাদের সঙ্গে নিয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' দা-সাহেব তাঁর চরম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। ওদিক থেকেও আর কোনো আগ্রহ শোনা গেলো না। শুধু শোনা গেলো, 'অভিনন্দন রইলো।' কিন্তু দা-সাহেবের মনে হলো উচ্চারিত শব্দটি অভিনন্দনের হলেও, কণ্ঠস্বর আর মনোভাব সম্ভবত ঠিক তার বিপরীত।

জোরাওয়র। বয়স বছর চল্লিশ। ছ'ফুট লম্বা দোহারা চেহারা। ঘন চওড়া গোঁফ আর তার নিচে পুরু ঠোঁট, যা তার চেহারায় একটা বিশেষত্ব এনেছে। টেরিকট অথবা 'র' সিল্কের পাঞ্জাবি আর পায়জামা তার সবক্ষণের পোষাক। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা তাবিজ এবং মোটা সোনার চেন। দু'হাতের আঙুলে শোভা পাচ্ছে রঙ-বেরঙের পাথর-বসানো রুপোর আংটি। সরোহার অর্ধেক জমি-জায়গাই জোরাওয়রের। আর সে হলো সরোহার মুকুটহীন রাজা। কিন্তু ব্যক্তিত্বের মধ্যে আভিজাত্যের গন্ধমাত্র নেই, যা আছে তা হলো দর্প-ভরা উদ্ধত অহঙ্কার। বাপের বড় ইচ্ছে ছিলো, শহরে গিয়ে পড়াশুনা করে বড় হয়। কিন্তু গ্রামের স্কুলের গণ্ডি পার হতেই মুখ থুবড়ে পড়লো সে। আর স্কুলে সে এমন মেজাজ নিয়ে যাতায়াত করতো, যেন সে ছাত্র নয়—মালিক। তবে সত্যি কথা বলতে কি, সে মালিকই ছিলো। তারপর বাপের জমিদারি হাতে পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলো।

জোরাওয়র দা-সাহেবের বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো, 'আসুন, আসুন জোরাওয়রজী!'

'দা-সাহেব?'

'উনি আপ্পাসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। পাঁচটা নাগাদ ফিরবেন।'

'যমুনাদিদি তো আছেন?'

'হাসপাতালে গেছেন, একজন রুগীকে দেখতে। ওঁরা একসঙ্গেই ফিরবেন। আপনি বসুন না ...সাড়ে-চারটে তো বেজেই গেছে।'

রক্ষী দা-সাহেবের পারিবারিক বসার ঘরের দরজা খুলে দিলো। পাখা আর কুলারটাও চালিয়ে দিলো। জোরাভর এ বাড়িতে পরিবারের একজন রূপেই গণ্য হয়।

দা-সাহেব ঘরে ঢুকে জোরাভরকে এমনভাবে স্বাগত জানালেন, যেন তার অপ্রত্যাশিত আগমনে আশ্বস্ত হয়েছেন তিনি। 'তুমি এসে খুব ভালো করেছ ...তা নইলে তোমাকে ডেকে পাঠাতে হতো। আজ পাণ্ডে আসেনি, নয়তো ওকে দিয়েই খবর পাঠাতাম।' একটু মিথ্যে কথা বলতে হলো দা-সাহেবকে। বলতে হয়, কখনো কখনো পরিস্থিতির চাপে পড়ে মিথ্যে কথা বলতে হয়। জোরাভর কোনো উত্তর দেবার আগেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'শরবৎ-টরবৎ কিছু খেয়েছ?' তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'জোরাভরের জন্যে আম আর শরবৎ পাঠিয়ে দাও।'

এখনো পাণ্ডেজীর সঙ্গে দেখা হয়নি তাই ...নয়তো আজ, এমন অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা পাবার কোনো আশাই জোরাভরের ছিলো না।

রক্ষীকে বাইরে ডেকে কিছু আদেশ দিয়ে দা-সাহেব ফিরে এসে জোরাভরের পাশে বসলেন। 'আজ সকাল থেকে শুধু তোমার কথাই ভাবছি।'

'কেন?'

'কাল রাতে সাকসেনার ফাইলটা আনিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। বেশ একটা সমস্যা পাকিয়ে বসে আছে।'

কান খাড়া হয়ে উঠলো জোরাভরের। বিলকুল পরোয়া না করার ঢঙে নিজস্ব স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলো, 'ফাইলে সে হারামজাদা লিখেছেটা কি?'

দা-সাহেব তীক্ষ্ণ নজর মেলে জোরাভরের দিকে চাইলেন। যেন বলতে চান —এ ভাষা আর মেজাজ এখানে চলবে না বাপু। মুখে শুধু বললেন, 'তুমি এ কাজটা ভালো করলে না। একটা ঝামেলা থেকে যখন তোমাকে কোনোরকমে উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলাম তখনই ...।'

'কি করেছি আমি?' কপাল কুঁচকে, রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমি বিসুর কথা বলছি।'

'তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

দা-সাহেব, জোরাভরের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তারপর হিমশীতল গলায় বললেন, 'ভুলে যেও না, পুলিশ আর আইনের হাত খুব লম্বা আর

তাদের দৃষ্টিও খুব প্রখর। দেখতে না চাইলে হাতির দিকেও চাইবে না, কিন্তু দেখতে চাইলে পিঁপড়েরও রেহাই নেই —না তাদের দৃষ্টি থেকে, না তাদের কবল থেকে।'

'আর আপনি সেই সাকসেনাকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে কি? ও আমার কি করবে?'

অন্য কেউ হলে এই মিথ্যে দম্ভোক্তি শোনামাত্র জ্বলে উঠতো, 'কিন্তু দা-সাহেবের কাছে এ জাতীয় কথার কোনো গুরুত্বই নেই।

ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রী হাতে একটা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢুকলো এবং সেটা দা-সাহেবের সামনে রাখলো। ফাইলটা বগলদাবা করে, তাতে হাত বুলাতে-বুলাতে দা-সাহেব বললেন, 'দেখো জোরাভর, মানুষ যখন নিজেকেই ঠকাতে শুরু করে তখন পতন সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।'

কিন্তু এত সূক্ষ্ম কথা জোরাভরের মাথায় ঢুকলো না। তাই সে সরাসরি প্রশ্ন করলো, 'সাফ-সাফ বলুন, এই সাকসেনা আমার সম্বন্ধে ফাইলে কি লিখেছে?'

দা-সাহেবও স্পষ্ট করেই বলতে চান, কিন্তু সোজাসুজি কাউকে পাথর ছুঁড়ে মারা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ।

'পুত্তনের দোকানে বসে দু'টো ছেলের সঙ্গে বিসু সেই সন্ধ্যায় চা খেয়েছিলো, আর ওটাই ওর শেষ খাওয়া।'

'বখাটে ছেলে-ছোকরার সঙ্গে চা-বিড়ি ও তো খেতোই।' এতটুকু না ঘাবড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলো জোরাভর।

'কিন্তু ছেলে দু'টো সরোহার নয়। টিটুহরি গ্রামের।' দা-সাহেবের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি জোরাভরের মুখের ওপর নিবদ্ধ রইলো।

'বিসু তো আশপাশের গ্রামে দিনরাত টো-টো করে ঘুরে বেড়াতো। হারামজাদার তো কোনো কাজকর্মই ছিলো না।'

'ছেলে দু'টোর এজাহার এই ফাইলে রয়েছে।'

'সাকসেনা কার-কার এজাহার নিয়েছে তা আমি জানি। কোনো ছেলে ছোকরার বয়ান সে নেয়নি।' জোরাভরের মুখ কিন্তু ক্রমশ ফ্যাকাসে হতে শুরু করলো। অনেক চেষ্টা করে, আরোপিত বেপরোয়া ভঙ্গির সাহায্যেও সে তার মুখের ফ্যাকাসে-ভাবকে ঢাকতে পারলো না।

'পুলিশের সব কাজ সবাই যদি জেনেই ফেলে তাহলে আর পুলিশ কি? ছেলে দু'টো স্বীকার করেছে যে ...ওদের কাছে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়া গেছে, যেটা ওদের ...।' কথাটা শেষ না করে দা-সাহেব সেই ফাইলের ওপর হাত বুলাতে লাগলেন।

জোরাভরের মুখে আর কোনো আওয়াজ নেই। দা-সাহেব একটা ছোট্ট নিশ্বাস ছাড়লেন।

ঠিক সেই সময়ে, শরবৎ আর আম নিয়ে ঘরে ঢুকলো চাকর। দা-সাহেব মোলায়েম স্বরে বললেন, 'খাও। লক্ষ্ণৌ থেকে দশহরী আমের টুকরি এসেছে।'

চাকর চলে যেতেই আবার কথা শুরু হলো। দা-সাহেবের কণ্ঠস্বরে আগের সেই কাঠিন্য আর নেই।

'এ কথা ঠিক যে আমি যখন কারো হাত ধরি তখন তাকে মাঝপথে ছেড়ে যাই না। এটাই আমার স্বভাব। কিন্তু যদি কেউ এটাকে আমার দুর্বলতা ভেবে, অন্যায় সুযোগ নিতে চায় তাহলে তো ...।' কথা শেষ করলেন না দা-সাহেব, বাকিটা অর্থপূর্ণ চাউনিতে সম্পূর্ণ করলেন।

কিন্তু চোখের ভাষা বোঝার মতো বুদ্ধি জোরাভরের কোথায়। সে শুধু দা-সাহেবের কথার খেই বললো, 'আমার বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে ফায়দা তো আপনিই লুটছেন।

'আমি?' এই পাল্টা অভিযোগের ভেতরের রহস্য দা-সাহেবের মাথায় ঢুকলো না!

'তা নয়ত কি? হরিজনদের মাথায় তোলার যে কাজকম্মো আপনি শুরু করেছেন তার উদ্দেশ্য তো আমাকেই খতম করা।'

মুচকি হাসলেন দা-সাহেব! তারপর বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'যুগ পাল্টাচ্ছে জোরাভর। যুগের সঙ্গে পাল্টাতে শেখো। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে যা হওয়া উচিত ছিলো, এখনো তা পুরোপুরি হলো না! একে তো দেশের দুর্ভাগ্য বলতে হবে।'

'দিন যেখানে পাল্টাবার সেখানে পাল্টাক। কিন্তু যতদিন আমি বেঁচে আছি, সরোহাতে কোনো "দিন" পাল্টাবে না। পাল্টাতে পারে না।'

'তোমার এই জেদ আর জাঠপনাই তোমায় পথে বসাবে।'

'এর মধ্যে জেদের কি দেখলেন, দা-সাহেব? একটা দিন ছিলো, যখন এইসব হরিজনদের বাপ-ঠাকুর্দারা আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকতো। ঝুঁকে থাকতে-থাকতে তাদের পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে যেতো। আর আজ এই শালারা বুক টান-টান করে চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলে—এসব আমার সহ্য হয় না।'

দা-সাহেব সেই বংশগৌরব থেকে জোরাভরকে টেনে নামালেন। 'যাক, এসব কথা পরে আলোচনা করা যাবে। এই মুহূর্তে এই ফাইলটা আমায় বড্ড ভাবাচ্ছে। যতক্ষণ একটা ব্যাপার মুখের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ কোনো চিন্তার কারণ থাকে না, কিন্তু একবার সে কথা ফাইলবন্দী হলে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়।'

জোরাভর এবার সত্যিসত্যিই ভূপাতিত হলো। দা-সাহেবের কথা থেকে সে অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছে, যে ব্যাপার বেশ গণ্ডগোলের।

'এখন যা করার তা আপনাকেই করতে হবে। আমার গায়ে যেন কোনো আঁচ না লাগে।'

দা-সাহেব কথার কোনো জবাব দিলেন না। মনে হলো কোনো গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন। জোয়ার্দর বললো, 'এলাম এক ভেবে আর হলো আর এক।'

দা-সাহেব শুধু চোখের ইঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন।

'এবার আমিও ভোটে দাঁড়াব ভেবেছিলাম। মনোনয়ন পত্র পেশ করার জন্যেই এসেছিলাম ···আপনি অনুমতি করলে, মনোনয়ন পত্র দাখিল করে দিই ?'

'কি ?' দা-সাহেব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যেন তিনি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

জোয়ার্দর দ্বিধাহীন কণ্ঠে আরো একবার তার মনোবাসনা ব্যক্ত করলো। দা-সাহেব এক দৃষ্টিতে জোয়ার্দরের মুখ দেখতে লাগলেন, তাঁর চোয়াল ক্রমশ শক্ত হতে লাগলো। কঠিন, হিমশীতল কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'ওদিকে বিম্ভ আগুন লাগার ঘটনার যে প্রমাণ জুটিয়েছিলো, বিন্দা সেসব সঙ্গে নিয়ে দিল্লী যাবার উপক্রম করছে। সাকসেনা সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করে ফেলেছে, আর তুমি ভোটে লড়বার খোয়াব দেখছো। আমার তো ভয় হচ্ছে, বিধানসভার বদলে তোমায় না শেষে জেলে ···'

'আমি তো আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতেই এসেছি, দা-সাহেব। এখনো তো মনোনয়ন পত্র দাখিল করিনি।'

'মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে চাইলে করে ফেলো। আমি তোমায় কখনও নিষেধ করবো না। বরং একদিক থেকে আমি ভারমুক্ত হব ···।'

'আপনি তো আমার ওপর রেগে যাচ্ছেন, দা-সাহেব ! আমি তো আগেই বলেছি —মনে হয়েছিলো তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি। আমি কি ভোটে দাঁড়িয়ে গেছি না-কি !'

কথাবার্তা যখন চলছে তারই মাঝে যমুনা এসে ঘরে ঢুকলেন : 'জোয়ার্দর, তুমি এখানে খেয়ে তবে যাবে। এবার তো বোধহয় প্রায় পনেরো দিন পরে এলে।'

'খাবে তো বটেই, এ আর বলার কি আছে ?'

খেতে বসেও দা-সাহেব আলোচনার বিষয়বস্তুকে লাইন থেকে বেশি দূরে যেতে দিলেন না, বরং পরিস্থিতির অবাবহতাকে আরো খোলাখুলি হাজির করলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায় নেবার আগে জোয়ার্দর বললো, 'দেখুন দা-সাহেব। লাইন-টাইনের ব্যাপার আমি জানি না। আমি শুধু চাই আমার বিরুদ্ধে যেন আফেবাজে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। এটা আপনার দায়িত্ব।' তারপর

একটু থেমে বললো, 'শালা বিন্দাটাকে একটু টাইট করা দরকার। ব্যাটা বড্ড বেড়েছে।'

'তুমি নিজে কিছু করো না।' কড়া নির্দেশ দিলেন দা-সাহেব। জোরাওর চলে গেলে দা-সাহেব ফাইল নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন এবং কিছুক্ষণ ফাইলের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর বস্তীকে ফোনে নির্দেশ দিলেন, সে যেন ডি. আই. জি.-কে বলে দেয়, কাল আটটায় তিনি ডি. আই. জি.-র সঙ্গে বাড়িতেই দেখা করবেন।

দা-সাহেব সাধারণত সকালে বাড়ির অফিস-ঘরে বসেন না। কিন্তু ডি. আই. জি.-র সঙ্গে দেখা করবেন বলে, তিনি পৌনে আটটা থেকেই আজ এখানে বসে রয়েছেন। তাঁর সামনে পড়ে রয়েছে দু'টো ফাইল আর টুকরো নোট-করা কিছু কাগজ।

ঘড়িতে আটটা বাজতেই ডি. আই. জি. এসে স্যালুট ঠুকলেন। মৃদু ঘাড় নেড়ে প্রত্যাভিবাদন জানালেন দা-সাহেব।

'এসো।' সামনে পড়ে-থাকা ফাইলের ওপর হাতের পাঁচটা আঙুল মেলে ধরে বললেন, 'আমি এই ফাইলটা দেখেছি, বেশ খুঁটিয়েই পড়ে দেখেছি। সাকসেনা যে এজাহারগুলো নিয়েছে, সেগুলো আর তোমার রিপোর্টও দেখেছি।'

সিনহা অপলক দৃষ্টিতে দা-সাহেবের মুখ দেখছিলেন। খুব আশা করেছিলেন, এবার বোধহয় তাঁর ব্যক্তিগত রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু প্রশংসাবাক্য শুনবেন।

'সাকসেনা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' রিপোর্ট সম্পর্কে কোনো কথাই বললেন না দা-সাহেব। সাকসেনার প্রসঙ্গ তুলেই শুরু করলেন তাঁর আলোচনা।

'স্যার, মানুষ হিসেবে খুবই ভালো। আই মিন ...আসলে বুঝতে পারছি না কি বলবো?'

'হুঁ। ভালো নিশ্চয়ই হতে পারেন। কিন্তু ভালো লোক যে সবসময় যোগ্য হবে, তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি তার যোগ্যতার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

'এমনিতে স্যার, গাঁয়ের মানুষের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে ওকে আমার সঠিক লোক বলে মনে হয়েছিলো। তাই আমি ...।' সাকসেনার নাম প্রস্তাব করেছিলেন সিনহা আর এ কারণেই তিনি নিজেকে অপরাধী-অপরাধী ভাবছিলেন।

'আমি তোমাকে বিন্দুমাত্র দোষী করছি না।' দা-সাহেব সিনহাকে আশ্বস্ত করলেন। তারপর বললেন, 'পুলিশের লোকদের যে রকম অন্তর্দৃষ্টি, ব্যবহার কুশলতা এবং ব্যক্তিত্ব থাকা উচিত, তার কোনোটাই সাকসেনার নেই।' তারপর সাকসেনার সি. আর.*-টা টেনে নিয়ে বললেন, 'এটাও পড়ে দেখেছি এবং এটা

* কনফিডেনসিয়াল রিপোর্ট।

পড়ার পর আমার ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। যখনই তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হয়েছে …তখনই তার ফল নৈরাশ্যজনক হয়েছে। তাই প্রমোশনের কথা উঠতেই তাকে বদলি করে এদিক-সেদিক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

দা-সাহেব থামলেন। মিনিট-দুই চুপচাপ। সিনহা বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি কি বলবেন।

'পুলিশের লোককে অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতিত্বশূন্য হতে হবে। কিন্তু কিছু লোকের সঙ্গে আশাতীত মধুর ব্যবহার আর কিছু লোকের সঙ্গে মিছিমিছি দুর্ব্যবহার করলে, অনিবার্যভাবেই অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। অসন্তোষ দূর করার জন্যেই তো তাকে পাঠানো হয়েছিলো, অসন্তোষ বাড়াবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়।'

সিনহা মনে-মনে প্রমাদ গুনতে লাগলেন, এ তো বিসম্মার গল্প না জানি তাঁর ব্যক্তিগত রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁকে কি শুনতে হবে।

'ঐ চা-ওয়ালা পুরনের এজাহার নেবার পেছনের যুক্তিটা কি? খামোকা ব্যাপারটাকে আরো ঘোরালো করে তোলা। ব্যক্তিগত মহত্ত্ব দেখাবার জন্যে মানুষ কখনো-কখনো এমন কাজ করে। কিন্তু এ আমার পছন্দ নয়। মহত্ত্ব দেখাবার প্রয়োজন হয় না, মহত্ত্ব নিজেই প্রকাশিত হয়।'

দা-সাহেবের মুখে গভীর অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লো, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়লো সিনহার অপরাধবোধ।

'একটা প্রদেশের রাজধানীতে এস. পি পদ কম গুরুত্বপূর্ণ নয় …ব্যাপারটা একটু দেখো।' সাক্সেনার কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টটা সিনহার সামনে এগিয়ে দিলেন দা-সাহেব। তারপর বিশুর ফাইলের পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

'তোমার রিপোর্টটাও দেখলাম। মনে হচ্ছে বেশ খেটেই তৈরি করা হয়েছে।'

সিনহার চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা যেন ঝরে পড়লো। কিন্তু দা-সাহেব সিনহার আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব বেশিক্ষণ টিকতে দিলেন না।

'কেসটা আমিও স্টাডি করেছি …বেশ মনোযোগ দিয়েই স্টাডি করেছি।' থামলেন দা-সাহেব। 'কিন্তু মনে হচ্ছে, সিদ্ধান্তে তুমি আগেই পৌঁছে গিয়েছিলে এবং পরে রিপোর্ট তৈরি করেছ। অবশ্য কখনো-কখনো এমন হয়। একটা ধারণা মাথায় ঢুকে গেলো, অমনি সিদ্ধান্তও সেইদিকে পা বাড়ালো।'

সিনহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। দা-সাহেবের ইঙ্গিতটা যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাই কিছুটা সংকোচের সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু স্যার, এ তো পরিষ্কার আত্মহত্যার ঘটনা। আমি …।'

'কিন্তু আমি যদি না মানি?' তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে পুলিশ বিভাগের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দা-সাহেব বললেন, 'আমার নিজেরই আশ্চর্য লেগে-

ছিলো। কিন্তু মুক্ত মন আর খোলা চোখ নিয়ে চিন্তা করার পর দেখি আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন সীমারেখায় পৌঁছে গেছি।'

অদ্ভুত এক দুশ্চিন্তা সিনহার মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লো। দা-সাহেব আবার শুরু করলেন,'অপরাধ-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান এবং অধ্যয়ন কোনোটাই আমার নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতা তো কিছুটা রয়েছে! অবশ্য তোমরা এ লাইনের মাস্টার …।' দা-সাহেব সরাসরি সিনহার মুখের দিকে তাকালেন।

দা-সাহেবের আসল ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টায় সিনহা এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। এবং বোধহয় সিনহার কথা শোনার ধৈর্যও দা-সাহেবের নেই। তিনি বলতে শুরু করলেন, 'যারা খাঁটি অপরাধী, তারা কখনো-কখনো অত্যন্ত লড়াকু ভাব দেখায়।' একটু থেমেই দা-সাহেব আবার শুরু করলেন, 'ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিন গ্রামে বিল্টার অনুপস্থিতি এবং ঘটনার পর ওর এই অতিরিক্ত লড়াকু মেজাজ সন্দেহ করার পক্ষে যথেষ্ট।'

আদৌ বিস্মিত হলেন না সিনহা। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দা-সাহেব এই নামটাই উচ্চারণ করতে চলেছেন। তিনি খুব গভীরভাবে দা-সাহেবের মুখের ওপর তাঁর দৃষ্টি মেলে দিলেন এবং নিঃসঙ্কোচে তাঁকে দেখতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টিতে স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই ছিলো না! শুধু ছিলো একরাশ বিস্ময়!

কিন্তু এ দৃষ্টির সামনে দা-সাহেব বিচলিত হলেন না। বরং নিজের দৃষ্টির সঙ্গে একটু রাগ মিশিয়ে বললেন, 'সবচেয়ে আশ্চর্য হলো, তুমি বা সাকসেনা কেউই এই ব্যাপারটা ধরতে পারলে না! যাক্। আর একবার পুরো কেসটার ওপর খোলা মন আর খোলা চোখ নিয়ে নজর দাও! বিল্টুর হত্যাকারীকে আমায় ধরতেই হবে …গ্রামবাসীদের আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এবং এ কেসের ভার আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি …।'

উত্তর দেবার কোনো সুযোগ না দিয়েই দা-সাহেব হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং ভেতরের দরজা খুলে অন্দরমহলে চলে গেলেন।

দা-সাহেবের গভীর ভাবনা থেকে উৎপন্ন এই সিদ্ধান্ত, এই দম্ভ, এই উত্তেজনা এবং এই কণ্ঠস্বর তাঁর প্রস্থানের পরও যেন, চারদিকের পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আর সিনহা কিছুক্ষণ পর্যন্ত সেই জায়গায় জড়বৎ, হতচকিত এবং বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন!

নবম অধ্যায়

আজ প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তেলমালিশ করাবার পর হা-সাহেব 'স্নান' করেছেন। তাই শরীরটা এখন ফুলের মতো হালকা মনে হচ্ছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে একটা আভা ফুটে বার হচ্ছে। খুশি মনে "মশাল"-এর নতুন সংখ্যাটা উল্টে-পাল্টে দেখছেন। গত সপ্তাহের সমস্ত প্রধান-প্রধান ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে, বেশ নিপুণ এবং দায়িত্বপূর্ণভাবে। প্রথম পাতায়, বিক্ষুব্ধ-গোষ্ঠী কর্তৃক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর অসাফল্যের কথাই নয়, বরং তাদের স্বার্থপরতা ও পদলোলুপতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মন্ত্রিসভা থেকে লোচনবাবুকে যে বরখাস্ত করা হয়েছে, তাকে হা-সাহেবের এক নির্ভুল ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এও বলা হয়েছে যে, দলের অনুশাসন ও একতার খাতিরে দলের একজন মন্ত্রীকে বহিষ্কার করার অবিচল সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

মাঝের পাতায় রয়েছে, মুকুলবাবুর মিছিলের সংবাদ। তবে এই মিছিলের কোনো ছবি ছাপা হয়নি। কিন্তু এটা স্বীকার করা হয়েছে যে এই প্রদেশের ইতিহাসে এমন বিশাল মিছিল এর আগে কখনও হয়নি। বিরোধী-পক্ষের এমন বিরাট গণবিক্ষোভ নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হওয়ায়, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং পুলিশের ডি. আই. জি.-র ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

এরপর তিন নম্বর বিশেষ খবর : বন্ধুত্বের আড়ালে বিশুকে হত্যা করার জন্যে বিষ্ণুর গ্রেপ্তার। তারপর রোমাঞ্চকর ও মুখরোচক ঢঙে তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন করে এজাহার নিয়ে এবং গভীরভাবে তদন্ত করার পর এমন এক বিস্ময়কর তথ্য উদঘাটিত হয়েছে যার ফলে পুরো ঘটনাস্রোতই অন্য খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। এই তদন্তের ব্যাপারে ডি. আই. জি. যে গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তারও ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ খবর, যত্ন করে পরিবেষণ করা হয়েছে —আই. জি.-র শূন্য পদ পূরণ করবেন বর্তমান ডি. আই. জি.। এই কারণে ডি. আই. জি.-কে অভিনন্দনও জানানো হয়েছে।

এরপর রয়েছে, সদ্যোহ্য নির্বাচন-ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মুখরোচক বিবরণ। আর শেষ পৃষ্ঠায় রয়েছে, তিনটে ছবির সঙ্গে কুটির শিল্প যোজনার কার্যকলাপের দ্রুত সাফল্যের বিস্তৃত তথ্যাবলী। সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও ব্যক্ত করা হয়েছে —যে রকম সক্রিয়ভাবে এই কাজ এগিয়ে চলেছে তাতে আশা করা যায়, বর্ষশেষের আগেই দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসবে।

এই পৃষ্ঠাটি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন হা-সাহেব। চেহারায় এক অপূর্ব দিব্যভাব

ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠলো বাপুর স্বপ্নের গ্রাম। এক মহৎ, সার্থক, কিছু করার সন্তুষ্টির মাঝে ডুবে গেলেন দা-সাহেব।

ঠিক সেই সময়ে জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন যমুনাদেবী। বেশ গুছিয়ে করে কাটা ল্যাংড়া আম, মাখানা-ভাজা, জাফরানী সন্দেশ আর মধু।

'এসো!' উষ্ণ আহ্বান জানালেন দা-সাহেব। যমুনা তাঁর সামনে জলখাবারের ট্রে নামিয়ে রেখে তাঁর পাশে বসলেন। স্বামীর কাছে বসার সুযোগ তাঁর বড়-একটা হয়ে ওঠে না। কিন্তু তার জন্যে কোনো অভিযোগ তাঁর নেই। স্বামীর খ্যাতি এবং যশেই তিনি সন্তুষ্ট। সাধারণত দা-সাহেব তাঁর সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা করেন না, কিন্তু তিনি সব খবরই রাখেন —সে পাণ্ডেজীর কাছ থেকেই হোক অথবা লখন কিংবা অন্য কারো কাছ থেকেই হোক। কোনো সঙ্কট দেখা দিলে দা-সাহেব যতখানি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, যমুনার উদ্বেগ তার চেয়ে কম হয় না। তাই সে সঙ্কট যখন দূর হয়ে যায়, তখন তাঁর খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

' "মশাল"-এর এই সংখ্যাটা দেখেছ?' কাগজটার দিকে ইশারা করে দা-সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ। সকালবেলা উঠেই পড়ে নিয়েছি। আগের চেয়ে এখন কাগজটা কত উন্নতি করেছে!' দা-সাহেবের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাবলী দিয়েই সংবাদপত্রের ভালো-মন্দ নিরূপণ করেন যমুনাদেবী। বিরোধী-দলের মুখপত্র "কালের আওয়াজ"-এর ওপর তিনি এতই হাড়ে-হাড়ে চটা যে সে কাগজ ঘরে পর্যন্ত ঢুকতে দেন না।

'হুঁ!' হাসলেন দা-সাহেব। স্ত্রীর বোধবুদ্ধিতে একটু খুশি হয়ে বললেন, 'মাস-খানেক আগে কাগজের সম্পাদককে ডেকে বুঝিয়েছিলাম, আর এখন কাগজের চেহারাই পাল্টে গেছে। জানো, সমঝদার লোকের অভাব নেই; অভাব শুধু পরিচালনা করার মতো লোকের।' এ কথার সঙ্গেসঙ্গেই, মন খবরের কাগজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে দেশের প্রসঙ্গে গিয়ে পড়লো, 'দেশের দুরবস্থার সবচেয়ে বড় কারণ হলো —সঠিক নেতৃত্বের অভাব। ছাত্র-যুবক-কিষাণ-মজুর যাকেই দেখো, সকলেই আজ পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথ দেখাবার কেউ নেই।' কণ্ঠে দিগ্‌ভ্রষ্ট মানুষের জন্যে দুঃখ যেন উছলে উঠলো। সেই দুঃখ থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্যে যমুনা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ভগবানের দয়ায় সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আজকাল রাজনীতিতে এত নীচ কাণ্ড-কারখানা চলছে যে সব দেখে মনে হয় তোমার মতো ঋষিতুল্য মানুষের সন্ন্যাস নেওয়াই মঙ্গল। এসব কি আর তোমার পোষায়?'

স্মিত হেসে উত্তর দিলেন দা-সাহেব, 'তুমি তো গীতা পাঠ কর, তুমিও এ কথা

কাছে ? কর্মযোগীর প্রধান ধর্ম হলো পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়ানো। অর্জুন যখন এ রকম হতাশ হয়ে পড়লেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন ....।'

ডাক্তারবাবুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামগান শুনে আর পড়ে এ বিষয়ে যমুনার বিশেষ কোনো উৎসাহ নেই। তাই মাঝপথে বলে উঠলেন, 'নাও, আমটা খাও তো।'

'ল্যাংড়া আম খেতে সত্যিই চমৎকার।' শেষ টুকরোটা মুখে পুরতে-পুরতে বললেন ডা-সাহেব।

'আর একটু নিয়ে আসি, দাঁড়াও।' অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ালেন যমুনা। ফিরে এলেন আম আর জাফরানী সন্দেশ নিয়ে। 'তুমি তো এই সন্দেশ ভালোবাসো। আমার নিজের হাতে তৈরি। নাও ধরো। মনে হয়, এই আনন্দে সমস্ত সঙ্কট কেটে গেছে।'

'তাহলে তুমিও একটু খাও।' বলেই ডা-সাহেব যমুনার দিকে প্লেটখানা এগিয়ে দিলেন। তাঁর চোখে যেন ভালোবাসা ঝরে পড়লো। এ বয়সেও যমুনার গালে একটু লালচে ছোপ পড়লো। গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'আমার মন বলছে, তুমি ঠিক ভোটে জিতবে। শতকরা একশো ভাগ।'

'স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী যখন বলছেন, তখন তো জিতেই গেছি। এ বিষয়ে আর সন্দেহ কিসের?'

তারপর দু'জনে মিলে পরম তৃপ্তি সহকারে বেনারসী ল্যাংড়া আম আর জাফরানী সন্দেশ খেতে লাগলেন।

আজ হরিজন-বস্তি থেকে হরিজনদের একটা দলের প্রধান এসে পাণ্ডেজীকে আশ্বাস দিয়ে গেছে যে ওদের সব ভোট লখনই পাবে। সেই থেকে সবাই লখনের পেছনে লেগে রয়েছে। ওদের দাবি —এই উপলক্ষ্যে একটা খানা-পিনা হয়ে যাক্। কিন্তু লখন কোনো 'রা'-টি কাড়ছে না। জোরাবর ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলো, 'আরে, এই কঞ্জুসটা কিচ্ছু করবে না। ঠিক আছে, আজ আমার দালানেই খানা-পিনা হবে।' বিন্দা গ্রেপ্তার হওয়ায় আর সাক্সেনার বহালির খবরে জোরাবর শুধু নিশ্চিন্তই হয়েছে তাই নয়, রীতিমতো খুশি।

'মাথাটা শুধু-শুধু ওরা গরম করে দিলো, নয়ত আমি কখনও ডা-সাহেবের সঙ্গ ছাড়তে পারি?' সকলের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্যে জোরাবর আজকাল নানারকম কৈফিয়ৎ দিয়ে বেড়াচ্ছে।

সন্ধ্যার সময়ে জন দশ-বারো লোক জমায়েত হলো দালানে। কত হুইস্কির বোতল খোলা হলো। শহর থেকে আনানো হয়েছিলো স্পেশাল শিককাবাব আর

পনির পকৌড়া। দা-সাহেবের ছত্রছায়ায় লালিত বলে, লখনের সাধের বড় সখ একটা নেই। অবশ্য উৎসবে-পার্বণে লুকিয়ে-চুরিয়ে দু-এক পেগ চড়ানো অন্য ব্যাপার। কিন্তু পাণ্ডেজীর রোজই চাই। সন্ধ্যেবেলা দু'পেগ না খেলে সারাদিনের ক্লান্তি যেন দূর হয় না, পরের দিনের কাজেও ঠিক উৎসাহ আসে না। আর জোরাভর বিলিতি মদ যতই থাক না কেন, খাঁটি দিশি মাল পেটে না পড়লে মন ভরে না!

লখনের মধ্যে শৈথিল্য এবং উদাস-উদাস চাউনি লক্ষ্য করে পাণ্ডেজী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তোমার হয়ে তো জোরাভরই ভোজ দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে আর মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন?' কিন্তু লখনের উদাস-উদাস ভাবটা রয়েই গেলো। প্রথমটায় বেশ উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলো লখন। কিন্তু বিন্দা যেদিন গ্রেপ্তার হলো, সেদিন থেকেই কে-জানে ওর কি হলো! গ্রেপ্তারের সময় লখন উপস্থিত ছিল, এবং বিন্দাকে যখন শহরে নিয়ে যায় তখন সেও সঙ্গে গিয়েছিল। বিন্দার সেই আকাশ-কাটানো চিৎকার আর আগুনের মতো ধক্‌ধকে চোখ দু'টো! ঐ চোখ কিছুতেই ভোলা যায় না। আর অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, শহরের যার দিকেই সে তাকায়, মনে হয় সে মুখে বিন্দারই সেই জ্বলন্ত চোখ। এক অদ্ভুত ভয় ওকে সর্বক্ষণ গ্রাস করে রেখেছে। শুরু থেকে দা-সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও, রাজনীতিতে সে এখনো ততটা পাকা হয়ে ওঠেনি যে, এ সমস্ত ব্যাপার তার মধ্যে রেখাপাত করবে না।

জোরাভর তো শুনেই হো-হো করে হেসে উঠলো, 'শালা, চন্নুইয়ের বাচ্চে। বিন্দার মতো একটা থার্ডক্লাস গুণ্ডাকে ভয় পাস। কোনো আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়লে তো শালা হেগে-মুতে ফেলবি।'

পাণ্ডেজী আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, 'বিন্দা গ্রেপ্তার হওয়ায় ধরে নাও, শতকরা পাঁচটা ভোট গেলো। বিন্দার গ্রেপ্তার নিয়ে বিরোধী-পক্ষ তো জোর প্রচার চালাচ্ছে। তবুও ভালো যে মিছিলের পরদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবু শতকরা পাঁচটা ভোট তো গেলো।'

'আরে পাণ্ডেজী, জোরাভর থাকতে তোমার আর ভাবনা কি? আমি জানি শুকুলবাবুর ভোটার কারা। তুমি কি মনে করেছ, আমি থাকতে ওরা বুথে পৌঁছাতে পারবে? জোরাভরের রাজত্বে কেবল তারাই ভোট দেবে, যাদের জোরাভর চায়।'

'সে তো ভোটের ফল বেরোলে তবেই জানা যাবে।' পাণ্ডেজী জোরাভরের কথায় পুরোপুরি যেন নিশ্চিন্ত নন।

'ভোটের ফল কি হবে তা আমার কাছ থেকেই শুনে নাও। ধরে নাও, জিতে গেছ।' হাতের এক ঝটকায় জোরাভর বিজয় ঘোষণা করলো।

'এই মোচ্ছবকে মেজাজ উৎসব বলেই ধরে নাও।' জোরাকর সবার মান করে দিলো।

রাত একটায় খাবার দেওয়া হলো। তার আগে পর্যন্ত সবাই ভোটে জয়ী হবার আনন্দে একনাগাড়ে পেগের পর পেগ পান করে যেতে লাগলো।

লনে কানাত আর সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। আশপাশে গাছ-গাছালিতে রঙ বেরঙের ফুল ফুটেছে। শ্রী এবং শ্রীমতী সিনহা সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন অভ্যাগতদের। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার —বলা যায় ক্রীম অফ দ্য টাউন —সিনহার লনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উর্দি-পরা বেয়ারারা ট্রে-তে সফ্‌ট ড্রিঙ্ক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন রঙ-বেরঙের পোষাকে সজ্জিত মহিলারা। কেউ মোটা, কেউ বা রোগা। এঁরা বেয়ারাদের ট্রে থেকে ড্রিঙ্ক নিয়ে তাদের ধন্য করছেন! পুরুষেরা দলে-দলে বিভক্ত হয়ে ওপরে-নিচে যাতায়াতে ব্যস্ত। সেখানে যে মহিলা একদম নেই তা নয়, তবে সংখ্যায় অনেক কম। ওপরের ঘরটাকে বার বানানো হয়েছে। সিবাস রিগ্যাল, ব্ল্যাক-ডগ থেকে শুরু করে দিশি রাম অব্দি, অন্তত পঁচিশ রকমের মদ রাখা আছে সেখানে। আর সিনহা সাহেবের দুই পুত্র খুব তৎপরতা আর সতর্কতার সঙ্গে সবাইকে তাদের পছন্দমতো মদ ঢেলে দিচ্ছে। সৌজন্যের খাতিরে সিনহা সাহেব প্রত্যেকের কাছে দু'মিনিট করে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন কুড়াচ্ছেন, এবং মনে হচ্ছে অভিনন্দনের বোঝায়, তাঁর শরীরের ওজনও বুঝি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর শ্রীমতী সিনহা, বিনা প্রয়োজনে নিজের ভারি শরীরটা নিয়ে এমন ব্যস্তভাবে ঘুরে-ঘুরে উচ্ছলতা প্রকাশ করছেন, যেন মনে হচ্ছে, তাঁর চলার তালে-তালে পার্টিও এগিয়ে চলেছে।

ঠিক সেই সময়ে ইনকাম-ট্যাক্স কমিশনার বর্মা, গেট থেকেই উঁচু গলায় বলতে বলতে ঢুকলেন, 'আরে সিনহা, অভিনন্দন জানাই।' বয়সে কিছুটা বড় হওয়া সত্ত্বেও বর্মা নিজেকে সিনহার বাল্যবন্ধু বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। আহ্লাদে সিনহার গলা জড়িয়ে ধরে একটু দুষ্টুমি-ভরা হাসি হেসে বললেন, 'বেশ সাজিয়েছ ভাই। মনে হচ্ছে ডিক্লার্ড না করেই প্রমোশনটা পেয়ে গেলে ...তা নইলে কঠিন প্রমোশনে হৈচৈ করার আছেই-বা কি?'

'এ কি বলছেন, ভাইসাহেব! এই পার্টি কি শুধু প্রমোশনের না-কি!' একটু গা নাচিয়ে শ্রীমতী সিনহা এ কথা বলতেই, চেহারায় অপার বিস্ময় এনে বর্মা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে তোমাদের বাড়িতে আর কি ঘটলো? দিন-দশেকই তো

বাইরে ছিলাম। এরই মধ্যে এমন কি ঘটলো ভাই, যে এমন মোক্ষম পার্টির জন্যে দিয়ে দিলে!' তারপর বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কি ভাই?'

'ওঁর কারাবাসের পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব হচ্ছে।' লালা দীনদয়াল রসিকতা করে বললেন।

'ওহো, এই ব্যাপার! তাহলে তো পুরস্কার হিসেবে এই জেলখানা থেকে দু-এক মাসের ছুটি দেওয়া উচিত সিনহাকে। কি বৌদি?'

'অদ্ভুত কথা বলছেন, ভাইসাহেব।' একটু হেসে-দুলে শ্রীমতী সিনহা জবাব দিলেন। 'পঁচিশ বছর ধরে বন্দী জীবন তো আমিই কাটালাম। পুলিশের সঙ্গে ঘর করা কি কম শাস্তি? পুরস্কার তো আমারই পাওয়া উচিত।'

'ঠিক আছে। পুরস্কার হিসেবে তাহলে আপনি ছুটি নিন, সিনহাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই।'

সম্মিলিত হাসির হররা উঠলো!

এরপর ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে সবাই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। হাতে দামী গ্লাস নিয়ে কেউ-কেউ দেশের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির কথা আলোচনা করছেন, কেউ-কেউ চিন্তা করছেন দেশজোড়া অব্যবস্থা নিয়ে। কারো আলোচনার বিষয় হলো, দেশের মানুষের দ্রুত নৈতিক অবনতি, কেউ-কেউ আবার ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির কথা ভেবে চিন্তিত। ঝকমকে, চমকদার পোষাকে সজ্জিত মহিলারা পুরুষদের কথার তালে তাল মেলাচ্ছেন।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও কারো মনে এ প্রশ্ন স্থান পেলো না যে ডি. আই. জি.-র মতো পদমর্যাদার মানুষ এত দামী মদ কোথা থেকে, কিভাবে খাওয়াতে পারেন? কোনো বড় জুয়েলারি দোকানের শো-কেসের শোভা-বর্ধনকারী, এমন অন্তত বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা দামের হীরার সেট শ্রীমতী সিনহার সৌন্দর্য-বর্ধন করার জন্যে কিভাবে ...কোথা থেকে এলো?

না। এসব কথা গোনা-গুনতি কয়েকটি মূর্খ ছাড়া আর কাউকে বড়-একটা ভাবায় না। ভাবা তো দূরের কথা, এক মুহূর্তের জন্যে মাথায়ও আসে না। কিছু ব্যাপার, কিছু ঘটনা, কিছু-কিছু অবস্থা প্রচলিত হতে-হতে এমন স্বীকৃতি পেয়ে যায় যে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, ক্রমে মানুষের বিস্মৃতির গর্তে বিলীন হয়ে যায়।

খাওয়ার ডাক পড়তেই সবাই টেবিলে গিয়ে বসলেন —আমিষ এবং নিরামিষ খাবার থরে-থরে সাজানো। গরম-গরম সুখাদ্যের সুগন্ধ, প্লেট-চামচের টুং-টাং আওয়াজ, কথাবার্তা, অট্টহাসি, গুঞ্জনের মাঝে গোটা লন গুলজার হয়ে উঠেছে।

স্টেট থেকে সেন্টে পৌঁছে গেছে যশ, সেখান থেকে দিল্লিতে আর গোটা দুনিয়া বড় সুন্দর ...বড় রঙিন ...বড় মজাদার হয়ে উঠেছে।

দত্তবাবুর মনে দা-সাহেবের প্রশংসা আর পকেটে কাগজের ডবল কোটার পারমিট —যেন মনে হচ্ছে পা মাটি থেকে দেড় ইঞ্চি ওপরে। মিষ্টির দোকান থেকে দশ সের টাটকা বোঁদে কিনে এনেছেন। আজ প্রেসের সবাইকে মিষ্টিমুখ করাবেন। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে পনেরো দিনের বোনাসের ঘোষণাও করে দেবেন।

প্রেসে পৌঁছে ভবানীর সামনে কাগজের পারমিটটা রাখতে-রাখতে বললেন, 'নাও, এবার বিশ্বাস হলো তো? বলেছিলে না, এইসব মন্ত্রীদের কথার দাম, প্রশংসার কোনো মানে নেই! এবার বলো, মানে আছে না নেই!'

'পারমিট পেয়ে গেলে?' উছলে উঠলো ভবানী। 'বাঃ, এই কাগজের সঙ্কটের সময়ে কোটা ডবল হয়ে যাওয়া মানে তো পোয়াবারো।'

'গত পনেরো দিনে ন'খানা বিজ্ঞাপন এনে দিয়েছি। আজ আরো চারটের কথা পাকা করে এলাম। ওই "বিকাশ" অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিকে ফোন করে দিয়েছে; বাস্, চারটে বিজ্ঞাপনের জায়গা রিজার্ভ করিয়ে নিলাম। আইটেম প্রত্যেক মাসে বদলাবে। কাল নরোত্তমকে পাঠিয়ে এই মাসের ব্লকগুলো আনিয়ে নিও।'

'জিতা রহো!' উৎসাহের চোটে ভবানী চিৎকার করে উঠলো।

'এটা তো হয়ে গেলো। এখন দেশে "মশাল"-এর সাহায্যে বিপ্লব নিয়ে এসো। নয়তো এই জীবন, মৃত্যুতে পর্যবসিত হবে।'

'তুমি কিচ্ছু ভেব না' বলেই ভবানী তৎপরতার সঙ্গে দেরাজ খুললো, যেন দেরাজের ভেতর থেকেই বিপ্লব বার করে আনবে। কিন্তু বার করলো একটা সাদা কাগজ। কাগজটা টেবিলের ওপর পেতে কলম খুলতে-খুলতে বললো, 'দেশে বিপ্লব যখন আসবে, আসবে ...আর সে বেটাচ্ছেলে আসবে কি-না তা ভগবানই জানেন। কিন্তু "মশাল"-এর অফিস, সম্পাদক আর সহ-সম্পাদকের জীবনে বিপ্লব তো দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনই সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে বিপ্লবের ঝলকও তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'নিকুচি করেছে তোমার হিসেবের।' কাগজটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দত্তবাবু বললেন, 'প্রথমে সবাইকে মিষ্টি দাও। বোঁদের লাড্ডু নিয়ে এসেছি। আর ভাবছি পনেরো দিনের বোনাস ঘোষণা করে দেবো।'

'এখন কেবল মিষ্টি খাইয়ে দাও। বোনাসের ব্যাপারটা সামনের মাসের জন্যে তোলা থাক। স্টেপ বাই স্টেপ। বিপ্লবকে এমনভাবে এগোতে দাও যাতে আমাদের পক্ষে নতুন কিছু করা এবং লোকদের সেটা মেনে নেওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে। বুঝলে?'

একটু বাদেই প্রেসের সবাই অফিসের বারান্দায় এসে জড়ো হলো। সবাইকে লাড্ডু দেওয়া হলো। সঙ্গে চা আর গরম-গরম সিঙাড়া। এক অনাড়ম্বর উৎসবের মধ্যে, দত্তবাবু এক ছোট্ট আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দিলেন। সবার পরিশ্রম আর সহযোগিতার প্রশংসা করে, পত্রিকার ক্রমবর্ধমান মর্যাদা ও দায়িত্বের কথা বললেন।

সবাই চলে যাওয়ার পর ভবানী তুড়ি মেরে বললো, 'দত্তভাই, তুমি বোধহয় জানো না, তোমাকে এই ধরনের ভাষণ-টাষণ দিতে দেখলে কেমন-যেন প্যাঁচার মতো লাগে। দা-সাহেবের কাছ থেকে ঘুরে আসার পর দু-চার দিন তোমার মধ্যে এই ভাবটা লেপ্টে থাকে।' বলে বিকট শব্দে নিজেই হেসে উঠলো।

সন্ধ্যায় ভবানী বললো, 'আজ রোজকার একঘেয়ে রুটিনেও বিপ্লব আনা যাক। নরোত্তমকে ডাকিয়ে নিই। কিন্তু ঘরে বসা নেই আজ —চলো, কোনো একটা ভালো জায়গায় যাওয়া যাক।'

প্রেস থেকে বেরোনোর পর দেখা গেলো, কোনো কিছু পেটে না পড়লেও তার মধ্যে অদ্ভুত এক গুলাবী নেশার রঙ ধরেছে।

সুকুলবাবুর জমজমাট মিছিল উপলক্ষ্যে আর একটা উৎসব। নিঃসন্দেহে এই মিছিল একটা নতুন নজির সৃষ্টি করেছে। গত এক মাস ধরে যে "মশাল" নিয়মিতভাবে দা-সাহেবের স্তুতি-গান করে চলেছে, সেই "মশাল"ও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে এত বড় মিছিল, এই প্রদেশের ইতিহাসে এই প্রথম। এক লাখেরও বেশি মানুষ জমায়েত হয়েছিলো এই মিছিলে। দেখবার মতো দৃশ্য ছিলো —হাজার-হাজার মানুষের হাতে বিশুর মৃত্যু এবং হরিজনদের ওপর সংঘটিত অত্যাচার-বিরোধী পোস্টার। সুকুলবাবুর মতে বিয়াল্লিশের সেই পরিবেশ, সেদিন গড়ে উঠেছিলো। মিছিল দেখে তো শাসকদলের লোকজনের চোখ ছানাবড়া! সকলেই যেন সেদিনের, সে মিছিলে নিজের-নিজের প্রকৃত মুখটা দেখতে পাচ্ছিলেন এবং অনাগত এক সর্বনাশের কথা ভেবে নিজের-নিজের আসন সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন!

মিছিলের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে, গদগদ হয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় বিহারী ভাইকে কাছে টেনে নিলেন সুকুলবাবু। এই সাফল্যের ষোলো-আনা কৃতিত্ব যে বিহারী-ভাইয়ের, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গত দশ-বারো দিন ধরে তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন। রাতে সাকুল্যে বড় জোর কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। জলের মতো পয়সা খরচ করেছেন তো বটেই, তার ওপর তাঁর সহকর্মীদের এলাকার প্রতিটি কোণে পাঠিয়ে এমন ব্যাপক জাল বিছিয়েছিলেন যে মিছিলের দিন, দিনমজুর আর হরিজনদের ঘরে মানুষজন দূরে থাক, একটা শিশু পর্যন্তও ঘরে ছিলো না।

'সুকুলবাবু, এই মিছিলের জন্যে কিন্তু একটা জোরদার সেলিব্রেশন করতে হবে!' লালতাবাবু, সবসময়ই সেলিব্রেশনের সুযোগের জন্যে ছোঁক-ছোঁক করেন।

কাশী তার স্বভাব-সুলভ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে জবাব দিলো, 'নিশ্চয়ই। কেন নয়? বিসুর মৃত্যু আর হরিজনদের ওপর যে জুলুম হয়েছে, তার জন্যে তো অবশ্যই সেলিব্রেট করতে হবে। এমন মোক্ষম সুযোগ আর কোথায় পাবেন বলুন?'

এমন আচমকা ব্যঙ্গ-মেশানো মন্তব্য সুকুলবাবুর ভালো লাগলো না। শুধু চোখের চাউনি দিয়ে কাশীকে একটা ধমক লাগালেন, তারপর লালতাবাবুর ওপরই কাজটা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু মিছিলের ঠিক পরদিন 'বিন্দা গ্রেপ্তার হওয়ায়, সরোহায় বিহারী-ভাইয়ের ব্যস্ততা এত বেড়ে গেলো যে, সেদিন কিছু করা গেলো না। আজও, যখন সকলে দু'পেগ করে চড়িয়ে নিয়েছেন, ঠিক তখন বিহারী-ভাই এলেন।

'স্বয়ং বরকে বাদ দিয়েই আমরা ভোজ শুরু করে দিয়েছি। কি করব?'

'না, না, ঠিক আছে।' তাঁকে একটা উঁচুতে স্থান দেওয়ায় বিহারী-ভাই মনে মনে খুব খুশি।

কথাবার্তার একটাই বিষয় —সরোহা নির্বাচন।

'বিন্দা গ্রেপ্তার হওয়ায় আমাদের পরিস্থিতি আরো মজবুত হয়েছে। বেশ মোক্ষম সময়েই ব্যাপারটা ঘটলো।'

এক উল্লসিত কণ্ঠস্বর।

'দু'টো দিন আগে হলে, মিছিলে বিন্দার নামেও দশ-বিশটা পোস্টার ছেড়ে দিতাম। এমনিতেই ঘরে-ঘরে গিয়ে সকলকে বেশ-খানিকটা তাতিয়ে দিয়ে এসেছি। সেদিন মিটিংটাও দারুণ জমেছিলো। দেখে নিও, নয়-নয় করেও অন্তত শতকরা দশভাগ বিপক্ষের ভোট আমাদের বাক্সে পড়বে।'

একটা খুশির ঘোষণা!

'এই শালা বিন্দা কাছে ঘেঁষতে পর্যন্ত দেয়নি —বিসু যে প্রমাণগুলো জুটিয়েছিলো, সেগুলো এখন বিন্দার বৌয়ের কাছে আছে। পারো তো এইবেলা হাতিয়ে নাও। গিয়ে বলো, আমরা বিন্দার হয়ে মামলা লড়ব।'

একটা সুচিন্তিত প্রস্তাব।

'হ্যাঁ! নির্বাচনে হেরে গেলে তো মামলা লড়বই। আর যদি জিতে যাই তাহলে তখন করার মতো অনেক বড়-বড় কাজ হাতে এসে যাবে। সে কাজের পাশাপাশি এ মামলার গুরুত্বই বা কতটুকু?'

একটা ব্যঙ্গোক্তি।

'দা-সাহেব এই ভুলটা করলেন কি করে? এত সহজে উল্টো চাল দেবার বান্দা তো তিনি নন। নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে লোকটার।'

একটা আশঙ্কা।

'ভুলে যেও না, চালাক কারও ওদের ওপর বসে। ক্ষেতমজুর আর হরিজনদের ভোট এবার আর পেতে হবে না ...এটা ঠিক।'

উৎকণ্ঠার সমাধান।

'বেশ উঁচুদরের যাদু, কাছু মাল এই দা-সাহেব।'

আবার উৎকণ্ঠা।

'সুকুলবাবু যখন গদিতে ছিলেন, তখন তিনিও কম যাননি। আবার যদি গদি পান, তাহলে দেখো। এই শালা গদিই সবাইকে ...।'

অন্য প্রসঙ্গ।

'আরে ধুতির তলায় তো সবাই ন্যাংটো। আর এই শালার রাজনীতিতে ধুতি পরেও উদোম। কিন্তু দা-সাহেব এ সবের বাবা। ঐ গীতার কথকঠাকুরের ধুতির নিচেও আর একটা ধুতি নির্ঘাৎ মিলবে। এক যদি চামড়া ছাড়ানো যায় তবেই এঁর পুরোটা চোখে পড়বে।'

শরীর-কাঁপানো হট্টগোলের হাসি।

'ভোটে জিতলে কিন্তু আপনার ঐ গুলাবী-বাগের বাগান-বাড়িতে একটা বেশ জম্পেশ পার্টি দিতে হবে।'

'ধুত্তেরী। তোমাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। এর চেয়ে বেশি-কিছু ভাবতেই পারো না। চাইলে কি, না পার্টি!'

'জেতার ছ'মাসের মধ্যে আপনাকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। এটা আপনার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।'

'পোর্টফোলিও-ওয়ালা মুখ্যমন্ত্রী আপনি আর বিনা পোর্টফোলিও-ওয়ালা মুখ্যমন্ত্রী বিচারী-ভাই।'

ক্রমশ সবাই হালকা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে নিজের-নিজের সম্ভাব্য লাভের সুখ-স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, পৃথক-পৃথক ঢঙে উৎসব চলছে —কিন্তু পান-ভোজনের, আমোদ আহ্লাদের আয়োজনে ব্যস্ত মানুষদের এই বিরাট গতি থেকে তিনটি মানুষ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—সাকসেনা, লোচনবাবু আর বিন্দা। একদম উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত ও একঘরে!

সাস্পেনশনের আদেশ পেয়েও, সাকসেনার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো

না —না দুঃখের, না অনুশোচনার ! সামনে বাচ্চাদের খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত স্ত্রীর দিকে তাঁর চোখ পড়লো। কি বলবেন ওঁকে ? কিভাবে উনি খবরটা নেবেন ? মুহূর্তের জন্যে স্ত্রীর প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ জেগে উঠলো তাঁর। কিন্তু পরক্ষণেই রুকমার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তিন দিন ধরে বিন্দাকে নিয়ে হরিজন-পাড়ায় আর টিটুহি গ্রামে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়েছেন। রুকমা হাতজোড় করে বলেছিলো, 'সাহেব, একে আপনার সঙ্গে নেবেন না। যদি ওর কেউ কোনো ক্ষতি করে, ওর সর্বনাশ নিশ্চয়ই কেউ ঘটাতে পারে ...আমার এই বাচ্চাটার কি হবে ?'

আর বিন্দা তখন ধমকে উঠেছিলো, 'চুপ কর্। তুই ভাবিস, তোর আঁচলের তলায় মাথা গুঁজে হিজড়ে হয়ে বসে থাকব ?'

'বিন্দা ইজ দ্য রিয়েল কালপ্রিট।'

'ওহ্, নো স্যার। এ হতে পারে না। তা মিথ্যে। আমি এই মামলার নাড়ি-নক্ষত্র দেখেছি। আমি ...।'

কিন্তু ডি. আই. জি.-র কাছে পুরো রিপোর্ট তৈরি। অকাট্য যুক্তি আর মোক্ষম প্রমাণ হয়েছে সে রিপোর্টে।

'বড় জেল থেকে বেরোবার আগে পর্যন্ত বিন্দা ছিলো এক সহজ-সরল মানুষ। কিন্তু বিসুর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই ওর স্বভাবে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রচণ্ড রুক্ষতা, একটা গোঁয়ার্তুমির মনোভাব ওকে গ্রাস করে। নিজের স্ত্রীর প্রেমিককে চাক্ষুষ দেখলে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কেউ এটা বরদাস্ত করতে পারে না। আর বিন্দার মতো লোক তো নয়ই।

'খুন হবার দিন বিসু শেষ খাওয়া খেয়েছিলো বিন্দার বাড়িতে। রুকমার এজাহার থেকে এটা পরিষ্কার জানা যায় যে, সে সন্ধ্যায় খায়নি। ময়না তদন্তের রিপোর্টে যে বিষের কথা বলা হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়া দশ-বারো ঘণ্টা বাদে হয়। ঐ বিষ খাবারের সঙ্গে বিসুর পেটে যায়। আর খাইয়ে-দাইয়ে বিন্দাও শহরে চলে যায়, ফেরে পরদিন। যাওয়ার আগে ঝগড়ার কথা বিন্দা নিজের মুখে স্বীকার করেছে। বিন্দা মনে করেছিলো, এখন যে রকম সুযোগ, তাতে খুব সহজেই ...।'

সাকসেনার কাছে এসব কথার সমস্ত অর্থটাই হারিয়ে গেছে ! এর না আছে মাথা, না মুণ্ডু, না অর্থ —না কিছু !

"পাগলা গারদ আর থানার মধ্যে কোনো তফাৎ কি আপনারা রেখেছেন ? এখানে যা-কিছু ঘটে তার কোনো মাথা-মুণ্ডু, মানে ...!" বিন্দার কথাগুলো কানে বাজতে লাগলো। সে কথাগুলো খান-খান হয়ে গেলো ডি. আই. জি.-র গলার আওয়াজে, 'বিন্দাই বিসুকে খুন করেছে।'

"বিসু মরেনি, সাহেব! সবার কাছে ও মরে গেলেও ও আমার মধ্যে বেঁচে আছে। সাহেব, ও মরতেই পারে না! আপনি দেখুন, অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত আসামী যতক্ষণ না …।"

'আর আপনি কি-না এই বিন্দার সঙ্গে জোট বেঁধে অগ্নিকাণ্ডের প্রমাণ জোটাচ্ছিলেন? বিসুর খুনের আসামীর দিক থেকে নজর সরিয়ে নেবার জন্যে ও অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারটা তুলেছিলো, আর আপনি একজন সিনিয়র এস. পি. হয়ে ওর হাতের পুতুল হয়ে গেলেন? ছিঃছিঃ …!'

''মিথ্যে কথা!' অফিসের মর্যাদা এবং অনুশাসনের সমস্ত গণ্ডি ভেঙে চিৎকার করে উঠলেন সাক্সেনা। এরপর ঠিক আর কি বলেছিলেন, তা আর মনে নেই। শুধু এটুকুই মনে আছে যে তিনি নন, ভেতরের অন্য কেউ কথাগুলো বলে চলেছিলো।

'কিন্তু আজ?

আজ পর্যন্ত সাক্সেনা বিবেকের তোলপাড় আর বাহ্যিক চাপের টানা-পোড়েনে দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই, হার মেনে নিয়েছেন। প্রত্যেকবার দিনেশকে তিনি লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে গেছেন ঠিকই; কিন্তু যখনই গুলিগোলা চলতে শুরু করে, তখনই তাকে ছেড়ে পালিয়ে আসেন—একা, নিরস্ত্র অবস্থায়। গুলির আঘাতে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে সে, আর তিনি এক অসহ্য অপরাধবোধের অন্তর্দাহে।

না, আর নয়। বোধহয় তিনি চাইলেও তা আজ আর করা সম্ভব নয় …!

মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত হবার পর স্বেচ্ছায় দল থেকেও পদত্যাগ করলেন লোচন ভাই। কিন্তু হাজার-হাজার প্রশ্নের যে তীক্ষ্ণ কাঁটা তাঁর মনকে বিদ্ধ করছিলো, তার আঘাতে তিনি প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন। তাঁর চারপাশে এবং অন্যত্র যা-কিছু ঘটছে তা চোখ বুজে, উদাসীন, নির্বিকার-চিত্তে কিভাবে মেনে নেবেন? কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ কি তা পারে? না, পারে না। আর তাই তো সার্বিক বিপ্লবের এক ছোট্ট বোঝা তাঁকেও বইতে হয়েছিলো। কিন্তু এ কেমন বিপ্লব? কোথাও কিছু পাল্টালো না! দ্বিতীয় বিপ্লব কবে হবে? আর কেই বা সবকিছু উল্টে-পাল্টে দেবার জন্যে এসে দাঁড়াবে? আজ যারা পরিবর্তনের কথা বলছে, তাদেরই কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, গলা কেটে দু-টুকরো করে ফেলছে। যে ক'জন মুষ্টিমেয় মানুষ এক কোণে উপেক্ষিত, অনাদৃত জীবন-যাপন করছেন, তাঁদের রুদ্ধ ও অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর থেকে আর কখনও কি বিপ্লবের আহ্বান শোনা যাবে?

'একলা চলো রে' গানের তালে-তালে পা ফেলে এগোতে পারবে কি কেউ?

যে বিশুর নাম নিয়ে এক মাস আগে সর্বত্র ঝড় উঠেছিলো, সে নাম সঙ্কুচিত হতে হতে হীরার চোখের জলে আর বিন্দার চোখের জ্বলন্ত আগুনে পরিণত হলো।

পুলিশের ডাণ্ডা, কিল-চড়-আর লাথির মধ্যে, বিন্দা শুধু একটি কথাই বলছে, 'আমি বিশুকে মারিনি ...বিশুকে আমি খুন করতে পারি না। আমাকেই তো ওর শেষ আশা পূরণ করতে হবে। আমি তা পূরণ করবই ...যেভাবেই হোক, আর যাই-ই হোক ...।'

'শেষ ইচ্ছা পূরণ করবি ? ...নে ...কর্ ...!' পুলিশের অত্যাচারের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিন্দার চিৎকার বন্ধ হয় না। আবেগ-কম্পিত চিৎকারে বলে চলে, 'মেরে ফেলো। আমায় মেরে ফেলো। বিশুকে খুন করেছ, আমাকেও কর। কিন্তু বিশুর ইচ্ছাকে খুন করতে পারবে না।'

'খুন করতে পারব না ... নে দেখ্ !' পুলিশের মাত্রাহীন আসুরিক অত্যাচারে সে খাবি খেতে থাকে। আবেগ পরিণত হয় ফোঁপানিতে, আর তর্জন-গর্জন গোঙানিতে।

ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে আছেন সাক্সেনা, পাশে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রুক্মা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে আর সাক্সেনার কেবলই মনে হচ্ছিলো তাঁর ভেতরেও কেউ-যেন আর্তনাদ করে চলেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার এবং বিশুর মৃত্যু-সম্পর্কিত প্রমাণে-ভরা ব্রিফকেসটি তাঁর কোলের ওপর রাখা।

বার-বার বোঝানো সত্বেও লোক-বোঝাই রেলের কামরায়, রুক্মার এভাবে কান্নাটা সাক্সেনার ভালো লাগছে না। তাই একটু ধমকের সুরে বললেন, 'রুক্মা, চুপ কর !'

চমকে মাথা তুলে অবুঝ দু'চোখ মেলে সাক্সেনার দিকে চাইলো রুক্মা —সেই পরিচিত কণ্ঠ !

কিন্তু এখানে ও কোথায় ? ও তো এখন জেলে।

★